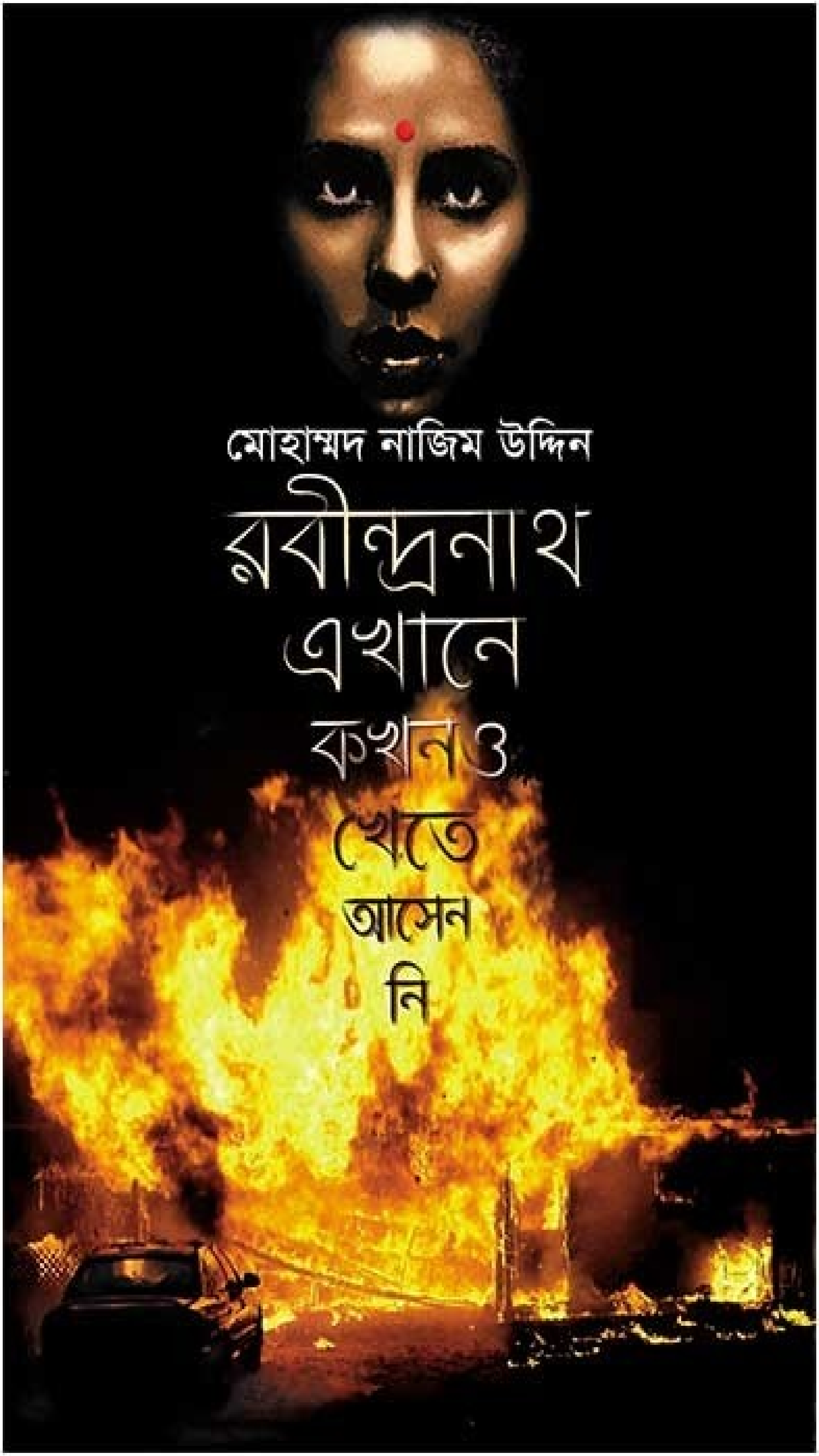
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন
রবীন্দ্রনাথ
এখানে
কখনও
খেতে
আসেন
নি

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন
রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসেন নি

আবেদন

নুক্, কিন্ডেল, কোবো বা ট্যাব ছাড়া ই-বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি যা খুব সহজেই হাতের স্মার্টফোনে যে কোন অবসরেই পড়ে ফেলা যায়। আলাদা করে ই-বুক রিডার কেনার কোন প্রয়োজন নেই বা পিডিএফের মত জুম করে ডান-বা দিকে সরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের পিডিএফ যাও বা পাওয়া যায়, ইপাব অপ্রতুল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রচারের জন্য তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে) এই ইপাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ ও ভূমিকা (যদি কিছু থাকে, পিডিএফ-এ বেশীরভাগ সময় থাকে না।) ইত্যাদি প্রথমদিকের পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই ভাবতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হয়েছে।

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের পিডিএফ নামিয়ে টেক্সটে রূপান্তরিত করা- এ কাজে **ভি-ফ্ল্যাটে**র এখনো কোন জুড়ি নেই। এবার একে ওয়ার্ড বা অন্য কিছুতে এডিট করে **ক্যালিবার** এর সাহায্যে ইপাব। এটাই সহজ পদ্ধতি।।

ভি-ফ্ল্যাটের সাহায্যে পিডিএফ থেকে তৈরি, ভুল থাকলে জানান। বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যেই উপলব্ধ। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক, শিক্ষামূলক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের জন্য কখনোই নয়।

বাতিঘর প্রকাশনী

রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসেননি

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারী বইমেলা ২০১৫
প্রচ্ছদঃ সিরাজুল ইসলাম নিউটন
মুদ্রণঃ একুশে প্রিন্টার্স,১৮/২৩ গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সুত্রাপুর, ঢাকা
গ্রাফিক্সঃ ডট প্রিন্ট, ৩৭/১ বাংলা বাজার, ঢাকা

সূচীপত্র

রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসেননি
মুখবন্ধ
অধ্যায় ১
অধ্যায় ২
অধ্যায় ৩
অধ্যায় ৪
অধ্যায় ৫
অধ্যায় ৬
অধ্যায় ৭
অধ্যায় ৮
অধ্যায় ৯
অধ্যায় ১০
অধ্যায় ১১
অধ্যায় ১২
অধ্যায় ১৩
অধ্যায় ১৪
অধ্যায় ১৫
অধ্যায় ১৬
অধ্যায় ১৭
অধ্যায় ১৮
অধ্যায় ১৯
অধ্যায় ২০

অধ্যায় ২১
অধ্যায় ২২
অধ্যায় ২৩
অধ্যায় ২৪
অধ্যায় ২৫
অধ্যায় ২৬
অধ্যায় ২৭
অধ্যায় ২৮
অধ্যায় ২৯
অধ্যায় ৩০
অধ্যায় ৩১
অধ্যায় ৩২
অধ্যায় ৩৩
অধ্যায় ৩৪
অধ্যায় ৩৫
অধ্যায় ৩৬
অধ্যায় ৩৭
অধ্যায় ৩৮
অধ্যায় ৩৯
অধ্যায় ৪০
অধ্যায় ৪১
অধ্যায় ৪২
অধ্যায় ৪৩
অধ্যায় ৪৪
অধ্যায় ৪৫

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসেননি

মুখবন্ধ

গন্ধটা যেনো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরলো তাকে।

ট্যাক্সিক্যাবের দরজা খুলে মাটিতে পা রাখার সাথে সাথে টের পেলো বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে অদ্ভুত একটি গন্ধ। এ জীবনে নেয়া যতো গন্ধ আছে তার মধ্যে এটি একেবারেই অজ্ঞাত। এর মধ্যে যে সম্মোহনী ক্ষমতা রয়েছে সেটাও টের পেলো খুব দ্রুত।

টানা চার-পাঁচ ঘণ্টা ক্যাবে করে ভ্রমণ করার পর এমনিতেই খিদেয়। পেট চৌ চৌ করছিলো, প্রলুব্ধকর গন্ধে সেটা যেনো বিস্ফোরণের মতো ছড়িয়ে পড়লো এবার। তার থেকে মাত্র বিশ গজ দূরে, রাস্তার পাশে রেস্টুরেন্টটি দেখতে পেয়ে সানগ্লাস খুলে ভালো করে তাকালো। সাইনবোর্ডে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে অদ্ভুত আর অপ্রচলিত নামটি। দুই ঠোঁটে চেপে রাখা জ্বলন্ত সিগারেটে জোরে টান দিলো সে। পা বাড়ানোর আগে ট্যাক্সি ক্যাবের দিকে ফিরে তাকালো। ড্রাইভার জানালা দিয়ে মাথা বের করে রেখেছে। তার সাথে চোখে চোখ পড়তেই মাথা নেড়ে সায় দিলো লোকটি। তাকে চলে যাবার ইশারা করতেই হুস করে শব্দ তুলে ট্যাক্সিক্যাবটি চলে গেলো। তার চোখের সামনে যে রেস্টুরেন্টটি দাঁড়িয়ে আছে সেটা গর্বসহকারেই জানান দিচ্ছে :

রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসেননি!

একদম সত্যি কথা। আমিও কখনও এখানে আসতাম না, যদি..

বুক ভরে গন্ধটা নিয়ে সামনের দিকে পা বাড়ালো।

মহাসড়কের পাশে চমৎকার একটি বাংলো বাড়ির মতো একতলার এই রেস্টুরেন্টটির সামনে লম্বা বারান্দা, সেই বারান্দার উপরে সবুজ রঙ করা টিনের ছাউনি। বড় বড় ফ্রেঞ্চ জানালা আর নক্সা করা বিশাল একটি কাঠের দরজা-এক নজরেই জায়গাটা মানসপটে স্থান করে নেবে। রাস্তার পাশে এমন চমৎকার ছিমছাম রেসটুরেন্ট খুব কমই আছে। মহাসড়কের পাশে যেসব রেস্টুরেন্ট থাকে সেগুলো মূলত যাত্রিবাহী বাসের স্টপেজ হিসেবে কাজ করে। বড়বড় বাস-সার্ভিস কোম্পানি নিজেরাই কিছু রেস্টুরেন্টের মালিক। ওগুলোর সামনে বিশাল একটি খালি জায়গা রাখা হয় বাস-কোচ রাখার জন্য কিনতু এই অদভুত রেটুরেন্টটি সে-রকম নয়। এর সামনে যে খোলা জায়গাটি আছে সেখানে বড়জোর দশ-বারোটি প্রাইভেটকার রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। সম্ভবত দূরপাল্লার কোনো বাস-কোচ এখানে রাখা হয় না। তাহলে কোথায় রাখা হয়?

জবাবটা পেয়ে গেলো রেস্টুরেন্টের বামদিকে।

ছিমছাম রেস্টুরেন্টের এক-দেড়শ’ গজ দূরে একটি পেট্রলপাম্প। সেখানে অনেকগুলো বাস-ট্রাক-কোচ দাঁড়িয়ে আছে।

চারপাশে তাকিয়ে রেস্টুরেন্টের দিকে নজর দিলো আবার। এ মুহূর্তে সামনের প্রাঙ্গণে সাদা রঙের একটি প্রাইভেটকার আর কালো রঙের মাইক্রোবাস ছাড়া কিছু নেই।

দুপুর গড়িয়ে গড়িয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বিকেলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সবকিছু যেনো ঝিমিয়ে পড়েছে এখানে। মহাসড়কটিও অলসভাবে পড়ে আছে। অনেকক্ষণ পর পর দুয়েকটা বাস-ট্রাক যাচ্ছে-আসছে তার উপর দিয়ে।

রেস্টুরেন্টের আশেপাশে ডোবা-নালা আর ধানক্ষেত। পেছনে, বহু দূরে একটি গ্রামীণ জনপদ। বিস্তীর্ণ ক্ষেতের মাঝে গুচ্ছ-গুচ্ছ কৃষকের বসতবাড়ি। সরু একটি পথ চলে গেছে সেই বসতবাড়িগুলোর দিকে। মেঠোপথের দু-ধারে বিস্তীর্ণ আবাদি-জমি। মাঝে-মাঝে

ছোটো-বড় ডোবা পুকুর, খাল। চারদিকে তাকালে সবুজ প্রান্তরে আকাশ মিশে যাবার সেই চিরায়ত দৃশ্যই চোখে পড়বে।

বারান্দার কাছে এসে একটু থেমে সুখটান দিয়ে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো। ধূমপান নিষেধ লেখা সাইনের পাশেই নক্সা করা বিশাল দরজা, সেটা ঠেলে ভেতরে ঢুকেই থমকে গেলো কয়েক মুহূর্তের জন্য। হালকা ভলিউমে রবীন্দ্রসঙ্গীত ভেসে বেড়াচ্ছে। অবাক হলো না সে। এটা প্রত্যাশিতই ছিলো, বিশেষ করে এমন একটি রেসটুরেন্টে।

ঘরের ভেতরে নজর দিলো এবার। সাজসজ্জা আর পরিবেশ একদমই আলাদা। টেবিল-চেয়ারগুলো একটু ভিন্নভাবে সাজানো। এক একটা রাউন্ড টেবিল ঘিরে আছে তিন থেকে চারটা করে চেয়ার। এরকম পাঁচ-ছয়টি টেবিল আছে ঘরে। সর্বোচ্চ বিশ-পঁচিশজন বসতে পারবে। এই বিশাল জায়গাটি যতো কাস্টমার ধারণ করতে পারে তার অর্ধেকের বসার ব্যবস্থা রয়েছে। এর মালিক যেনো স্পষ্ট একটি বার্তা দিচ্ছে-সবাইকে আমি নিছক টাকা। কামানোর জন্য রেস্টুরেন্ট ব্যবসা করি না। আমি যেটা করি সেটা এক ধরণের শিল্প!

শীতের এই পড়ন্ত বিকেলে মাত্র দুটো টেবিলে পাঁচ-ছয়জন কাস্টমার আয়েশ করে খাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে দীর্ঘ ভ্রমণপথে বিরতি দিয়ে খেয়ে নিচ্ছে এরা বা অন্য কারোর কাছ থেকে এই হোটেলের সুনাম শুনে চলে এসেছে হয়তো। তাকে ঢুকতে দেখে কিছু কাস্টমার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিলো, তবে খুব বেশিক্ষণের জন্য নয়, আবারো মনোযোগ দিলো নিজেদের সামনে রাখা সুস্বাদু খাবারের দিকে।

চারপাশে তাকিয়ে কোনো ওয়েটার দেখতে পেলো না। আস্তে করে কয়েক পা হেঁটে সামনের একটি টেবিলে বসে পড়লো সে। বেশ আরামদায়ক বসার ব্যবস্থা। সাধারণত রেস্টুরেন্টগুলো এরকম আরামের। ব্যবস্থা করে না। হাত-পা ছড়িয়ে বসা যায় এখানে। সেও তাই করলো। দীর্ঘ ভ্রমনে সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে আছে।

রেস্টুরেন্ট হিসেবে জায়গাটা অদ্ভুত। টেবিলে কোনো মেনু নেই। এটাও অদ্ভুত। কোনো ওয়েটারও চোখে পড়ছে না। একেবারেই ব্যতিক্রমী দৃশ্য। আশেপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ভেতরের উত্তর দিকে ছোট্ট একটা দরজা আছে, ওটা দিয়ে হয়তো ভেতরের কোনো ঘরে যাওয়া যায়। দরজার পাশেই রয়েছে ছোট্ট একটা জানালা। গাঢ়-কালচে কাঁচের কারণে ভেতরটা দেখা যাচ্ছে না।

পশ্চিম দিকে ফিরলো। আরো দুটো দরজা আছে। সাইন দেখে বুঝতে পারলো ওগুলো ওয়াশরুম, নারী-পুরুষ দু-জনের জন্যেই। খুট করে শব্দ হতেই চমকে তাকালো সে। তার পেছনে, ঠিক ডানদিকে এক লোক দাঁড়িয়ে। আছে। ওয়েটার হাতে খাবারের মেনু না থাকলে একজন কাস্টমার হিসেবেও ভুল হয়ে যেতে পারতো।

"মেনু দিয়ে গেলাম," বললো ছেলেটা। "আপনি দেখুন। অর্ডার করার দরকার হলে আমি চলে আসবো।" আর কোনো কথা না বলে চলে গেলো সে।

এই ওয়েটার কিভাবে বুঝবে কখন আমার অর্ডার করার দরকার হবে? ভাবলো সে। আজব। মেনুর দিকে চোখ গেলো। অন্যসব রেসটুরেন্টের মতো আইটেমের বাহূল্য নেই, তবে যে নামগুলো দেখতে পাচ্ছে তার বেশিরভাগই অপরিচিত। সম্ভবত, পরিচিত খাবারগুলোর নতুন করে নামকরণ করেছে এরা। মেনুতে কিছু আইটেম আলাদা করে চিহ্নিত করা আছে মুশকান'স স্পেশাল হিসেবে।

মুশকান'স কারি।
মুশকান'স সিক্রেসি!
মুশকান'স স্যুপ অব লাইফ!
মুশকান'স হাইব্রিড ক্র্যামচপ!
মুশকান'স গোল্ডেন ড্রিঙ্কস!
মুশকান'স জাস্ট টি!

মুশকান জিনিসটা কি? এটা কি কোনো আরবী-পার্সিয়ান খাবারের নাম? যেমন লেবানিজশওয়ার্মা?

সে বুঝতে পারলো এই রেস্টুরেন্টটি রহস্য সৃষ্টি করতে, রহস্য বানাতে পারঙ্গম, আর সেটা প্রকাশ করতে একেবারেই অকপট। রহস্য? আমি সেটা ভেদ করতেই এসেছি, মনে মনে বললো সে। মেনু থেকে চোখ সরিয়ে আশেপাশে তাকালো। ওয়েটারের কোনো দেখা নেই। এতো বড় রেস্টুরেন্ট অথচ একজনমাত্র ওয়েটার! তাও আবার ভুতের মতো নাজেল হয়, চোখের সামনে থাকে না।

উত্তর দিকে দরজা খুলে সেই ওয়েটারকে বের হয়ে আসতে দেখলো সে। তার কাছে এসে বললো, "জি, স্যার বলেন?"

"আমি লম্বা জার্নি করে এসেছি..পেট ভরে খেতে পারি এরকম কি খাওয়া যেতে পারে? তোমাদের মেনু দেখে তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

ওয়েটারের মুখে কোনো হাসি নেই, বরং কাস্টমারের কথা শুনে কিছুটা অসন্তুষ্ট হয়েছে মনে হলো। "আপনি ভাত-মাংস কিংবা ফিশ কারি নিতে পারেন, সাথে স্পেশাল কিছু?" "স্পেশাল মানে মুশকান'স জাতীয় কিছু?"।

তার কথার মধ্যে যে শ্লেষ আছে সেটা ওয়েটারকে রুষ্ট করলো। "জি, সেরকমই কিছু।" কাটাকাটাভাবে বললো সে।

"এই মুশকান জিনিসটা কি? অ্যারাবিয়ান নাকি পার্সিয়ান কুইজিন?"

ওয়েটার কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলো কাস্টমারের দিকে। "আপনি আমাদের এখানে প্রথমবার এসেছেন, মনে হয়?" "হ্যাঁ।"

সৌজন্যমূলক হাসি দিলো ছেলেটি। "এটা একটা নাম, স্যার।

“কিসের নাম?”

“আমাদের এই রেস্টুরেন্টের মালিকের নাম। উনিই আমাদের সব মেনু তৈরি করেছেন।”

“মেনু তৈরি করেছেন মানে?”

“উনি একজন শেফ…বলতে পারেন, খুবই অসাধারণ একজন শেফ।”

“ও,” মাথা নেড়ে কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিলো কাস্টমার। এরকম প্রত্যন্ত জায়গায় একজন মহিলা রেস্টুরেন্ট চালাচ্ছে, সে নিজে আবার শেফ? অসাধারণ শেফ! “আচ্ছা, ভাতের সাথে তাহলে কি নিতে পারি?” চিন্তা-ভাবনা বাদ দিয়ে খাবারের দিকে মনোযোগ দিলো। তার খিদে অসহ্য পর্যায়ে চলে যাচ্ছে।

“মুশকান’স কারি নিতে পারেন? বিফ কারি?”

“তাহলে তাই দাও।”

“ওকে, স্যার।”

ওয়েটার আর কিছু না বলে চলে যাচ্ছে দেখে সে অবাকই হলো।

“শোনো?” পেছন থেকে ডাকলো তাকে।

ঘুরে দাঁড়ালো ছেলেটা। “জি?”

“সাথে ডাল কিংবা ভাজি দিলে ভালো হয়..তোমাদের মেনুতে ওরকম কিছু-”

“ডাল আর কয়েক ধরনের ভর্তা পাবেন, স্যার,” তার কথা শেষ করার আগেই ওয়েটার বললো। “ওগুলো আমরা রাইসের সাথে এমনিই দেই, তাই মেনুতে মেনশন করা থাকে না।”

“ও,” ভুরু কপালে তুলে বললো সে। “ঠিক আছে।”

“আপনার যা যা লাগবে বলবেন, সমস্যা নেই।” ওয়েটার সোজা চলে গেলো বন্ধ দরজাটার দিকে।

দূরে বসে থাকা তিনজন কাস্টমারের দিকে তাকালো সে। এরা নিশ্চয় একসঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছে কোথাও। লোকগুলো এমন আয়েশ করে খাচ্ছে, দেখে মনে হচ্ছে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ খাবারের আস্বাদন করছে তারা। চুপচাপ খাচ্ছে আর একে অন্যের দিকে তাকিয়ে প্রশংসার দৃষ্টিতে ভাব বিনিময় করছে। ব্যাপারটা দেখার মতো। যেমন প্যান্টো মাইম করছে একেকজন! পোশাক আশাক দেখে মনে হচ্ছে বেশ শিক্ষিত আর ধনী, হাতের আঙুল চেটে চেটে খাওয়ার লোক নয় কোনোভাবেই কিন্তু এ মুহূর্তে তাই করছে!

অতো দূর থেকেও ঐ টেবিলের খাবারের সুস্বাদু গন্ধ তার নাকে এসে লাগছে। অদ্ভুত আর সম্মোহনী এক গন্ধ!

উঠে দাঁড়ালো সে। এইমাত্র অর্ডার দিয়েছে, নিশ্চয় খাবার আসতে কমপক্ষে দশ-পনেরো মিনিট লাগবে। ওয়েটারের গদাইলস্করি চালচলন দেখে তার মনে হচ্ছে আরো বেশিও লাগতে পারে। এই ফাঁকে ওয়াশরুম থেকে হাত-মুখ ধুয়ে আসা দরকার।

তাহলে অদ্ভুত এই রেস্টুরেন্টের মালিক একজন মহিলা! ওয়াশরুমের দিকে যাওয়ার সময় মনে মনে বললো সে। এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারটি তাকে আরো বেশি আগ্রহী করে তুললো।

সিজন করা মোটা মোটা বাঁশ দিয়ে তৈরি এর দেয়ালগুলো। দুটো বেসিন আর একটি ইউরিনাল প্যান। পাশের একটি দরজায় লাগানো সাইন। দেখে বুঝতে পারলো ওটা মহিলাদের জন্য নির্ধারিতা।

শার্টের স্লিভ গুটিয়ে বেসিনের ট্যাপ ছেড়ে দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে ফেললো। সামনের আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখলো সে। আজ সকালে শেভ করা হয় নি। একদিন শেভ না করলেই তার মুখের দাড়ি বেশ বেড়ে যায়। বিশ্রি দেখায় তাকে। অর্ধেকের বেশি দাড়ি-গোঁফ পেকে গেছে মধ্যবয়সের আগেই। ইদানীং নিজেকে আরেকটু কমবয়স্ক দেখানোর জন্য প্রতিদিন শেভ করে, তবে আজ সেটা করতে ভুলে গেছিলো।

ভেজা হাতের আঙুল দিয়ে মাথার চুলগুলো আচড়ে নিলো। সে কখনও চিরুনী ব্যবহার করে না। তার হাতের চিকন আঙুলগুলো চিরুণীর চেয়েও বেশি ভালো কাজ করে। আয়নায় তাকিয়ে দেখলো নিজেকে। ভেজা চুলে তাকে বেশি হ্যান্ডসাম লাগে!

ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে টেবিলের কাছে ফিরে এসে অবাক হয়ে গেলো। এরইমধ্যে খাবার চলে এসেছে। ধোঁয়া উঠছে মুক্তার মতো সাদা-সাদা ভাত থেকে। মুশকান'স কারি থেকে বের হচ্ছে অজ্ঞাত আর প্রলুব্ধকর সেই গন্ধ। ডালের বাটিটাও চোখ এড়ালো না। চমৎকার রঙ! এরকম চমৎকার রঙের ডাল সে কখনও দেখে নি। ঠিক হলুদ নয়, আবার বাসন্তি রঙও বলা যায় না। ডালের মধ্যে ভেসে আছে ছোটো ছোটো লাল-সবুজ মরিচের ফালি!

চেয়ারে বসে পড়লো। একটা প্লেটে তিন ধরণের ভতা। সবগুলোই বলের আকৃতিতে। বেশিরভাগ রেস্টুরেন্টে এমনটিই দেখা যায় কিন্তু এখানে একটু ব্যতিক্রম আছে। ছোটো গলফ বলের মতো ভতার দলাগুলো তার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

চোখ আর হাসিমুখটি বানানো হয়েছে দুটো লালচে দানা আর কেপসিকনের সরু-লম্বা একটি ফালি দিয়ে।

আনমনেই হেসে ফেললো। ক্ষিদের বায়না মেটাতে আর বেশি দেরি করলো না। ঝটপট খেতে শুরু করলো। খাবারগুলো তার গলা দিয়ে নেমে যাবার সময় বিমোহিত হয়ে গেলো এর স্বাদের কারণে।

দশ মিনিট পর আবিষ্কার করলো চারপাশের সবকিছু ভুলে সে শুধু খেয়েই যাচ্ছে। প্রচণ্ড খিদের সময় সব খাবারের স্বাদই ভালো লাগে কিন্তু স্বীকার করতে বাধ্য হলো, যে খাবার মুখে পুরছে তা সত্যি অসাধারণ। সামান্য ভর্তা থেকে শুরু করে ডাল পর্যন্ত অসম্ভব সুস্বাদু। আর মুশকান'স কারির কথা ভাষায় প্রকাশ করতে পারলো না। সত্যি বলতে, এটা গরুর নাকি খাসির মাংস সেটা ধরতে গিয়ে হিমশিম খেলো। কার কাছ থেকে যেনো শুনেছিলো, ভালোভাবে রান্না করলে গরু আর খাসির মাংসের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। আরো অবাক হলো, গরুর মাংসে যে কটু একটা ঘ্রাণ থাকে সেটা নেই। সম্পূর্ণ নতুন একটি গন্ধ নাকে আসছে আর সেটা খাবারের রুচি আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে।

যে খাবারগুলো দেয়া হয়েছিলো তার সবগুলো শেষ করে আঙুল চাটতে চাটতে আশেপাশে তাকালো। ওয়েটারকে দেখতে পাচ্ছে না। দূরের টেবিলে বসা তিনজন লোকের দিকে চোখ গেলো। এরা আবার নতুন করে। কিছু খাবারের অর্ডার দিয়েছে। তিনজনের মধ্যে দু-জনের স্বাস্থ্য বেশ ভালো। মোটাসোটা, দেখেই মনে হয় পেটুক। লোকগুলো চামচ দিয়ে কিছু একটা খাচ্ছে। মুখে থেকে বের করার সময় চামচটা এমনভাবে চেটে চেটে বের করছে যেনো খাবারের সামান্যতম অংশও চামচে রেখে দেবার কোনো ইচ্ছে তাদের নেই। সঙ্গে সঙ্গে নিজের আঙুল চাটা বন্ধ করে দিলো সে। বিব্রতকর একটি অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো চেহারায়। চোখ সরিয়ে নিতেই দেখতে পেলো তার টেবিলের উপর একটি সুপ আর একটি গ্লাস রাখা। একটু চমকে উঠলো। এগুলো কখন রেখে গেলো? অনেকদিন পর গা ছমছম করে উঠলো তার। এখানে ঢোকার আগেই বুঝতে পেরেছিলো জায়গাটা খুবই রহস্যজনক, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে একদম ভুতুরে। কয়েক মুহূর্ত পর্যন্ত একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সুপ আর গ্লাসের দিকে। "স্যার?"

চমকে উঠে মুখ তুলে তাকালো। সেই ওয়েটার দাঁড়িয়ে আছে তার ডানপাশে।

"সুপটা খাওয়ার পর একটু বিরতি দিয়ে ড্রিঙ্কসটা নেবেন।"

অবাক হলো সে। এরা দেখি রীতিমতো চাপিয়ে দিচ্ছে কে কোন খাবার খাবে, কখন খাবে! “আমি তো এ দুটো অর্ডার দেই নি…” আস্তে করে বললো।

এই প্রথম মুচকি হাসলো ওয়েটার। “আপনার খাওয়া শেষ..তাই এ দুটো আইটেম নিয়ে এলাম। খেয়ে দেখবেন, অনেক ভালো লাগবে।”

“তোমাদের রেসটুরেন্টে কি সবাইকে এভাবে খাবার দেয়া হয়?”

ছেলেটা কিছু বললো না, অপেক্ষা করলো আরো কিছু শোনার জন্য।

“মনে কিছু করবে না, আমি আসলে সিরিয়াসলিই জানতে চাচ্ছি।”

“স্যার, প্রথমত আমরা এটাকে রেসটুরেন্ট বলি না। অতিথিশালা বলি। এখানকার কোথাও রেসটুরেন্ট শব্দটি পাবেন না আপনি।”

ভুরু কপালে তুললো শহুরে কাস্টমার। “সেজন্যেই না-চাইলেও অনেক আইটেম দেয়া হয়?”

“জি, স্যার,” ওয়েটার হাসিমুখে বললো। “মেহমানদারি না চাইলেও তাকে কিছু দেয়া যায়।”

“কিন্তু আমি কি খেতে চাই সেটা জানতে হবে না?”

“কাস্টমারের অর্ডার দেখে আমরা বাড়তি কিছু দিয়ে দেই। আমরা জানি কোনটার সাথে কি খেলে তৃপ্তি পাওয়া যায়। আর কিছু না বলে ওয়েটার চলে গেলো।

সশব্দে হাফ ছেড়ে সুপের বাটি থেকে এক চামচ সুপ নিয়ে মুখে দিলো। স্বাদের তীব্রতায় দুচোখ বন্ধ হয়ে এলো তার। দারুণ!

পাঁচ মিনিট পর খালি সুপের বাটিটার দিকে তাকিয়ে এই প্রথম তার মনে প্রশ্ন জাগলো এটা কিসের সুপ? নিজে নিজে উত্তরটা জানার চেষ্টা করলো কিন্তু নিশ্চিত হতে পারলো না। একটা ব্যাপারে সে পুরোপুরি নিশ্চিত, এ জীবনে টাটকা সবুজ রঙের সুপ কখনও খায় নি।

এটা কি সুপ অব লাইফ? মেনুতে এরকম কিছু দেখেছিলো। হতে পারে। জীবনের রঙ তো সবুজই হওয়ার কথা। সম্ভবত রঙের কারণে সুপের এমন নামকরণ।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো। কোমরের বেল্টটা একটু আলগা করে নিলে ভালো হয় কিনতু সেটা করতে ইচ্ছে করছে না। এরকম কাজ অন্য কাউকে করতে দেখলে তার হাসি পায়। পর পর তিনটি ঢেকুর উঠলো এবার। তৃপ্তির ঢেকুর। টের পাচ্ছে তার শরীরটা কেমন রিল্যাক্স হয়ে গেছে। ভ্রমণের ক্লান্তি কোথায় উড়ে গেছে কে জানে। চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে। ভর দুপুরে ঘুমানোর অভ্যেস তার নেই কিন্তু আজ খুব ইচ্ছে করছে। আরো দু তিনটি ঢেকুর দেবার পর ড্রিঙ্কসের গ্লাসটা হাতে তুলে নিলো। সাদা। চিনেমাটির গ্লাস বলে ড্রিঙ্কসের রঙটা এতোক্ষণ চোখে পড়ে নি। গাঢ় সোনালি রঙের ড্রিঙ্কস দেখে আরেকবার বিস্মিত হলো সে।

গোল্ডেন পন্ড ড্রিঙ্কস! মেনুতে এটাই তো লেখা ছিলো? বুকভরে নিঃশ্বাস নিয়ে চুমুক দিলো ড্রিঙ্কসে। আবারো বিস্মিত হলো। এ জীবনে ঝাল, টক আর মিষ্টির মিশ্রনে কোনো ড্রিঙ্কস সে পান করে নি। সম্ভবত, বিভিন্ন ধরণের মসলাও দেয়া হয়েছে এতে। সব মিলিয়ে যে রাসায়নিক মিশ্রণটি তৈরি হয়েছে সেটা অজ্ঞাত, অব্যাখ্যাত। কিন্তু স্বর্গীয় স্বাদের।

খালি গ্লাসটি রেখে দিলো। অনুভব করলো সারা শরীরে এক ধরণের শিহরণ বয়ে যাচ্ছে। ভালো লাগার একটি অনুভূতি। কেমন ঘোরলাগা এক আবেশে বসে রইলো মিনিটের পর মিনিট। সম্বিত ফিরে পেতেই চারপাশে তাকালো। কেউ নেই। যে তিনজন লোক দূরের টেবিলে বসে খাচ্ছিলো তারা চলে গেছে কখন টেরই পায় নি।

উদভ্রান্তের মতো এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো সে। তার মধ্যে দেখা দিলো অস্থিরতা। “স্যার?”

চমকে উঠে পেছনের দিকে তাকালো। তার পেছন দিকে ডানপাশে ওয়েটার দাঁড়িয়ে আছে।

“আর কিছু খাবেন?”

“না।” ঢোক গিলে আবার বললো, “বিলটা নিয়ে-”।

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বিলটা টেবিলের উপর রেখে দিলো ওয়েটার। বিল দেখে অবাক হলো সে। মহাসড়কের পাশে রেসটুরেন্টগুলো ক্রেতাদের গলাকাটার জন্য কসাইর মতো ধারালো চাকু নিয়ে বসে থাকে, সেদিক থেকে দেখলে রবীন্দ্রনাথ বেশ ব্যতিক্রম।

তিনটা একশ' টাকার নোট বের করে ওয়েটারের হাতে ধরিয়ে দিলো। “বাকি টাকা ফেরত দিতে হবে না। ওটা তোমার বখশিস।”

_ “সরি স্যার,” নির্বিকার ভঙ্গিতে বললো ছেলেটি, যার বয়স পঁচিশের বেশি হবে না। “আমরা টিপস নেই না।”

“কি?” আবারো অবাক হলো সে। টিপস নেয় না? পাগল নাকি?

“এখানে ওয়েটারদেরকে টিপস দেয়া নিষেধ।”

চারপাশে চোখ বুলালো। “কেউ তো দেখছে না, রেখে দাও।” বলেই চোখ টিপে দিলো সে।

আর কোনো কথা না বলে চুপচাপ চলে গেলো ওয়েটার।

"আজব জায়গা!" অস্ফুটস্বরে কথাটা বের হয়ে গেলো তার মুখ দিয়ে। উঠে দাঁড়ালো সে। অনেকদিন পর পরিপূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে খাবার খেয়েছে। দেহমনে অলস একটি ভাব চলে এসেছে এখন। তার মনে হচ্ছে আর কিছু করার আগে একচোট ঘুমিয়ে নিতে হবে। দরজা দিয়ে যে-ই না বের হয়ে যাবে অমনি পেছন থেকে সেই ওয়েটার তাকে ডাকলো।

"স্যার?"

ঘুরে তাকাতেই টাকাগুলো বাড়িয়ে দিলো তার দিকে। "তোমাদের খাবার কিন্তু সত্যি অসাধারণ," বললো সে।

আলতো করে হাসলো ওয়েটার, যেনো এ-রকম প্রশংসা শুনে শুনে বহু আগেই তারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

টাকাগুলো হাতে নিয়ে বললো, "অনেকদিন পর ভালো স্বাদের খাবার খেলাম।"

"থ্যাঙ্কস, স্যার," সৌজন্যবশত বললো ছেলেটি।

"আমাকে না, তোমাদের মালিককে থ্যাঙ্কস জানিয়ে দিও আমার তরফ থেকে।"

"জি, স্যার। অবশ্যই জানিয়ে দেবো।"

থুতনীর নিচে চুলকে নিলো সে। "উনার পুরো নাম কি?"

ওয়েটার একটু চুপ থেকে বললো, "মুশকান জুবরি।"

"উনি কি এখানকার স্থানীয়?"

"এটা আমি জানি না, স্যার।" কথাটা বলেই চলে গেলো ওয়েটার।

পেছনের পকেটে মানিব্যাগটা ঢুকিয়ে নিলো সে। বুঝতে পারছে, তাকে আরো বেশি সতর্ক হতে হবে। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের কারো সাথে কথা বলার সময়!

.

অধ্যায় ১

সন্ধ্যার অন্ধকার নামার আগেই রাস্তার ওপারে জ্বলজ্বল করে উঠলো। রবীন্দ্রনাথ।

"ওয়াক থু!" সাইনটার দিকে তাকিয়ে শব্দ করে থুতু ফেললো রহমান মিয়া। যেনো বুকের ভেতরে দলাপাকানো ঘৃণা বেরিয়ে এলো।

"কি মিয়া, কারে থুতু মারলা?"

রহমান দেখলো ভুতের মতো কোত্থেকে যেনো হাজির হয়েছে অতিপরিচিত এক কাস্টমার। লোকটার মুখে দুষ্টুহাসি লেগে রয়েছে। ভরসন্ধ্যায় এর মতো কাস্টমার পেয়ে মোটেও খুশি হতে পারলো না। "কারে আবার মারুম...আজাইরা কথা..মুখে থুতু আইছিলো ফালায়া দিলাম," বিরক্ত হয়েই বললো দোকানি।

"ঐ ডাইনিটার উপরে চেইতা আছে, জানি তো," গুলখাওয়া লালচে দাঁত বের করে বললো কাস্টমার। "এহন তো আমি ছাড়া কেউ তোমার গুড়ের চা খায় না। খালি বিড়ি-সিগরেট বেইচা কি চলে।" আবারো লালচে দাঁতগুলো বিকশিত হলো।

গুড়ের চা বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো রহমান, কথাগুলো যেনো আমলেই নিলো না।

"গুড় ইটটু বাড়ায়া দিও..তুমি কইলাম দিন দিন কিপ্টা হইয়া যাইতাছো। মিয়া...গুড় দিবারই চাও না। পারলে গরম পানি গুলায়া খাওয়াইয়া দিবার চাও।"

একমাত্র কাস্টমারের দিকে চকিতে তাকিয়ে বাঁকা হাসি দিলো রহমান। "এতো মিষ্টি খাইলে ডাইবিটিস হইবো।"

"ঐসব বড়লোকি রোগ আমাগো হইবো না।"

"রোগশোক কি বড়লোক-ছোটোলোক দেহে নি," রহমান মিয়া চায়ে গুড় মেশাতে মেশাতে বললো।

"দেহে না তো কি," তর্ক জুড়ে দেবার জন্য বললো কাস্টমার। "এই ধরো-"

"বেনসন আছে?"

কাস্টমারে কথা থেমে গেলো। রহমান মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলো ভদ্রগোছের এক লোক দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। মাঝারি উচ্চতা, পরিপাটি পোশাক, চোখেমুখে কেমন খবরদারি করার ভঙ্গি। দেখেই বোঝা যায় শহর থেকে এসেছে। মুখটা চেনা চেনা লাগলো। হুম, তার মনে পড়েছে। সম্ভবত কয়েক ঘণ্টা আগে এই লোককেই দেখেছে ঐ হোটেলে ঢুকতে হলুদ রঙের ট্যাক্সিতে করে এসেছিলো। বাইরে দাঁড়িয়ে ভালো করে দেখছিলো হোটেলটি। খেয়েদেয়ে যখন বের হয়ে যাচ্ছিলো তখন দেখেছে লোকটার মুখে কেমন তৃপ্তির আভা লেগে রয়েছে। ওখান থেকে বের হওয়া সব কাস্টমারেরই একই অবস্থা হয়। এ আর নতুন কি। কয়েক বছর ধরেই তো দেখছে এ দৃশ্য।

"আছে," ছোট্ট করে বললো দোকানি।

"এক প্যাকেট দিন।"

রহমান মিয়ার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। রবীন্দ্রনাথের ঠিক পঞ্চাশ গজ দূরে রাস্তার ওপারে ছোট্ট একটি চা-বিস্কুটের টঙের মালিক। বড় আর ক্ষমতাবানের সামনে দুর্বল-গরীবেরা

যেমন কুঁকড়ে থাকে, তেমনি তার টঙ দোকাটিও কাচুমাচু হয়ে মাথা নুইয়ে থাকে সব সময়, যদিও বয়সে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কয়েক বছরের বড়!

ওই রেস্টুরেন্ট থেকে খেয়েদেয়ে যারা বের হয় তারা এতোটাই তৃপ্ত থাকে যে, খুব কম সময়ই তার দোকানে এসে চা-সিগারেট খায়, এক প্যাকেট বেনসন-ফাইভ-ফাইভ চাওয়া তো দূরের কথা। তাই সিগারেটের কার্টন থেকে প্যাকেটটা বের করতে করতে মনে মনে লাভের হিসেবটা না করে পারলো না সে। অঙ্কটা খুব সহজ-প্রতিটি সিগারেটে যদি এক টাকা লাভ হয় তাহলে এক প্যাকেটে পুরো বিশ টাকা।

নতুন কাস্টমার, যে কিনা একটু আগে রবীন্দ্রনাথে এসেছিলো, প্যাকেটটা হাতে নিয়েই একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেললো। আরেক কাপ চা। বিক্রি হবার সম্ভাবনা দেখতে পেলো রহমান। লোকটার তীক্ষ্ণণদৃষ্টি আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দোকানের সামনে দুটো কাঠের বেঞ্চের একটাতে বসে আছে একটু আগে আসা হ্যাংলা মতোন লুঙ্গি পরা মাঝবয়সী কাস্টমার, তাকেও চকিতে দেখে নিলো সে।

"রঙচা হবে?"

"হইবো।"

"এক কাপ দিন। চিনি কম।" বেঞ্চে বসে পড়লো সে।

"গুড়ের চা দেই? এক্কেবারে খাঁটি গুড়...কুনো ভেজাল নাই।"

রহমান মিয়ার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো নতুন কাস্টমার।

লুঙ্গি পরা কাস্টমারে দিকে চায়ের কাপ বাড়িয়ে দিলো দোকানি। "লও"

চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে সিগারেট খেতে থাকা ভদ্রলোককে পা থেকে মাথা পর্যন্ত মেপে নিলো সে। সশব্দে চুমুক দিলেও তার চোখ এক মুহূর্তের জন্যেও সরছে না নতুন

কাস্টমারের উপর থেকে।

রহমান মিয়া এবার আরেক কাপ গুড়ের চা বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। এমন সময় টঙ দোকানের পাশ ঘেষে একটি সাদা প্রাইভেটকার চলে গেলো রবীন্দ্রনাথের দিকে।

"এসপিসাব আইছে মনে হয়, প্রথম কাস্টমার বললেও রহমান কোনো জবাব দিলো না। "আইজ তো বিসুদবার...পুরা হাট বইসা যাইবো। এমপি সাবেও আইছে হুনলাম। মনে হয় ডাইরেক্ট ঐ বাড়িতে গেছে," সশব্দে চায়ে চুমুক দিয়ে রহস্যময় হাসি দিলো হ্যাংলা।

রহমান মিয়া চা বানাতে বানাতে বললো, "সব খবরই দেহি থাকে তুমার কাছে।"

কথাটা আমলে নিলো না হ্যাংলা, নতুন কাস্টমারের দিকে মনোযোগ দিলো। "ভাইজান কি নতুন আইছেন এইহানে?"

"হুম," সিগারেটে টান দিয়ে বললো সে। রবীন্দ্রনাথের সামনে পার্ক করা। গাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে এখনও।

"আপনেরে দেইখাই বুঝছি ক্যান আইছেন।" লুঙ্গি পরা লোকটি হেসে বললো।

হ্যাংলার দিকে ভুরু কুচকে তাকালে শহুরে লোকটি। একটু অবাকই হলো যেনো। "কেন এসেছি?"

"ঐ হোটেলে খাইতে আইছেন।" হ্যাংলা তার হলদে দাঁত বের করেই রেখেছে, বন্ধ করার নাম নেই।

কথাটা শুনে সঙ্গে সঙ্গে অভিব্যক্তি বদলে গেলো তার, মুচকি হেসে মাথা দোলালো। "না। অন্য একটা কাজে এসেছি।"

"ও" হলদে দাঁতগুলো আড়ালে চলে গেলো। "তয় একবার ওইখানে গিয়া টেস্ট কইরা আইতে পারেন...অনেক দূর থেইকা লোকজন আসে খাইতে। মেলা নাম-ডাক।"

"উনি ওইখানে খাইছেন, তোমারে আর কইতে হইবো না," শহুরে কাস্টমারের দিকে চায়ের কাপটা বাড়িয়ে লুঙ্গি পরা লোকটিকে বললো। রহমান। "অইন্যের তল না পিটায়া নিজের ঢোল পিটাও।"

হ্যাংলা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে তাকালো দোকানির দিকে, কী বলবে কথা খুঁজতে লাগলো।

চায়ের কাপটা নিয়ে দোকানির দিকে তাকালো শহুরে কাস্টমার। দুপুরের পর যে এখানে এসেছিলো তা এই দোকানি দেখেছে। মহাসড়কের পাশে নিরিবিলি জায়গায় ছোট্ট একটি টঙ দোকান, দেখেই বোঝা যায় দিনের বেশিরভাগ সময় আক্ষরিক অর্থেই মাছি মারে এই লোক। তার উনমুক্ত গুড়ের চাকতির উপরে এখনও ভনভন করে কিছু মাছি ঘোরাফেরা করছে আর সে অভ্যাসবশত বার বার হাত নেড়ে তাড়াচ্ছে ওগুলো। এমন লোকের আগ্রহ যে সামনের রেসটুরেন্টের দিকেই বেশি থাকবে সেটাই স্বাভাবিক।

"হুম। লোকজনের মুখে শুনেছিলাম ওখানকার খাবার নাকি খুব ভালো। কিনতু আমার কাছে তেমন ভালো লাগে নি," গুড়ের চায়ে চুমুক দেবার আগে বললো সে।

লুঙ্গি পরা কাস্টমারের মতো দোকানিও অবাক হলো কথাটা শুনে। এখন পর্যন্ত কেউ এরকম কথা বলে নি। ঐ ডাইনিটার শত্রুরাও এ কথা বলতে সঙ্কোচ বোধ করে।

"কি কন?" বিস্মিত কাস্টমার বললো। "ওইখানকার খাওন খাইতে কতো দূর থেইকা লোকজন আসে...কতো নামডাক...আর আপনে কইতাছেন ভালা লাগে নাই!"

"আরে মিয়া, উনার ভালা না লাগলেও কি কইতে হইবো ভালা লাগছে?" রহমান কিছুটা মেজাজের সাথেই বললো। "খাওন-দাওনের ব্যাপার..সব খাওন সবার ভাল লাগে এ কথা ঠুনছো কুনোদিন?"

"না, মাইনে," লোকটার বিস্ময় এখনও কাটছে না, "কেউ তো খারাপ কয় না।"

"কয় না আবার কি? এই যে উনি কইলেন এহন।"

"আমার যে খুব খারাপ লেগেছে তা নয়," বললো শহুরে লোকটি। "আসলে যে-রকম নামডাক শুনেছি খাবার খেয়ে সে-রকম মনে হয় নি। এই আর কি।"

"আপনে নিজে খাইছেন, আপনে কইতেই পারেন ভালমন্দ। কেউ তো আর অন্যের মুখে খায় না, কি ক?"

মুচকি হাসলো সে। এই দোকানি ঠিকই বলেছে। কেউই অন্যের মুখে খায় না।

"খাওন ভালা লাগে নাই ক্যান আপনের?" হ্যাংলা জানতে চাইলো।

"আমার মনে হয়েছে ওখানকার খাবারের চেয়ে ভাবই বেশি। আর এটাই মানুষকে মুগ্ধ করে।"

"এক্কেবারে ঠিক কইছেন," রহমান মিয়া বললো। "ভাব দেখেন ...দিছে। ভাতের হোটেল আর নাম রাখছে রবিঠাকুর!"

মুচকি হাসলো সে।

"রবিঠাকুর না...রবীন্দনাথ এইহানে কুনোদিন খাইতে আসেন নাই!" দোকানির ভুল শুধ্রে দিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বললো হ্যাংলা মতোন লোকটি।

"ঐ ব্যাটা কবে মইরা ভূত...সে ক্যান এইহানে খাইতে আইবো?"

"আরে মিয়া আসে নাই দেইখাই তো ইমুন নাম রাখছে।"

"যত্তোসব বুজরুকি।"

"চ্যাতে ক্যান, মিয়া? আরে একটু ইস্টাইল করছে, বুঝো না?"

"ইস্টাইল না ছাই," বিরক্ত হয়ে বললো রহমান। "ভাব লইছে।"

"ইসটাইল মাইনে তো ভাব লওয়াই। হে তো তোমার মতো মুকখু-শুকখু মানুষ না। বিরাট শিক্ষিত। দেমাগে মাটিতে পা ফালায় না। তার উপরে জমিদারের বৌ...একটু ভাব লইবারই পারে।"

"অ্যাতো শিক্ষিত হইলে ভাতের হোটেল খুলছে ক্যান, অ্যাঁ?" রহমান রেগেমেগে বললো। "আর জমিদারের বৌ হে কেমনে অয়? জমিদারের কুনো ঠিক-ঠিকানা নাই বৌ আয়া নাড় গাঁড়ছে এই সুন্দরপুরে!"

"রহমান মিয়া, আস্তে কও, ঐ বেটির কানে গেলে তোমার টঙ চাঙ্গে উঠায়া দিবো," হ্যাংলা বললো ইঙ্গিতপূর্ণভাবে। "হের ঘাটে কইলাম বাঘে মহিষে একলগে খানা খায়। একটু আগে একটা মহিষ আইছে," কথাটা বলেই চোখ টিপে চায়ের কাপ রেখে উঠে দাঁড়ালো সে। "যাই, মহিষটার লগে একটু দেখা কইরা আসি। চায়ের দামটা লেইখা রাইখো।"

"ইতরের বাচ্চা!" আতর আলী রাস্তার দিকে পা বাড়াতেই তিক্তমুখে অসফুটস্বরে বলে উঠলো রহমান।

"কিছু কইলা নাকি, মিয়া?" পেছন ফিরে বললো আতর।

"না। তুমারে না...কইলাম পিপড়ার বাচ্চা! ধুর, অ্যাতো পিপড়া ক্যান গুড়ের মইদ্যে?" সত্যি সত্যি গুড় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলে চায়ের দোকানি।

বাঁকা হাসি হেসে হ্যাংলা চলে গেলো রবীন্দ্রনাথের দিকে।

"কাম-কাইজ কিছু করে না, খালি মাইনষের খবর নিয়া থাকে," গজগজ করতে করতে বললো রহমান। "হাদে কি সবতে কয় বিবিচি।"

“বিবিচি মানে?” চায়ে চুমুক দিয়ে বললো শহুরে লোকটি।

“ঐযে রেডিওর খবর আছে না, বিবিচি?”

“ও,” বুঝতে পারলো সে। সঙ্গে সঙ্গে চায়ের কাপটা রেখে উঠে। দাঁড়ালো। “কতো হয়েছে আমার?”

“একশ ষাইট।”

পকেট থেকে দুশ’ টাকা বের করে বাড়িয়ে দিলো দোকানির দিকে। নোট দুটো হাতে নিয়ে রহমান বললো, “হালায় কুনো কাম-কাইজ করে না, পুলিশের ইনফর্মার, বুঝলেন?”

“হুম,” মাথা নেড়ে সায় দিলো কাস্টমার।

“দুনিয়ার সব খবর রাখে ইতরের বাচ্চা...এইহানে কুন লোকের পাছায় খাজলি আছে তাও হে জানে!”

মুচকি হেসে ভাঙতি টাকাগুলো পকেটে ভরে সে আবারো পা বাড়ালো রবীন্দ্রনাথের দিকে।

রহমান মিয়া সেদিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলে উঠলো, “মুখে তো কইলো খাওন ভালা না...এহন দেহি ওইদিকেই যায়! মাইষে কী আর হাদে কয়, ঐ বেটি সব্বতেরে জাদু কইরা ফালায়!”

.

অধ্যায় ২

রবীন্দ্রনাথের বড় দরজাটা দিয়ে ভেতরে উঁকি মেরে যে-ই না দেখলো এসপিসাব নেই সঙ্গে সঙ্গে আতরের ঠোঁটে লম্পটমার্কা হাসি ফুটে উঠলো।

ছ্যাদা পাইলে ব্যাটামানুষের হুঁশ থাকে না। খালি ছ্যাদার মইদ্যে হান্দাইতে চায়!

সেই হাসি মুখে লাগিয়ে রেখেই বাইরে পার্ক করা এসপির গাড়ির সামনে চলে গেলো সে। এসপি'র ড্রাইভার গান শুনছে, তার সাথে কথা বলতে গেলে সুবিধা করতে পারলো না। আতরের সালামের জবাবে বিরক্তমুখে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো। মুসলমান হয়ে আরেক মুসলমানের সালাম নেয়াটা ফরজ, কিন্তু এই ফরজ কাজটা বাদ দিয়ে হারামজাদা হিন্দিগান শুনতেই বেশি মনোযোগী। চুতমারানির পোলা, মনে মনে গালিটা দিয়ে যেই না কয়েক পা বাড়িয়েছে অমনি থমকে দাঁড়ালো সে।

"আতর আলী?"

পেছন থেকে কেউ তার নাম ধরে ডেকেছে। ঘুরে দাঁড়াতেই দেখতে পেলো একটু আগে রহমান মিয়ার টঙের সেই কাস্টমারকে। লোকটা সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো আতর।

"আপনার সাথে একটু কথা বলতে পারি?" শহুরে কাস্টমার ভদ্রভাবে বললো তাকে।

"কন, কি কইবেন।"

"কোথাও গিয়ে একটু বসি?"

অবাক হলো ইনফর্মার। তবে এরকম ঘটনা তার জন্য একেবারে বিরল নয়। মাঝে-মধ্যেই অচেনা লোকজন তার সাথে আগ বাড়িয়ে কথা বলতে চায়, কিছু ইনফর্মেশন জানতে চায়। অনেকে আবার নিষিদ্ধ জিনিসপত্রের খোঁজও করে। "চলেন, ঐ টঙ দোকানেই যাই," রহমান মিয়ার দোকানটা দেখিয়ে বললো সে।

“ওখানে না, অন্য কোথাও।”

শহুরে কাস্টমারের দিকে ভালো করে তাকালো আতর। এই লোকটা কে হতে পারে? কি চায়? লোকাল থানার ইনফর্মার সে, কাউকে ভয় করে না। তার সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে তাকে দেখে আন্দাজ করার চেষ্টা করলো।

“তাইলে চলেন, পেট্রলপাম্পের লগে একটা বটগাছ আছে...ঐটার নীচে বইসা কথা কওয়া যাইবো। রহমান মিয়ার টঙে বইসা কথা কইলে বেবাকৃতে জাইন্যা যায়। বুইড়ার আবার যার-তার লগে প্যাচাল পাড়নের স্বভাব।”

আতর এগিয়ে গেলো রবীন্দ্রনাথের বামপাশে বিশাল পেট্রলপাম্পের দিকে, তাকে অনুসরণ করলো শহরের লোকটি। পাম্পের ঠিক বিশ-ত্রিশ গজ দূরে একটি বিশাল বটগাছ, সেটার চারপাশ গোল করে ইট-সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো একটি চত্বর।

“বসেন,” শানবাঁধানো বটের নীচে বসে বললো আতর আলী।

শহূরে লোকটি সিগারেট ফেলে পা দিয়ে পিষে বসে পড়লো।

“কন, কি কইবেন?”

ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করলে আতরের চোখে সেটা এড়ালো না। “উমম...ঐ রেস্টুরেন্টের মালিক সম্পর্কে কিছু জানতে চাইছি...আমার ধারণা আপনার চেয়ে বেশি এ-ব্যাপারে কেউ খবর রাখে না।”

ভুরু কুচকে ফেললো সে। প্রশংসা তাকে বিগলিত করতে পারলো না। “আপনে কে, ভাই?”

চুপ মেরে রইলোশহুরে লোকটি।

“সাম্বাদিক?” আন্দাজ করে বললো ইনফর্মার।

স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিলো ভদ্রলোক, যেনো অনিচ্ছায় স্বীকার করতে হচ্ছে পরিচয়টা।

“আমি আগেই বুঝবার পারছিলাম,” তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠলো। আতরের মুখে। টিভির না পেপারের?”

“উমমম…পেপারের।”

“কুন পেপারের?”

“মহাকাল।”

আতরের চোখেমুখে সশ্রম ফুটে উঠলো এবার। “আচ্ছা…” একটু ভেবে বললো, “ঐ বেটির খবর জানবার চান?”

মাথা নেড়ে সায় দিলো শহুরে লোকটি।

“আপনের নাম কি?”

“নুরে ছফা।”

“কি!” নামটা ধরতে পারলো না ইনফর্মার।

“নুরে ছফা,” একটু ধীরে আর জোরে বললো এবার। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাকে একাধিকবার নিজের মান্ধাতা আমলের নামটা উচ্চারণ করতে হয়।

“ও।” আতরের চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে সে কখনও এমন অদ্ভুত নাম শোনে নি। “ঐ বেটির খবর দিয়া কি করবেন?”

নুরে ছফা যেনো হাফ ছেড়ে বাঁচলো। "উনার হোটেল আর উনাকে নিয়ে একটা রিপোর্টিং করবো আমি কিন্তু ঐ মহিলা সম্পর্কে এই এলাকার লোকজন তেমন কিছুই জানে না। উনার হোটেলের লোকজন তো মুখই খোলে না কোনো ব্যাপারে। খুবই সমস্যার মধ্যে পড়ে গেছি।"

বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে সায় দিলো আতর। এই সাংবাদিক কেন ঐ হোটেলের খাবার পছন্দ না করলেও খেতে গেছিলো সেটা বুঝতে পারলো। "ওই হোটেলে যারা কাম করে তারা কেউই এই এলাকার না..জানবো। কেমনে, কন? সব বাইরের ডিসটিকের লোক।"

"কিন্তু এই এলাকায় যারা থাকে তারাও তো তেমন কিছু জানে না?"

"ঐ বেটি এইখানকার মানুষ না। কয়েক বছর আগে আইছে। সুন্দরপুরে। ওর হিস্টোরি মাইনুষে কেমনে জানবো?"

"তাহলে আপনিও কি খুব বেশি জানেন না?"

আতর একটু থতমত খেলো। "আরে কি কন, আমি জানুম না ক্যান?"

ছফা অপেক্ষা করলো, আরো কিছু শুনতে চায় সে।

"বেটির অনেক পাওয়ার, বুঝলেন? ডিসি, এসপি, ইউনও-টিএনও সবুতে হের পিছে পিছে ঘুরে। আর এমপিসাব তো হের ভাইরা হইয়া গেছে।"

"কেন?"

"ক্যান আবার...বেটি সবতেরে জাদু করছে!" কথাটা আতর এমনভাবে বললো যেনো সে এ-ব্যাপারে একদম নিশ্চিত, সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই।

"জাদু?"

“হুম।” বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে সায় দিলো ইনফর্মার। “আমার তো মনে হয় এই বেটি মানুষই না..ডাইনি!”

“ডাইনি?”

“কইথেকা যে উইড়া আইছে, আল্লা-ই জানে।”

“উনি কোত্থেকে এসেছেন আপনারা কেউ জানেন না?” নুরে ছফাকে বিস্মিত দেখালো।

ঢোক গিললো আতর। “এইখানে আইছেন…কয়দিন থাকেন, সব জানবার পারবেন।”

“ঐ মহিলাকে ডাইনি বললেন কেন? উনি করেছেনটা কি?”

“বেটি জাদুটোনা কইরা এমন খাওন বানায় যে আপনে মুখে দিছেন তো শ্যাষ… বুঝলেন?”

“শেষ মানে?” চোখেমুখে ভয়ার্ত অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুললেও ছফা আসলে আগ্রহী হয়ে জানতে চাইছে।

“মাইনে, আপনে হের চক্করে পইড়া গেলেন। বার বার হের খাওন। খাইতে আইবেন… আপনেরে আইতেই হইবো।”

“ও,” নুরে ছফা হাফ ছেড়ে বাঁচলো। “আমি ভেবেছিলাম মারাত্মক কিছুর কথা বলছেন। মানে, তার খাবার খেয়ে ক্ষতি-টতি হয়,” মুচকি হাসলো সে। “ভালো খাবারের জন্য মানুষ বার বার ছুটে আসতেই পারে..তাতে তো কোনো সমস্যা দেখছি না?”

“কি কন,” হতাশ দেখালো আতর আলীকে। “জাদুটোনা কইরা যে। খাওন বানায় সেই খাওন সমস্যা না?”

“আমি তো খারাপ কিছু দেখছি না…যদি না খাবারের মধ্যে অন্য কিছু থাকে।”

“এই যে, অ্যাতোক্ষণে লাইনে আইছেন,” হেসে উঠলো ইনফর্মার। দু পা তুলে বসলো এবার। “খাওনের মইদ্যে যদি উল্টাপাল্টা কিছু না-ই মিশায় মানুষ ক্যান হিরোইনচি’র মতো নেশাখোর হইবো, কন?”

“উল্টাপাল্টা কিছু মেশায়?” আৎকে উঠলো নুরে ছফা। তার মনে পড়ে গেলো আজ সে ওখানে পেট ভরে খাওয়া-দাওয়া করেছে।

বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে সায় দিলো আতর।

“কি মেশায়?”

“সেইটা কেমনে কই তয় কিছু একটা তো করেই.” একটু থেমে গলাটা নীচু করে বললো, “কবুতর তো বশ করে আফিম দিয়া, হে কি দিয়া বশ করে কে জানে?”

একবার বলে ডাইনি আবার বলে আফিম মেশানোর কথা-ছফা বুঝতে পারলো এই লোক মুশকান জুবেরির ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত নয়। কবুতর আফিম দিয়ে বশ করা হয় মানে?” কৌতূহলি অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলে জানতে চাইলো সে। “কবুতর তো এমনিতেই পোষ মানানো যায়..বশ করার জন্য আফিম মেশানোর দরকার হবে কেন? এরকম কথা জীবনেও শুনি নি।”

লালচে দাঁত বিকশিত হলো আতরের। “আপনে তাইলে জানেন না। কবুতর যারা পালে তারা কবুতরের খাওনের মইদ্যে ইটটুখানি আফিম মিশাইয়া দেয়, ঐ আফিম খাইয়া খাইয়া কবুতরের নিশা হইয়া যায়। কঠিন নিশা।”

“নিরীহ কবুতরকে আফিমের নেশা করিয়ে কী লাভ? আফিম তো সস্তা নয়, বেশ দামি।”

– "লাভ না হইলে কেউ ট্যাকা খরচ কইরা আফিম খাওয়াইবো?" একটু থেমে আবার বললো, "কেন আফিম মিশায় জানেন?" ছফার জবাবের অপেক্ষা না করেই বলতে লাগলো সে, "আফিমখোর কবুতরগুলা হাটে নিয়া বেইচা দেয়, তারপর যারা ঐসব কবুতর কিনা নেয় তারা খায় ধরা, বুঝলেন?"

"কিভাবে ধরা খায়?"

"ঐ কবুতরগুলা উড়াল দিয়া পুরান মালিকের কাছে চইলা আহে আফিমের টানে। তারপর ওইগুলারে আবার বেইচা দেয়, আবার উড়াল দিয়া ফিরা আহে আহে আর বেচে..লাভই লাভ…এক কবুতর দশবার বেচতে পারে হেরা।"

"ও," দারুণ বিস্মিত নুরে ছফা। "আপনার ধারণা ঐ রেস্টুরেন্টও একই কাজ করে?"

"কিছু একটা তো দেয়ই না দিলে মানুষ নিশাখোরগো মতোন ছুঁইটা আইতো না।"

"আপনি এতোটা নিশ্চিত হলেন কিভাবে? ঐ রেস্টুরেন্টের রান্না বান্নার খবর তো আপনার জানার কথা নয়?"

বাঁকাহাসি ফুটে উঠলো আতরের ঠোঁটে। "তাইলে হুনেন, বেটির হোটেলে বাবুর্চির কাম করতে এক পোলা…হে আমারে কইছে, বেটি নাকি সব খাওনের মইদ্যে কী একটা মিশাইয়া দেয়।"

"কি মেশায়?" নড়েচড়ে উঠলো ছফা।

"এইটা তো ঐ পোলায়ও বাইর করতে পারে নাই" আশেপাশে তাকিয়ে এবার নীচকণ্ঠে বললো সে, "বুঝলেন, সব খাওন পাক করার সময় কী জানি একটা জিনিস মিশাইয়া দেয়। বেটি ওইগুলা বোতলে কইরা নিজের বাড়িতে রাখে। রান্দোনের আগে বোতলগুলা নিয়া আসে কর্মচারীরা। ওই বোতলে কি আছে কেউ কইবার পারে না। বাবুর্চি আমারে কইছে,

বোতলের সিরাপগুলার জইন্যই খাওনগুলা এতো মজার হয়। এইটা দিয়া-ই সবতেরে জাদু কইরা ফালায়। বার বার ছুঁইটা আসে কাস্টমার।”

“কিন্তু আমি তো আজ খেয়েছি, আমার কাছে ভালো লাগে নি…দ্বিতীয়বার ওখানে গিয়ে খেতেও ইচ্ছে করছে না।”

একটু সন্দেহের চোখে তাকালো আতর। “ক কি?”

“হুম। একদম সত্যি বলছি।”

“তাইলে আপনের কে আলাদা,” বলেই মুখ টিপে হাসলো।

“আলাদা হবে কেন?”

“কিছু মনে কইরেন না…আপনে মনে হয় নিশা-পানি করেন,” কথাটা বলেই আবারো দাঁত বের করে হেসে উঠলো পুলিশের ইনফর্মার।

নুরে ছফা একটু থ বনে গেলেও বেশ শব্দ করে হাসলো। “হা-হা-হা।”

আতর আলী ভ্যাবাচ্যাকা খেলো একটু।

“আপনি লোকটা আসলেই খুব মজার। আপনার জ্ঞান-বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারছি না। আপনার অবজার্ভেশন ক্ষমতা মারাত্মক।”

এবার নিঃশব্দে হাসতে লাগলো ইনফর্মার।

“একদম ঠিক ধরেছেন, আমার একটু বদঅভ্যাস আছে।”

“নিশা-পানি করলে জিব নষ্ট হইয়া যায়..তহন আর অন্য কিছু ভালা লাগে না,” কথাটা বলে একটু থেমে আবার বললো, “আপনে কি খান?”

"তেমন কিছু না…এই ধরেন একটু গাঁজা-মদ।"

"আমি ইমুন সাম্বাদিক দেখি নাই যে এইসব জিনিস খায় না, একদম নিশ্চিত ভঙ্গিতে বলতে লাগলো আতর। "সব সাম্বাদিকই গাঞ্জা-মদ খায়, বুঝলেন? এইগুলা না খাইলে হেরো কামই করতে পারে না।"

"সবাই খায় কিনা জানি না, আমি খাই। তবে এখানে আসার পর বিপদে পড়েছি… গাঁজা-মদ কিছু পাচ্ছি না।"

"আরে কী কন, এইলা কুনো ব্যাপার হইলো..এই আতররে খালি কইবেন, কয় মণ গাঞ্জা চান? কয় ডেরাম মদ লাগবো? চুটকি বাজামু আর সব হাজির হইয়া যাইবো।"

"আপনি এসবের কারবারও করেন নাকি?"

আতর লাজুক হাসি দিলো। "আমি করি না, তয় যারা করে তারা সবুতে আমারে বাও কইরা কাম করে..আমারে হাতে রাখে আর কি. আমার লগে এগোর হট টেরাম আছে।"

"তাহলে আপনি থাকতে এসব নিয়ে আমাকে আর চিন্তা করতে হবে না মনে হচ্ছে।"

"খালি কইবেন, বান্দা জিনিস লইয়া হাজির হইবো।" একটু থেমে আবার বললো সে, "উঠছেন কুনখানে?"

"টাউনের হোটেলে।"

ভুরু কুচকালো আতর। "ঐযে সুরুত আলীর তিনতলার হোটেলে? সানমুনে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো নুরে ছফা। এই টাউনে আবাসিক হোটেল ঐ একটাই।

“আর জায়গা পাইলেন না..সুরুত আলী তো ঐটারে খানকিপট্টি বানায়া রাখছে। সব ভুসকি মাগিগো আড্ডাখানা। আপনের মতো মানুষ কেমনে উঠলো ঐখানে?”

“আমি তো এখানকার তেমন কিছু চিনি না। এখানে আমার পরিচিত কেউ নেইও…ঐ হোটেলে না উঠে উপায় ছিলো না।”

“আচ্ছা, ওরা আপনার কাছ থিকা পার ডে কতো নিতাছে?”

“তিনশ”

আতরের ভুরু কপালে উঠে গেলো। “পুরা ডাকাইতি। ওইটা কি ফাইভস্টার নি… ওইখানকার রুমের ভাড়া তো দুইশ’ টাকা।”

“তাই নাকি?” নুরে ছফা কৃত্রিম বিস্ময়ের ভঙ্গি করলো।

“ওরা আপনের গলা কাটতাছে। খাড়ান, আমি রাইতে গিয়া ফাপড় দিতাছি, দেখবেন ভাড়া কেমনে নাইমা আসে।”

নুরে ছফা কিছু বলতে গিয়েও বললো না।

“কয়দিন থাকবেন ওইখানে?”

কটু ভাবলো সে। “তিন-চারদিন?”

“তিন-চাইরদিনে আপনের কাম হইয়া যাইবো?”

“আপনার মতো যোগ্য লোক পেলে হয়ে যাবে আশা করি।”

একটু বিগলিত হলো আতর। “কথাটা কওন ঠিক না, কিন্তু আপনে কইলাম আসল লোকের দেহা-ই পাইছেন।”

“আমারও তাই মনে হচ্ছে।”

“এইবার কন, কি জানবার চান?”

একটু গুছিয়ে নিলো নুরে ছফা। “ঐ মহিলা কোত্থেকে এসেছে, এখানে এরকম জায়গায় কেন এসেছে…এর পেছনে সত্যিকারের কারণ কি..তার রেস্টুরেন্টের খাবারগুলো কেন এতো সুস্বাদু হয়…এইসব।”

“আপনে না কইলেন হের খাওন আপনের ভালা লাগে নাই?” আতরের চোখেমুখে সন্দেহ।

“আমার ভালো লাগে নি তো কি হয়েছে, সবার তো লাগে..” একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে বললো সে।

“ঠিকই কইছেন।”

“আমি যে কয়দিন এখানে থাকবো আপনি আমাকে একটু হেল্প করবেন। চিন্তা করবেন না, এজন্যে আমি আপনাকে বখশিস দেবো।” টাকা না বলে বখশিস বললো ইচ্ছে করেই।

আতরের লালচে দাঁত বখশিসের কথায় আবারও বিকশিত হলো।

“কিন্তু একটা শর্ত আছে।” সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তাকালো ইনফর্মার।

“কি?”

“আমার ব্যাপারে কাউকে কিছু বলতে পারবেন না। মানে আমি যে সাংবাদিক এটা-”

“আরে, আমি আবার কারে কমু?” কথার মাঝখানে বলে উঠলো। “আমার কি খায়দায়া কাম নাই? এই আতর খামোখা পাবলিকের লগে কুনো বিষয়-আসয় নিয়া গপ মারে না।”

"আমি পাবলিকের কথা বলছি না।"

"তাইলে?"

"পুলিশের কথা বলছি।"

চুপ মেরে গেলো লোকটা।

"আমি জানি আপনি পুলিশের হয়ে কাজ করেন, নুরে ছফা ইনফর্মার শব্দটাও ব্যবহার করলো না। স্বাভাবিকভাবেই পুলিশকে বলতে পারেন আমি কে, কেন এখানে এসেছি.." একটু থেমে আবার বললো, "কিন্তু এটা করলে পুলিশ আমাকে ডিস্টার্ব করতে পারে। বোঝেনই তো, ঐ মহিলার সাথে ওদের কেমন খাতির?"

হাত তুলে থামিয়ে দিলো ইনফর্মার। "আর কওন লাগবে না। এইটা আমার চায়া আর কে বেশি জানে…আপনে এইটা নিয়া টেনশনই কইরেন না। পুলিশ কিছু জানবার পারবো না।"

"কিনতু তারা যদি আমার ব্যাপারে আপনার কাছ থেকে কিছু জানতে চায় তখন কী বলবেন?"

একটু ভেবে নিলো আতর। "এইটা এমন কঠিন কিছু না। আমি পুলিশরে কমু আপনে জমি কিনবার আইছেন। আমি আপনেরে হেল্প করতাছি।"

এবার নুরে ছফার মুখে হাসি দেখা গেলো। "বাহ, দারুণ তো। আপনি কি জমি-টমিও খুঁজে দেবার কাজ করেন নাকি?" জমির দালাল শব্দটিও ইচ্ছে করে বাদ দিলো সে।

বিনয়ী হাসি দেখা গেলো আতরের মুখে। "মাজেমইদ্যে এইটাও করতে অয়। কুনখানে কুন জমিটা মাইনষে বেইচবো এইটা আমার জানা থাকে। আপনে কইতে পারেন এইখানকার গেরাম আর টাউনে কেউ যদি ঘরের চিপায় ঢুইকা পাদও মারে এই আতর ঠিকই জানবার পারে। হের লাইগাই তো মাইনষে আমারে বিবিচি কয়।"

আতরের চোখেমুখে একধরণের গর্বিত ভাব দেখতে পেলো নুরে ছফা।

"কুন পোলায় কুন মাইয়ার লগে চক্কর চালাইতেছে তাও আতর জানে!"

নুরে ছফা মুচকি হাসি দিয়ে পকেট থেকে একশ' টাকার একটি নোট বের করে লোকটার হাতে ধরিয়ে দিলো। "এটা রাখুন। চা-সিগারেট খাবেন। কাল থেকে আমি আর আপনি একসাথে কাজ শুরু করবো। এরজন্য প্রতিদিন আপনি পাবেন পাঁচশ' টাকা, ঠিক আছে?"

টাকাটা হাতে নিয়ে দাঁত বের করে হেসে মাথা নেড়ে সায় দিলো ইনফর্মার। দুর্দিনের সময় এমন একজন লোক জুটে যাওয়াতে খুশিই হলো। কয়েকটা দিন নিশ্চিন্তে থাকা যাবে। "ঠিক আছে, কাম হইবো। এই আতর আলী ট্যাকা-পয়সারে দাম দেয় না…দাম দেয় মিল-মহব্বতরে। আপনেরে আমার অনেক পসন্দ হইছে, এইটাই হইলো আসল কথা।"

"আমারও আপনাকে খুব পছন্দ হয়েছে। আপনি আসলেই কাজের মানুষ। আমার মনে হয় না আর কারোর হেল্প দরকার হবে আমার।"

"কেউ আপনেরে হেল্প করবো কেমনে? ওরা তো ঐ ডাইনির তিরি সীমানায়ও যাইতে পারে না।"

"এখন বলুন, ঐ মহিলা কোত্থেকে এলো, কিভাবে এখানে এলো?"

আতর একটু গাল চুলকালো। "লম্বা কাহিনী..কইতে অনেক টাইম লাগবো..আমার তো অহন একটা কাম আছে..থানায় যাইতে হইবো…রাইতে। আপনের হোটেলে আইতাছি…তহন কমুনে?"

"ঠিক আছে।" একটু ভেবে নিলো ছফা। "আর ঐ বাবুর্চি ছেলেটার সাথে কি কথা বলা যাবে?"

"বেটি তো ঐ পোলারে কবেই চাকরি নট কইরা দিসে।"

“বলেন কি?” অবাক হলো ছফা।

“পোলাটা যে আমার লগে মিলামিশা করতো হেইটা মনে লয় বেটি বুইঝা গেছিলো।”

“ঐ মহিলা কিভাবে জানতে পারলো এটা? সে কি আপনাদেরকে একসাথে দেখেছিলো?”

“আরে না, আমাগো কুনোদিন দেখে নাই। তয়, আগেই কইছি..বেটি একটা ডাইনি…হে কেমনে জানি সব জাইনা যায়।”

“ও,” একটু আনমনা হয়ে গেলো ছফা।

“আমি কইলাম এর আগেও আপনাগো লগে কাম করছি।”

“কি?” বুঝতে না পেরে বললো সে।

“সাম্বাদিকগো কথা কইতাছি।”

“ও।”

বিগলিত হাসি দিলো ইনফর্মার।

“আপনার মোবাইলফোন আছে না?”

“আছে একটা…তয় সুবিধার না, কাচুমাচু খেয়ে বললো সে।

“বুঝলাম না?”

“আমারে ফোন করন যায়…আমি কাউরে ফোন করতে পারি না।”

ছফা বুঝতে না পেরে চেয়ে রইলো।

“বুঝলেন না? ডিচপ্লে আন্ধার হইয়া গেছে।”

“ও,” হেসে বললো ছফা।

“সমস্যা নেই আমিই কল করবো। নাম্বারটা দিন।”

আতর আলী ফোন নাম্বারটা মুখস্ত বলে গেলে ছফা তার ফোনে সেভ করে রাখলো। “তাহলে রাতে কথা হবে। আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করবো।”

আতরকে বিদায় দিয়ে পকেট থেকে আরেকটা সিগারেট বের করে ধরালো সে। দীর্ঘ একটা টান দিয়ে তাকালো জ্বলজ্বল করতে থাকা রবীন্দ্রনাথের দিকে। চারপাশে ঘন অন্ধকারে লালচে আলোর একমাত্র সাইনটি কিছুক্ষণ পর পর কয়েক সেকেন্ডের বিরতি দিয়ে নিভে যেতেই জ্বলে উঠছে আবার। এক রহস্যময়তার ইঙ্গিত দিচ্ছে যেনো। সত্যি বলতে এমন অদ্ভুত নামের রেস্টুরেন্টের কথা সে জীবনেও শোনে নি, আর এখন চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছে।

সিগারেটটা আর্ধেক শেষ হতেই ফেলে দিলো। হাত দিয়ে মাথার বিতস্র চুলগুলো ঠিক করে পা বাড়ালো রবীন্দ্রনাথের দিকে।

.

অধ্যায় ৩

সন্ধ্যা সাতটার আগেই দ্বিতীয় বারের মতো রবীন্দ্রনাথে এলো সে।

অদভুত রেসটুরেন্টের সামনের খোলা প্রাঙ্গণে কমপক্ষে ছয়-সাতটি প্রাইভেটকার আর মাইক্রোবাস দাঁড়িয়ে আছে। ধীরপায়ে রেস্টুরেন্টের ভেতরে ঢুকতেই দেখতে পেলো বসার মতো খালি কোনো আসন নেই। অবশ্য ভালো করে চোখ বোলানোর পর দূরে, বামদিকে

একটি টেবিল খালি দেখতে পেলো। আরো অদ্ভুত ব্যাপার হলো চারজন ওয়েটার দেখতে পাচ্ছে এখন। তারা সবাই শান্তশিষ্টভাবে টেবিল থেকে টেবিলে অর্ডার নিচ্ছে। নয়তো খাওয়া শেষে বিল দিচ্ছে কাস্টমারকে। দিনের বেলায় এরা কোথায় ছিলো? তখন মাত্র একজন ওয়েটারকে দেখেছে।

খালি আসনে বসেই টেবিল থেকে মেনুটা তুলে নিলো। আসলে মেনুর আইটেম নিয়ে তার মধ্যে কোনো আগ্রহ নেই। এর আগে যা খেয়েছিলো তা ই খাবে আবার। সে তো এখানে মনভোলানো খাবার খেতে আসে নি, যদিও খাবারগুলো তাকে আকর্ষণ করছে।

"স্যার?" দুপুরের সেই ওয়েটার ছেলেটা এসে বললো।

"দুপুরে যা খেয়েছিলাম তা-ই নিয়ে আসো," সঙ্গে সঙ্গে অর্ডার দিয়ে। দিলো সে।

"নতুন কিছু ট্রাই করবেন না?"

"নতুন?"

আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিলো ওয়েটার। "ডিনারের সময় নতুন কিছু আইটেম ট্রাই করে দেখতে পারেন…মানে ড্রিঙ্কস আইটেমটা বাদে অন্য কিছু?"

"যেমন?"

"আপনি চা কিংবা কফি নিতে পারেন?"

"তোমাদের চা-কফিও কি অসাধারণ হয় নাকি?"

ওয়েটার নির্বিকার রইলো। কাস্টমারের হাসির জবাবে সে একটুও হাসলো না। "এখানকার সবকিছুই অসাধারণ…এটা আমরা বলি না…মেহমানরা বলে।"

“গুড।” ভাবলো ব্যঙ্গাত্মক সুরে আর কথা বলা ঠিক হবে না। তাহলে তা-ই দাও।”

ওয়েটার চুপচাপ চলে গেলে আশেপাশে তাকালো সে। যথারীতি আয়েশ করে সুস্বাদু খাবার গলাধকরণ করা কাস্টমারে পরিপূর্ণ! আঙুল চাটার দৃশ্য আবারও দেখতে পেলো। এই রেস্টুরেন্টের সব কাস্টমার যেনো কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ডুবে গিয়ে খাবার খাচ্ছে। এই ঘোরের মধ্যে সে নিজেও পড়ে গেছিলো আজ।

একটু পরই টের পেলো ঘরের মধ্যে অদ্ভুত সুন্দর একটি গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। এটা কোনো খাবারের গন্ধ নয়-অন্তত তার কাছে তাই মনে হচ্ছে। পারফিউম? হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের প্রবেশপথে একটু শোরগোল হতেই সেদিকে তাকালো। দেখতে পেলো পাঁচ-ছয়জন লোক ঢুকে পড়ছে হুরমুর করে। তাদের মধ্যে স্পষ্টতই নেতাগোছের একজন আছে, তাকে ঘিরে রেখেছে বাকি চার পঁচজন। নেতার গায়ে পাজামা-পাঞ্জাবি।

ঘরে কোনো টেবিল খালি নেই। সবগুলো দখল করে নিয়েছে ভোজনরসিক মেহমানের দল। নেতার চামচাঁদের চোখে এটা ধরা পড়লো খুব দ্রুত। ঘরের মাঝখানে এসে বিব্রত ভঙ্গিতে মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে রইলো নেতা, বুঝতে পারছে না কী করবে। এখানকার প্রায় সব কাস্টমারই বাইরে থেকে এসেছে তাই তাকে দেখে কেউ চিনতে পারছে না, সম্মান দেখিয়ে উঠেও দাঁড়াচ্ছে না। একজন ক্ষমতাসীন রাজনীতিকের কাছে এরচেয়ে অসহনীয় ব্যাপার আর কী হতে পারে! বেচারা না পারছে মানুষজনকে খাওয়ার টেবিল থেকে উঠিয়ে দিতে, না পারছে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে।

বেচারিকে মুক্তি দিলো একজন ওয়েটার। দৌড়ে এসে নীচুস্বরে কিছু একটা বললে নেতার কালোমুখটি উজ্জ্বল হয়ে গেলো মুহূর্তে। সঙ্গে থাকা লোকগুলোকে কিছু একটা বলে ওয়েটারকে সঙ্গে নিয়ে ঘরের শেষমাথায় যে দরজা রয়েছে সেখানে চলে গেলো সে।

“কোনো ভিআইপি এসেছে নাকি?” একটু পর ওয়েটার খাবার নিয়ে এলে স্বাভাবিক কৌতূহলে জানতে চাইলো ছফা।

“হুম। এখানকার এমপিসাহেব এসেছেন,” খাবার রাখতে রাখতে বললো ওয়েটার।

“তোমাদের মালিকের সাথে দেখা করতে এসেছে?”

সোজা হয়ে দাঁড়ালো ছেলেটা, মুচকি হেসে চলে গেলো।

আনমনে খাবার খেতে লাগলো নুরে ছফা। তার দৃষ্টি ঘরের এককোণে থাকা ঐ দরজার দিকে। ওখান দিয়েই এমপিসাহেব ঢুকে পড়েছে একটু আগে। সঙ্গে থাকা তার চ্যালা-চামুণ্ডারা অবশ্য বাইরে চলে গেছে।

খুবই আস্তে আস্তে খেতে শুরু করলো সে, আর কিছুক্ষণ পরই আবিষ্কার রলো ইচ্ছে করলেই সুস্বাদু খাবার ধীরে ধীরে খাওয়া যায় না। তবে সচেতনভাবেই আঙুল চাটার মতো অরুচিকর কাজ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারলো এবার।

খাওয়া শেষে চুপ মেরে বসে রইলো। অনেক সতর্ক থাকার পরও টের পেলো তার চোখ বার বার চলে যাচ্ছে ঘরের শেষমাথায় প্রাইভেট রুমের দরজার দিকে। দরজা থেকে চোখ সরিয়ে খাবার খেতে থাকা মানুষগুলোর দিকে তাকালো। সবার মুখে এক ধরণের প্রশান্তি। আয়েশ করে খাবার খাচ্ছে। মানুষ যখন অসম্ভব মজাদার খাবার খায় তার মুখ এমনিতেই বন্ধ থাকে, কথা বলতে ইচ্ছে করে না। এরাও প্রায় নিঃশব্দে আহারে নিমগ্ন। তিন চারজনের দলবেঁধে যারা এসেছে কেবল তারাই একটু আধটু কথা বলছে।

মানুষের মন জয় করতে হলে তার পেট জয় করা চাই-নুরে ছফা বুঝতে পারলো, এই রেস্তোরাঁ ভালোভাবেই সেটা করতে পেরেছে। কিন্তু বিজয়িনীর দেখা পাচ্ছে না। সে জানে ঐ দরজার ওপাশেই আছে রহস্যময় সেই নারী।

আরো কিছুক্ষণ বসে থাকার পর নুরে ছফা ঠিক করলো চলে যাবে। দূর থেকে ওয়েটারকে ইশারা করে বলে দিলো বিল নিয়ে আসার জন্য। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে চলে গেলো ছেলেটা। এমন সময় তাকে অবাক করে দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো এমপিসাহেব। বিরসমুখে চুপচাপ রবীন্দ্রনাথ থেকে চলে গেলো সে।

বিল নিয়ে ওয়েটার হাজির হলে ছফা প্রায় উদাস হয়েই পাঁচশ' টাকার একটি নোট বাড়িয়ে দিলো, যদিও তার দৃষ্টি মেইনগেটের দিকে। বড় বড় জানালা দিয়ে দেখতে পেলো দলবল নিয়ে গাড়িতে উঠে চলে যাচ্ছে সুন্দরপুরের এমপি। লোকটার চোখেমুখে যে অভিব্যক্তি দেখেছে তাতে নিশ্চিত করে বলা যায়, মুশকান জুবেরির সাথে স্থানীয় এমপির সাক্ষাৎকারটি সুখকর কিছু ছিলো না। ঝগড়া? মনোমালিন্য? নুরে ছফা অনুমাণ করার চেষ্টা করলো।

"স্যার।"

তাকিয়ে দেখলো ওয়েটার বাকি টাকা নিয়ে ফিরে এসেছে। ভাঙতি টাকাগুলো পকেটে ভরতে যাবে অমনি দেখতে পেলো ঐ দরজা খুলে বেরিয়ে আসছে সেই রহস্যময়ী! এই প্রথম কাউকে দেখে তার বয়স আন্দাজ করতে পারলো না ছফা।

সাদা-লালের জামদানি শাড়ি, তার উপরে টকটকে লাল উলের লং কার্ডিগান। চুলগুলো সুন্দর করে খোঁপা করা, তাতে বেলি ফুলের মালা পেঁচানো। কপালে সিঁদুররঙা টিপ, চোখে দুর্দান্তভাবে কাজল দেয়া। ছফা কখনও এভাবে কাজল দিতে দেখে নি কোনো নারীকে। কাজলের টংটি তার চোখদুটোকে দান করেছে অপার্থিব এক ভঙ্গি।

এতোক্ষণ ধরে সুস্বাদু খাবারের ঘোরে ছিলো যারা তাদেরও ধ্যান ভাঙলো, ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিলো চোখধাঁধানো রূপ নিয়ে অভিজাত পদক্ষেপে হেঁটে যাচ্ছে এক নারী।

ছফার টেবিলের পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ করেই তাকালো সে। বড়জোর দুই সেকেন্ড। তারপর আবার চোখ নামিয়ে সোজা চলে গেলো মেইনগেটের দিকে। তার দৃষ্টি নিক্ষেপ এবং দৃষ্টি সরিয়ে নেয়ার মধ্যে অদ্ভুত একটি ভঙ্গিমা ছিলো।

কয়েক মুহূর্ত মন্ত্রতাড়িত হয়ে বসে রইলো ছফা। সে নিশ্চিত, মহিলা তার দিকে তাকানোর সময় অদ্ভুতভাবে হেসেছিলো। সেই হাসি এতোটাই ক্ষীণ যে ওটাকে ঠিক হাসি বললেও ভুল বলা হবে। কেবল ঠোঁটের একপ্রান্ত একটুখানি ঢেউ খেলে যাওয়া।

কিন্তু ছফা বুঝতে পারলো না এই হাসির মানে কী?

.

অধ্যায় ৪

রাত ন'টার পরই সুনসান হয়ে উঠলো সুন্দরপুর। স্থানীয় লোকজন গর্ব করে বলে টাউন, আদতে মফশ্বল শহর বললেও বেশি বলা হবে। এ যেনো বিশুদ্ধ একটি গ্রাম। সেই গ্রামের বুক চিড়ে মহাসড়ক চলে গেছে। সেই সড়কের দু পাশে গড়ে উঠেছে কিছু দোকানপাট। নিম্নমানের একটি আবাসিক হোটেল থাকলেও কোনো ব্যাঙ্ক কিংবা সরকারী দপ্তর নেই, আছে শুধু পল্লী বিদ্যুতের ছোটোখাটো একটি অফিস।

বিছানাঘেষা জানালার সামনে বসে কানে ফোন চেপে রেখেছে ছফা। নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছে বলে জানালার সামনে বসে কথা বলছে, তারপরও পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিনবার লাইন কেটে গেছে, কথাবার্তাও মাঝেমধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে দুর্বল সিগন্যালের কারণে। দশ-বাই আট ফুটের একটি রুম। সিঙ্গেল খাট আর আমকাঠের টেবিল-চেয়ার রাখার পর খুব বেশি জায়গা নেই।

".কমপক্ষে সপ্তাহখানেক লাগতে পারে..তবে আমি শিওর না…" একটু জোরেই বললো সে। "…হোমরাচোমরা লোকজনের সাথে মহিলার খাতির…সাবধানে কাজ করতে

হবে.. টের পেয়ে গেলে কাজটা করা কঠিন। হয়ে যাবে...” মুশকান জুবেরির সেই রহস্যময় চাহনির কথাটা মনে পড়ে গেলো তার। এরইমধ্যে কি মহিলা টের পেয়ে গেছে? অসম্ভব! সে এমন কিছু করে নি যে টের পেয়ে যাবে। এখানে নেটওয়ার্ক খুব খারাপ...আমি সময়। আর সুযোগ পেলে নিজেই ফোন করবো...ওকে?”

ঠিক এমন সময় কেউ তার দরজায় নক করলে ফোনটা কান থেকে সরিয়ে বলে উঠলো, “কে?”

“আমি আতর।”

দরজার ওপাশ থেকে কণ্ঠটা শোনামাত্র, “এখন রাখি পরে কথা হবে,” বলে দ্রুত উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলো সে।

“আপনের পঞ্চাশ ট্যাকা সেভ কইরা দিলাম,” দাঁত বের করে বললো আতর। “এমুন ফাঁপড় মারছি যে পাতলা-পায়খানা শুরু কইরা দিছে ম্যানেজার।”

“আরে, এটার তো কোনো দরকার ছিলো না, একটু বিরক্তির সাথে বলেই আতরকে ঘরে ঢুকতে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো। “বসেন।” ঘরের একমাত্র চেয়ারটা দেখিয়ে বললো সে। নিজে বসলো বিছানার উপর।

“রাইতের খানা খাইছেন?”

“হ্যাঁ।”

ইনফর্মার মুখে রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলেও সেটা অশ্লীল দেখালো। “ওই বেটির ওইখানে?”

আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

"হি-হি-হি," দাঁত বের করে হাসলো ইনফর্মার।

ছফা কিছু বললো না।

"ভালা ভালা," বুঝতে পারছে না হাসিটা কিভাবে থামাবে। প্রথমে শব্দহীন করলো তারপর অভিব্যক্তি পাল্টে বললো, "গাঞ্জা-মদ কিছু লাগবো নি?"

"না। আজ ইচ্ছা করছে না। লাগলে আমি জানাবো আপনাকে।"

"ঠিক আছে," একটু হতাশ হয়ে বললো আতর। "তাইলে এহন আমার লগে চলেন, আপনেরে এক জায়গায় নিয়া যামু।"

অবাক হলো ছফা। "কোথায়?"

"আপনে তো হের ব্যাপারে অনেক কিছু জানবার চান...কইথেকা আইলো, কেমনে আইলো..না?"

"হ্যাঁ, কিন্তু..."

"জলদি আসেন, বুইড়া গেরামে ফিরা চাইছে। আবার কই যায় না-যায় তার কি কুনো ঠিক আছে।"

"কার কথা বলছেন?"

"গেলেই দেখবার পারবেন...আহেন তো।"

আর কিছু না বলে হাতঘড়িটা পরতে পরতে জানতে চাইলো সে, "এখানে মোবাইলে টাকা ভরা যাবে কোথায়? ব্যালান্স একেবারে শেষ হয়ে গেছে," টেবিল থেকে মোবাইলফোনটা পকেটে ভরে নিলো।

“এই তো, ডিসপিন্সারিটার লগেই একটা আছে। চলেন, যাওনের সময় ভইরা নিয়েন।”

ছফা দরজা লাগিয়ে চুপচাপ বের হয়ে গেলো আতর আলীর সাথে। তার মনে অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে থাকলেও কিছুই জানতে চাইলো না। তার দরকার তথ্য, আর সেটা পেতে হলে এই লোকটাকেই বেশি প্রয়োজন।

হোটেল থেকে বের হয়ে কিছুটা পথ পায়ে হেঁটে একটা ওষুধের দোকানের পাশের দোকান থেকে ব্যালান্স ভরে নিলো সে। ভাগ্য ভালো দোকানটা খোলা আছে। দোকানির সাথে আতর আলীর কথা-বার্তা শুনে। বোঝা গেলো ইনফর্মারের সাথে বেশ ভালো খাতির। পথে কোনো যানবাহন। নেই দেখে হেঁটেই রওনা দিলো তারা। আতরের ভাষায় তাদের গন্তব্য বেশি দূরে নয়। ছফা অবশ্য এ-কথায় খুব একটা আস্থা রাখতে পারছে না। গ্রামের লাকজনকে সে ভালো করেই চেনে। এরা সব সময় ‘তালগাছ’ দেখাবে!

সুনসান মহাসড়ক দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে তারা। দূর থেকে একজোড়া হেডলাইট দেখা গেলো। কোনো বাস-ট্রাক হয়তো আসছে। অনেকটা পথ হাটার পর মহাসড়ক থেকে ডানদিকে চলে গেছে। এরকম একটি মেঠোপথের দিকে পা বাড়ালো আতর, তার পেছন পেছন ছফা। মাথার উপরে পৌণে-আধখান চাঁদের আলো ঘুটঘুটে অন্ধকার কিছুটা ফিকে করে দিয়েছে। এমন মৃদু আলোয় পথ চলতে অভ্যস্ত নয় বলে ইনফর্মারের বড় বড় পা ফেললে তার পক্ষে তাল মেলানো সহজ হলো না, একটু পেছনে পড়ে গেলো সে। পকেট থেকে মোবাইলফোনটা বের করে ডিসপ্লের আলোতে আতরের পেছন পেছন পথ চলতে শুরু করলো।

হাঁটতে হাঁটতেই একটু পেছন ফিরে তাকালো ইনফর্মার। “আন্ধারে পবলেম হইতাছে নি, ভাইজানের?”

“না, না…ঠিক আছে।”

“আপনে কইলাম সাম্বাদিক না,” সামনের দিকে তাকিয়েই বললো আতর।

“কি?” ছফা চমকে উঠলো।

একটা সিগারেট ধরালো ইনফর্মার। “আপনে আইছেন বিয়া করতে. মাইয়ার ব্যাপারে একটু খোঁজ নিতাছেন। বুঝলেন?”

“আরেকটু খুলে বলেন।”

আবারও পেছন ফিরে তাকালো সে, “বুঝলেন না...টেকনিক আর কি। সাম্বাদিক ঠুনলে বুইড়া তো কুনো কথা কইবো-ই না, পাদও দিবো না। সব বন কইরা বয়া থাকবো।”

“আচ্ছা,” ছফা এবার বুঝতে পারলো। “কিন্তু মেয়েটা কে..মানে কাকে দেখতে এসেছি?”

“আবার কে...ঐ বেটি!”

ছফা প্রায় হোঁচট খেতে যাচ্ছিলো তবে সেটা মেঠোপথের উপরে পড়ে থাকা কোনো মাটির চাকার জন্য নাকি কথাটার অভিঘাতে বোঝা গেলো না।

“বুইড়া কইলাম মানুষ ভালা খালি মাথায় এই ছিট আছে...একবার মিজাজ বিগড়াইলে আর কিছু কইবো না। আমাগো এমপিসাবরেও হে পাত্তা দেয় না...মুখের উপরে কথা কইয়া দেয়,” সামনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললো, “তয় মাথাটা একেবারে সলিড। সব কিছু জানে। এইখানকার সব তার মুখস্ত।”

“আমি তো জানতাম এখানকার সব খবর আপনি রাখেন,” ছফা আস্তে করে বললো পেছন থেকে। “সেজন্যে লোকজন আপনাকে বিবিসি বলে। ডাকে। এখন দেখছি সিএনএন-ও আছে!”

হে-হে-হে করে হাসলো আতর। “হের কাছে আপনে সব খবর পাইবেন। কিন্তু এই জমানার কুনো খবর পাইবেন না…সব পুরানা আমলের খবর।”

“বুঝলাম না?”

আবারো পেছন ফিরে তাকালো পুলিশের ইনফর্মার। “বুইড়া পুরানা আমলের মানুষ…হে খালি পুরানা জমানার কথা জানে…এখনকার কুনো খবর হে রাখে না।”।

ওহ্ হিস্টোরি চ্যানেল! মনে মনে বললো ছফা তবে মুখে বললো, “লোকটা কি করে?”

“মাস্টর আছিলো, এহন কাম-কাইজ কিছু করে না। আমাগো এমপি হের চাকরি নট কইরা দিছে।”

“কেন?”

“এমপিসাব কইছিলো সুন্দরপুর প্রাইমারি স্কুলটার নাম বদলাইয়া হের বাপের নামে রাখতে…মাস্টর খুব ঘাড়ত্যাড়া মানুষ..বুঝলেন? মুখের উপর কইয়া দিছে, এইটা সে বাঁইচা থাকতে হইতে দিবো না।”

“কারণটা কি?”।

“এমপির বাপ হামিদুল্লা তো গণ্ডগোলের সময় মিলিটারিগো লগে পিচকমিটি করছিলো…মাইনষে তারে হামিদ্যা-রাজাকার কয় এহনও। হে কইলাম মেলা মানুষ মারছে।”

“স্কুলের নামটা কি বদলাতে পেরেছিলেন আপনাদের এমপি?”

পেছন ফিরে না তাকিয়েই বললো আতর, “আরে না…কেমনে বদলাইবো? কইলাম না, মাস্টর বাগড়া দিছে।”

অবাক হলো ছফা। “সামান্য একজন মাস্টার হয়ে তিনি কিভাবে এটা করতে পারলেন?”

“মাস্টরের পুরানা ছাত্ররা আছে না...হেরা তো বিরাট বড় বড় জায়গায় আছে...হেরা আবার মাস্টররে খুব মাইন্য করে...বুইড়্যা ঢাকায় গিয়া পুরানা ছাত্রগো দিয়া এমন টাইট দিছে...এমপিসাব আর স্কুলের নাম বদলাইবার সাহস করে নাই

“আচ্ছা।”

“এইটা কইলাম পেপারে আইছিলো।”

“তাই নাকি?”

“হ। রাজাকারের নামে স্কুল হইবো এই কথাটা পেপারে আহনের পরই ক্যাচাল লাইগা যায়।”

ছফা বুঝতে পারলো ব্যাপারটা। গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার হলেও ভদ্রলোকের ক্ষমতা নেহায়েত কম নয়। তাদের গ্রামেও এরকম দু-একজন মাস্টার আছে, যাদেরকে সবাই খুব শ্রদ্ধা করে...পুরনো ছাত্রদের অনেকেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত, ফলে এক ধরণের ক্ষমতাও তৈরি হয় তাদের।

“এই গেরামের সবতে একদিনের জইন্য হইলেও হের কাছে পড়ছে।” আতর আবার বলে উঠলো। “খুব ভালা মাস্টর। আমার পোলারেও পড়াইছে।”

“আপনার ছেলে আছে?”

আতর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। “আছিলো...” কথাটা বললো মলিন কণ্ঠে।

ছফা ইচ্ছে করেই চুপ মেরে রইলো, সে অন্য কিছুর গন্ধ পাচ্ছে। এ মুহূর্তে ব্যক্তিগত প্যাচাল শুরু করার কোনো ইচ্ছে তার নেই।

“এহনও আছে,” আপন মনেই বলতে লাগলো সামনের লোকটি, “তয় আমার লগে কুনো কানেকশন নাই। ওর মার লগে থাকে, কলেজে পড়ে।”

“ও,” ছোট্ট করে বললো ছফা।

“দেইখেন..গর্ত আছে।”

আতরের সতর্কবাণী শুনে একটু থমকে দাঁড়িয়ে মোবাইলফোনের ডিসপ্লের আলো ফেললো। গর্তটা লাফিয়ে ডিঙলো সে।

গ্রামের মেঠোপথ যেমন হয়, আঁকাবাঁকা হয়ে পথটি চলে গেছে কতোদুর সেটা এই আবছা-অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না, তবে চারপাশে ঝোঁপঝাঁড় দেখে মনে হচ্ছে না এটা কোনো লোকালয়। ছফা কোনো প্রশ্ন না করে চুপচাপ অনুসরণ করে গেলো আতর আলীকে। দুজনের পদক্ষেপের শব্দ ছাড়া আর কিছু নেই। জনমানবহীন এলাকাটি রাতের অন্ধকারে ভৌতিক আবহ সৃষ্টি করেছে। ছফা নিশ্চিত, একা একা এরকম জায়গা দিয়ে শহরে বড় হওয়া মানুষ হেঁটে যেতে পারবে না, গা ছমছম করে উঠবে। তবে তার মধ্যে এ নিয়ে কোনো ভয়ডর নেই। পুরোটা কৈশোর গ্রামেই কাটিয়েছে। তাছাড়া ভূতে বিশ্বাস করে না সে। গড়পরতা মানুষের চেয়ে তার সাহসও একটু বেশি।

“ধ্যাত!” বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো ছফা।

আতর থমকে দাঁড়ালো। “কি হইছে?”

“মোবাইলের চার্জ শেষ।” তার ফোনটা অফ হয়ে গেছে।

ইনফর্মার আবার হাঁটতে শুরু করলো। অনেকটা বিড়বিড় করেই বলতে লাগলো, “শহরের মানুষ তো…রাইত-বিরাইতে গাও-গেরামে চলাফেরা করার অভ্যাস নাই।

মুচকি হেসে ফোনটা পকেটে রেখে দিলো ছফা। অন্ধকারেই টের পেলো ঢালু একটি জায়গা দিয়ে আস্তে আস্তে উপরে উঠে যাচ্ছে।

"শটকাটে যাইতাছি আর বেশিক্ষণ লাগবো না।"

আতর আলীর কথায় কোনো জবাব দিলো না সে। লোকটা থেকে মাত্র দু-তিনহাত পেছনে আছে। অন্ধকারেই টের পেলো চারপাশের ঝোঁপঝাঁড় একটু বদলে গেছে। জায়গাটা কেমন জানি। একটা গন্ধ নাকে আসছে। সুগন্ধী কিছু। তবে এর সাথে মিশে আছে বাজে একটা গন্ধও। সব মিলিয়ে অশরীরি এক আবহ ফুটে উঠছে আস্তে আস্তে।

"গন্ধটা কিসের?" খুব স্বাভাবিক কণ্ঠেই জানতে চাইলো সে।

"আগরবাত্তির," পথ চলতে চলতে বললো আতর।

"এইটা আমাগো বড় কবরস্তান...এইটার ভিতর দিয়া গেলে শটকাটে যাওন যায়।"

কবরস্তান শুনে ছফার গা ছমছম করে উঠলো। এই ইনফর্মার তাকে এরকম রাতের বেলায় কবরস্তানের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে লোকটার সাহস আছে কিন্তু ভব্যতাজ্ঞান নেই।

জায়গাটা কবরস্তান শোনার পর থেকে আপনাআপনি তার চোখ চলে যাচ্ছে আশেপাশে, এটা কোনোভাবে এড়াতে পারছে না। এখন আবছা আবছা দেখতে পাচ্ছে ছোটো ছোটো ঢিবির মতো মাটির স্তূপগুলো ওগুলোর নীচে শায়িত আছে মৃতেরা।

"রাইতে নতুন কুনো কব্বর দিছে মনে হয়," আতর বললো, "মুরদার লোকেরা আগরবাত্তি জ্বালায়া গেছে।"

ছফা কিছু বললো না। ভুতের ভয় না থাকুক, কবরস্তান দিয়ে রাতের বেলায় হেঁটে যাওয়াটা মোটেও স্বস্তির ব্যাপার নয়। আতর আলীর উপর রাগ করেই জোরে জোরে পা

চালাতে লাগলো সে। এখান থেকে যতো দ্রুত বের হওয়া যায় ততোই স্বস্তির ব্যাপার।

"ঐ লোকের নাম কি?" জোরে জোরে পা চালিয়ে আতরের ঠিক পাশে এসে বললো সে।

"নাম তো একখান মাশাল্লা..কী আর কমু...উল্টাইলেও যা সোজা করলেও তা!"

"কি বল-" বিস্মিত ছফা কথাটা শেষ করতে পারলো না, "আ-আ!" চিৎকার দিয়ে উঠলো সে। ভারসাম্য হারিয়ে বাম দিকে কাত হয়ে পড়ে গেলো। ডানহাত দিয়ে আতরের কাঁধ ধরার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হলো সে। মাটিতে আছড়ে পড়ার আগে তার মনে হলো কয়েক মুহূর্ত শূন্যে ভেসে ছিলো!

.

অধ্যায় ৫

"...কোমল বাহুর ডোর ছিন্ন হয়ে যায়,
মদিরা উথলে নাকো মদির আঁখিতে।
কেহ কারে নাহি চিনে আঁধার নিশায়..."

মৃদু ভলিউমে যে গানটা বাজছে সেটার কথাগুলো খুব খেয়াল না করলে বোঝা যাবে না। তবে তাতে কোনো সমস্যা নেই, সবটাই তার মুখস্ত।

সাধারণত এভাবে রকিংচেয়ারে দোল খেতে খেতে গান শোনার সময় বিড়বিড় করে গানের সাথে ঠোঁট মেলায়, তবে আজ তার ঠোঁটজোড়া

পুরোপুরি স্থির। চোখ দুটো শূন্যে নিক্ষেপ করে ভেবে যাচ্ছে। আস্তে করে চেয়ারের পাশ থেকে কফি টেবিলের উপরে রাখা গ্লাসটা হাতে তুলে নিলো। অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছে লাল

টকটকে তরলে ভর্তি ওটা। গ্লাসটা নাকের সামনে নিয়ে গন্ধ নিলো প্রথমে, তারপর চুমুক দিয়েই বন্ধ করে ফেললো দু চোখ। লাল তরল মুখের ভেতরে কিছুক্ষণ রেখে দিয়ে অনুভব করলো এর স্বাদ। গন্ধ।

আনমনেই আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিলো যেনো। গলা দিয়ে লাল তরলটা নামিয়ে দিয়ে চোখ খুললো সে। আকাশে ভেসে থাকা চাঁদের দিকে তাকালো। তিন-দিন পর পূর্ণিমা হবে। চাঁদটা এখন পূর্ণতার পথে। অল্প কিছু বিচ্ছিন্ন মেঘের টুকরো চাঁদটাকে আড়াল করে দিয়ে পরক্ষণেই চলে যাচ্ছে। দোতলার বারান্দায় বসে রকিংচেয়ারে দোল খেতে খেতে দৃশ্যটা দেখতে মনোরম লাগছে। গ্লাসটা সরিয়ে গভীর করে নিঃশ্বাস নিলো। সদ্য ফোঁটা হাসনাহেনা ফুলের গন্ধে তার বাগানটা অপার্থিব হয়ে উঠেছে।

সে জানে হাসনাহেনা ফুলের গন্ধ মিষ্টি। যেমন গোলাপের গন্ধ নোনতা, আর জংলী ফুলের গন্ধ তেতো। প্রকৃতির প্রতিটি গন্ধেরই এরকম স্বাদ রয়েছে। একটি গন্ধ আরেকটি গন্ধের সাথে মেশানো যায়; একটি স্বাদের সাথে আরেকটি স্বাদেরও মিশ্রণ হয়। তবে মানুষ গন্ধের ব্যাপারে সবচেয়ে আনাড়ি। শব্দ-স্বাদ-দৃষ্টি-স্পর্শ, এগুলোর ব্যাপারে মানুষ যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। শব্দকে ছয়টি সুরে-সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-বেধেছে। স্বাদকে টক, ঝাল, মিষ্টি, নোনতা আর তেতো এই পাঁচটি ভাগে আলাদা করেছে। জগতের সকল রঙকে সাতটি রঙে ভাগ করেছে মানুষ। আর স্পর্শ সবচেয়ে সথুল ইন্দ্রিয়; গরম-ঠাণ্ডা, নরম-কোমল, শক্ত-তরল-বায়বীয়-এর বাইরে আর কোনো অনুভূতি নেই। কিন্তু গন্ধের বেলায় এসে বিপাকে পড়ে গেছে। গন্ধ কয় প্রকার-কেউ নির্দিষ্ট করে বলতে পারে না। মুচকি হাসলো সে। ভালো করেই জানে এর কারণ কি। গন্ধ সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর। এটা বাতাসে ভেসে বেড়ায়। নানারকম গন্ধের সাথে মিশে যায় দ্রুত। এই মেলামেশাকে থামানো যায় না। অদৃশ্যভাবে, সবার অগোচরে ঘটে যায়, সেজন্যে আলাদা করাটাও খুব কঠিন হয়ে পড়ে। শৈশব থেকে মানুষ গন্ধ নেবার ইন্দ্রিয় ‘নাক’ নিয়ে বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে। এ জগতের প্রায় সবকিছুরই গন্ধ আছে। সেগুলো ভেসে বেড়ায় বাতাসে। আর বাতাস মানেই সর্বত্রগামী। ফলে প্রকৃতিতে এক একটি গন্ধ খুব বেশি সময় নিজস্বতা ধরে রাখতে পারে না।

স্বাদ পুরোপুরি জিভের উপর নির্ভরশীল। শব্দ নির্ভর করে কানের উপরে। দৃষ্টির নির্ভরতা চোখেতে। একদিক থেকে দেখলে স্বাদের ব্যাপারটা বেশ নিশ্চিত। টক-ঝাল-মিষ্টি-নোনতা-তেতো-এসব স্বাদের পার্থক্য বোঝাটাও খুব কঠিন কিছু নয়। পাঁচটি স্বাদের মধ্যে বেশ ভিন্নতার কারণে আলাদা। করতে খুব একটা অসুবিধাও হয় না।

একটি স্বাদকে আরেকটির সাথে মিশিয়ে তৈরি করা যায় নতুন স্বাদ। মিষ্টির সাথে মিষ্টি। এটা ভারসাম্য তৈরি করে। কিন্তু প্রকৃতিতে শুধু ভারসাম্য আর সাযুজ্যই মেলে না, বৈপরীত্যও দেখা যায়। দেখা যায় ভিন্নতা। ডিজাইনাররা একে বলে কন্ট্রাস্ট। ভারসাম্যের ঠিক উল্টো। কিংবা আদৌ ভারসাম্যপূর্ণ নয়। টকের সাথে ঝাল। ঝালের সাথে মিষ্টি! টকের সাথে মিষ্টি। মিষ্টির সাথে নোনতা! নোনতার সাথে ঝাল! সবই সম্ভব। শুধু দরকার সীমাটুকু বোঝা। ঝালের রয়েছে নির্দিষ্ট সীমা। মিষ্টি, টক, নোনতা সবকিছুরই সীমানা আছে। কে কার সীমানায় কতোটুকু অনুপ্রবেশ করবে সেই পরিমিতবোধ থাকতে হবে, নইলে বিপর্যয়।

এই বিপর্যয় উভয়ের জন্যেই!

আজ হঠাৎ করেই একজন সীমানা লঙ্ঘন করেছে। তাকে অসহায় আর দুর্বল এক নারী ভেবেছে। মনে করছে তার সাথে যা-ইচ্ছে তাই করা যাবে। লোকটার ধারণাই নেই সে কতো বড় ভুল করেছে। তবে এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে না। দুশ্চিন্তা করার মতো নার্ভ বহুকাল আগে এক অবিশ্বাস্য ঘটনার পর হারিয়ে ফেলেছে সে।

আরেকটু চুমুক দিয়ে পাশের টেবিলে রেখে দিলো গ্লাসটা। বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো তার ঠোঁটে।

বিপদের সবটুকু, বিপর্যয়ের সবটুকু সীমা লঙ্ঘনকারীর জন্যেই বরাদ্দ!

*

“হায় হায়!” গর্তের উপর থেকে আতর আলীর কণ্ঠটা শুনতে পেলো ছফা।

“কব্বরে পইড়া গেছেন দেহি!”

কথাটা শুনে তার গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেলো। কবরে! নরম আর ভেঁজা মাটির সাথে তার গালে আর দু-হাতে লেগে আছে কঙ্কালের মতো কিছু। সারা শরীর গুলিয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। আমি কি পচা-গলা লাশের উপরে পড়ে আছি? সঙ্গে সঙ্গে ধরফর করে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই টের পেলো আতর আলী তার ডানকাঁধে হাত রেখেছে।

“ভাইজান, আমার হাতটা ধরেন...জলদি উইঠ্যা আসেন।”

ইনফর্মারের হাতটা শক্ত করে ধরলো সে। গর্ত থেকে উঠে আসার পর বুঝতে পারলো শরীরে কিছু কাদা লেপ্টে আছে।

“চোট পান নাই তো?”

“না।” দাঁতে দাঁত পিষে বললো ছফা। “এ-এক্ষুণি ধুতে হবে এগুলো!” গায়ের কাদাগুলো দেখিয়ে বললো। কবরস্তানের কাদা নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর কথা চিন্তাও করতে পারছে না।

“আসেন,” আতর তার হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললো। “সামনেই একটা খাল আছে.. ধুইয়া নিয়েন।”

রাগেক্ষোভে সারা শরীর কাঁপছে তার কিন্তু মুখে কিছু বললো না। এই ব্যাটা ইনফর্মার শর্ট-কাট মারতে গিয়ে কবরস্তানের ভেতর দিয়ে না এলে এভাবে কবরে গিয়ে পড়তে না আজ। “ও-ওখানে কঙ্কাল আছে মনে হলো!” খোলা কবরের দিকে ইঙ্গিত করে বললো সে।

“আরে না। ওইটা তো নতুন কব্বর...ঐ দেহেন,” জবাব দিলো। ইনফর্মার। কবরের একপাশে আলগা মাটির স্তূপ দেখালো হাত দিয়ে।

হাফ ছেড়ে বাচলো ছফা। সম্ভবত আতঙ্কের কারণে সে মনে করেছে কবরের ভেতরে কঙ্কাল রয়েছে। ওগুলো হয়তো গাছের ডালপালাও হতে পারে, কিংবা অন্য কিছু। এমন

সময় গাছের পাতা নড়ার শব্দে চমকে উঠলো সে। শব্দটার উৎসের দিকে তাকালো। তাদের থেকে দশহাত দূরে একটা বড় গাছ। ডাল-পালা ছড়িয়ে আছে মাথার উপরে। গাছটার চারপাশে কবরের সারি।

"কে ওখানে?" গাছটা দেখিয়ে বললো।

"ওইখানে আবার কে?" বুঝতে না পেরে বললো আতর।

"আপনি কিছু শুনতে পান নি? আমার তো মনে হচ্ছে গাছের আড়ালে কেউ আছে।"

আতর চোখ কুচকে তাকালো সেদিকে। অন্ধকারে অবশ্য বেশি কিছু দেখারও নেই। "আরে না," অবশেষে বললো সে। "কবরস্তানে আইলে সতেরই এমন মনে হয়। এইটা হইলো মনের ভুল।"

আক্ষেপে মাথা দোলালো ছফা। আসলেই তার মনের ভুল কিনা বুঝতে পারছে না।

"কবরস্তানে আত্মা-ফাত্মা কিছু থাকে না..থাকে বাঘডাশ, শিয়াল এইসব জানোয়ার।" একটু থেমে আবার বললো, "আহেন…সামনে আগাই

ছফাও চাইছে এই কবরস্তান থেকে যতো দ্রুত সম্ভব বের হয়ে যেতে। ইনফর্মারের পাশাপাশি আবার হাঁটতে শুরু করলো সে।

"ফালু পোলাটা আজিব কিসিমের, বুঝলেন?" হাঁটতে হাঁটতে বললো ইনফর্মার। "হালারপুতে অ্যাডভান্স কব্বর খুইদা রাখে।"

অ্যাডভান্স কবর খুরে রাখে মানে! অবাক হলো ছফা। "ফালু কে?"

"ফালু এই কবরস্তানের গোর খুদে।" বলতে শুরু করলো ইনফর্মার। "পোলাটার বেরেইনে এটু পবলেম আছে।"

ফালু কিংবা খালু, কারোর ব্যাপারেই তার কৌতূহল নেই। যত্তসব ফালতু লোকজন। হাতে-পায়ে লেগে থাকা কাদাগুলোর জন্য সারা শরীর গুলিয়ে উঠছে। লম্বা লম্বা পা ফেলে আতর আলীর পাশে চলে আসার সময় অন্ধকারে খেয়াল করেনি সরু রাস্তার পাশে সদ্য খোরা একটি কবর ছিলো। সেই খোলা কবরে বাম পা-টা পড়তেই ভারসাম্য ধরে রাখতে পারে নি।

"সুন্দরপুরের অনেকে মনে করে ফালু খুব কামেল লোক। তারে খুব মাইন্য-গইন্যও করে। বাড়িতে কেউ বিমারে পড়লে ওরে নিয়া গিয়া ভালমন্দ খাওয়ায়…যেন ফালু তাগোর রুগির লাইগা অ্যাডভান্স কব্বর না খুদে। এইটারে আপনে ঘুষও কইবার পারেন।"

ছফা তু-হা কিছুই করলো না। সে জানে প্রতিটি গ্রামেই এরকম কিছু কামেল লোকজন থাকে। অর্ধেক গ্রাম তাকে মানে, বাকি অর্ধেক তার ব্যাপারে আধো-অবজ্ঞা আর সন্দেহ পোষণ করে। এদেরকে ঘিরে এক একটি কিংবদন্তী ঘুরে বেড়ায় গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যেই। বড়জোর আশেপাশের কয়েকটি গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে সেটা। তারপর কামেলদের কেরামতি আর দৌড়ায় না! এ দেশে কেরামতিগুণসম্পন্ন বাবা হওয়াটা খুব সহজ। একজন মস্তিষ্কবিকৃত মানুষও উদ্দেশ্যবিহীনভাবে হাটা-হাটি করে বাবা হয়ে যেতে পারে!

"পোলাটা কেমতে জানি জাইনা যায় গেরামে কেউ মরবো…মরার আগেই অ্যাডভান্স কব্বর রেডি কইরা রাখে।"

শালার অ্যাডভান্স কবর! মনে মনে বললো ছফা। এইসব তারছেঁড়া লোকজনের ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ নেই। সে নিশ্চিত, এই ফালু লোকটি চতুর জ্যোতিষী, ভণ্ডপীর আর সাধুবাবাদের মতোই কেউ হবে। নিজের চাতুর্য আর গ্রামের মানুষজনের বিশ্বাসের দুর্বলতাই যাদের একমাত্র সম্বল।

"ওর অ্যাডভান্স কব্বর খুদার কথা শুনলে গেরামের বুড়া-বুড়িগো বুকপুকানি শুরু হইয়া যায়। আর যে ব্যাটা-বেটি বিমার হইয়া বিছানায় পইড়া আছে ওর তো পাতলা পায়খানা

শুরু হইয়া যায়। বার বার খালি দরজার দিকে তাকায় দেখে আজরাইল আইলো কিনা!”

দীর্ঘশ্বাস ফেললো ছফা। এসব কথাবার্তায় বিরক্ত হয়ে উঠছে সে।

“এহন পর্যন্ত ফালুর অ্যাডভান্স কব্বর মিস হয় নাই!” প্রশংসার সুরে বললো আতর।

জীবিত অবস্থায় কবরে পতিত হবার বিচ্ছিরি অভিজ্ঞতা লাভ করার পর এসব গাঁজাখুড়ি গল্প শুনতে ইচ্ছে করছে না। ফালুর শতভাগ রেকর্ড অক্ষুণ্ন থাকবে কি থাকবে না সেটা নিয়েও তার কোনো মাথাব্যথা নেই।

“তয় আইজ মনে হয় মিস্ হইবো। রাইত তো মেলা হইছে, এহনও কুনো মরার খবর নাই!”

“আর কত দূর?” অধৈর্য হয়ে জানতে চাইলে ছফা। ফালুসংক্রান্ত আলাপ থেকে তাদের গন্তব্যের দিকে মনোযোগ ফেরাতে চাইছে।

“ওই তো মাস্টরের ভিটা দেহা যাইতাছে…হারিকেন জ্বলছে ঘরে।”

একটু দূরে মিটমিট করে লালচে আলো জ্বলতে দেখলো সে। “আমি খালের কথা বলছি, হাত-পা ধুতে হবে।”

“ও,” ইনফর্মার বললো, “ওইটা মাস্টরের ভিটার এট্টু আগেই..”

ছফা আর কথা বাড়ালো না, জোরে জোরে পা চালালো।

“…এই তো, সামনেই…”

*

আতর আর ছফা যখন কবরস্তান থেকে বের হয়ে যাচ্ছে তখন তাদের অলক্ষ্যে, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে আবছায়া এক মূর্তি মুখে গামছা। পেচিয়ে বড়সড় জারুল গাছের আড়াল থেকে চুপচাপ দেখে যাচ্ছে। দু-জন মানুষের অবয়ব মিইয়ে গেলে গাছের আড়াল থেকে বের হয়ে এলো সে। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলো সিদ্ধান্তহীনতায় তারপর এগিয়ে গেলো খোলা কবরের দিকে।

অধ্যায় ৬

আশেপাশে বিস্তৃত ক্ষেতের মধ্যে উঁচু একটি ভিটে চাঁদের মলিন আলোতেও উদ্ভাসিত। বড়বড় জানা-অজানা বৃক্ষ যেনো হাতে হাত ধরে চারপাশ ঘিরে প্রাচীর বানিয়ে রেখেছে। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রাচীর ভেদ করে টিমটিমে লালচে আলোর একটি বিন্দু জ্বলছে।

একটা সরু খালের পানিতে যতোটুকু সম্ভব হাত-পা-মুখ ধুতে ধুতে সেই ভিটের দিকে তাকালো ছফা। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আতর। আয়েশ করে সিগারেটে টান দিচ্ছে।

হাত-মুখ ধুয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। শার্টের একপাশে কিছুটা কাদা লেগেছে, ওগুলোর ব্যাপারে আপাতত কিছু করার নেই। পকেট থেকে রুমাল বের করে কিছুটা কাদা মুছে আতর আলীকে সাথে নিয়ে নিঃশব্দে কিছুটা পথ সামনে এগিয়ে গেলো। ভিটার কাছে আসতেই বোঝা গেলো একটা টিনের ঘরের জানালা দিয়ে হারিকেনের আলো দেখা যাচ্ছে।

মাটি কেটে তৈরি করা তিন-চারটা ধাপ পেরিয়ে উঁচ ভিটায় উঠেই হাঁক দিলো আতর, “মাস্টরসাব…ঘুমায় গেছেন নি? ও মাগুরসাব?”।

কয়েক মুহূর্ত পরই দরজা খুলে হাতে হ্যারিকেন নিয়ে বয়স্ক এক লোক বের হয়ে এলেন। “কে? এতো রাতে কে ডাকে?”

ভদ্রলোকের বাচনভঙ্গি স্পষ্ট এবং প্রমিত। ছফা কিছুটা অবাকই হলো। যে দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকও প্রমিত-বাঙলায় কথা বলতে পারে। না সেখানে সুন্দরপুরের প্রাইমারি-স্কুলের শিক্ষকের কাছ থেকে এরকমটি সে আশা করে নি।

"আমি আতর," নিজের নামটা সুন্দর করেই বললো ইনফর্মার। "ঢাকা থেইকা একজন মেহমান আইছে..."

গায়ে শাল জড়ানো এক বৃদ্ধ; মাথায় কানটুপি; মুখে গোঁফ আর লম্বা। দাড়ি; সবটাই সাদা ধবধবে; অবশ্য চোখে কোনো চশমা নেই।

"আমার সাথে দেখা করতে এসেছে?" বৃদ্ধের চোখেমুখে জিজ্ঞাসা। চোখ কুচকে দেখার চেষ্টা করলেন তিনি।

"আপনের চশমা কই, মাস্টরসাব?"

আতরের প্রশ্নে বৃদ্ধের চোখমুখ আরো কুচকে গেলো। "আর বোলো না, ঢাকা থেকে ফেরার সময় বাসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তখনই ব্যাগটা চুরি হয়ে যায়। চশমাটা ওটার ভেতরেই ছিলো।"

"ক কি?" কৃত্রিম আফসোস আতরের কণ্ঠে। "দ্যাশটা এক্কেবারে চোর বাটপারে ভইরা গ্যাছে।"

কথাটা শোনার পর বৃদ্ধের মুখে প্রচ্ছন্ন বাঁকাহাসি ফুটে উঠলো।

ছফা জানে পুলিশের ইনফর্মারদের কেউই পছন্দ করে না, তবে তাদেরকে ভয় পায়, তাই মুখ ফুটে কেউ কিছু বলার সাহস রাখে না।

চারপাশে তাকালো সে। উঁচু ভিটের উপরে একটি বসতবাড়ি। হালকা কুয়াশায় পৌণে একখান চাঁদের আলোয় শুধু দেখা যাচ্ছে সেই ভিটার চারপাশে বড়-বড় গাছের সমাহার। দুটো ছোটো-ছোটো টিনশেডের ঘর ছাড়া আর কিছু নেই। ঘর দুটোর বিপরীতে, মাঝখানের বিশাল আর পরিস্কার উঠোনের পর বাঁশ-কাঠ দিয়ে বানানো একটি টয়লেট। বাড়ির

চারপাশে বড়বড় গাছ ছাড়া ঝোঁপঝাঁড়ও রয়েছে প্রচুর। যেনো সুরক্ষিত প্রাচীর ওগুলো। ঝিঁঝি পোকা ডেকে যাচ্ছে বেশ জোরে জোরে।

মাস্টার ঘরের সামনে উঠানের দিকে যেতে থাকলে আর তার পেছন পেছন মিনতির সুরে কী যেনো বলতে বলতে এগিয়ে গেলো। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলো ছফা, সে বুঝতে পারছে না কী করবে।

"খাড়ায়া আছেন ক্যান? আহেন," পেছন ফিরে তাড়া দিয়ে বললো ইনফর্মার।

ঘরের সামনে ছাউনি দেয়া বারান্দায় একটা কাঠের বেঞ্চি আর দুটো চেয়ার আছে। দেখে মনে হচ্ছে কমপক্ষে ত্রিশ-চল্লিশ বছরের পুরনো। একটা চেয়ারে বসে পড়লেন মাস্টার, আতর আলী বসলো বেঞ্চিটাতে। ছফা এগিয়ে গিয়ে চুপচাপ অন্য চেয়ারটাতে বসে পড়লো।

"মাস্টরসাব, উনি ঢাকা থেইকা আইছেন...উনার নাম নুরে ছফা।"

মাস্টারের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে সালাম ঠকলো ছফা।

"এই গ্রামে উনার বিয়ার সম্বন্ধ হইছে, মাইয়ার ব্যাপারে খোঁজ নিবার চাইতাছেন..." আতর সময় নষ্ট না করে তার বানোয়াট কথাবার্তা বলে যেতে লাগলো। "...আমাগো ওসিসাব কইলো আপনের কাছেনিয়া যাইতে..."

নুরে ছফা মনে মনে হাসলো। ইনফর্মারদের এই এক স্বভাব, সব কিছুতে থানা-পুলিশের রেফারেন্স দেবে।

আতরের কথা আমলে না নিয়েই মাস্টার মুখ তুলে তাকালেন ছফার দিকে। তার মুখের অভিব্যক্তি বিভ্রান্তিকর। সেটা দেখে বোঝার উপায় নেই লোকটা কী ভাবছে।

“এই গ্রামে আপনের মতো শিককিত আর জ্ঞানী মানুষ একজনও নাই। এইখানকার সব মানুষের চৌদ্দগুষ্টির খবর আপনে জানেন। তার চায়াও বড় কথা, আপনে মানুষ ভালা। মিছা কথা-”।

হাত তুলে আতরকে থামিয়ে দিলেন মাস্টার। “পাত্রিটা কে? আমি কি ওকে চিনি? আমার কোনো ছাত্রি?”

আতর কোনো রকম লুকোছাপা না করেই ছফাকে চোখ টিপে মুচকি হাসি দিলো। চশমাহীন মাস্টারের ঝাপসা দৃষ্টির সুবিধা নিলো সে। “না, না। আপনের ছাত্রি না। ঐ যে… হোটেলওয়ালি..মুছকান,” ভুল উচ্চারণে নামটা বললো আতর। “মুছকান জুবুরি।”

ভুরু কুচকে ফেললেন মাস্টার। “উনি পাত্রি!”

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো সে। ইনফর্মারের ইশারা পেয়ে বললো, “জি… উনিই.”

ছফার দিকে ভালো করে তাকালেন মাস্টার। চোখ দুটো পিটপিট করে দেখার চেষ্টা করছেন। বোঝাই যাচ্ছে চশমা ছাড়া দেখতে পাচ্ছেন না ভালো করে। “ও,” আর কিছু বললেন না সুন্দরপুরের বৃদ্ধ মাস্টার।

“মাস্টরসাব, ভাইজান ঐ বেটির সমন্ধে কিছু জানবার চায়,” বিগলিত হাসি দিয়ে বললো আতর। “বুঝেনই তো, বিয়া-শাদীর ব্যাপার…”

অসন্তুষ্ট দেখালো মাস্টারকে। “বেটি, মাথারি এইসব শব্দ আমার সামনে বলবে না… ভদ্রমহিলা বলো।”

জিভে কামড় দিয়ে চোখ টিপে বললো ইনফর্মার, “মুককু-সুকু মানুষ…ভুল হইয়া গেছে, মাগুরসাব।”

একান্ত অনিচ্ছায় ছফার দিকে তাকিয়ে বললেন বৃদ্ধ, "আমি তো উনার সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানি না।"

"ওর ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডটা..." নুরে ছফা বললো। "...মানে আমি জানতে পেরেছি ও এই এলাকার নয়...তাহলে এখানে কিভাবে এলো?"

পিটপিট করে চেয়ে রইলেন বৃদ্ধ। "আপনার সাথে উনার পরিচয় হয়েছে কিভাবে?"

একটু ধন্দে পড়ে গেলো ছফা, তবে সেটা কাটিয়ে উঠতে বেশি সময়ও লাগলো না। "ইয়ে, মানে...ফেসবুকে।"

মাস্টার এবং আতর দু-জনেই ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো। এই জিনিসের নাম এর আগে তারা কেউ শুনেছে বলে মনে হলো না।

"কি বুক বললেন?"

"ফেসবুক।"

মাস্টার একটু ভেবে নিলেন। "এটা কি পত্রমিতালীর মতো কিছু? আগে চিঠির মাধ্যমে বন্ধুত্ব করার জন্য এক ধরণের চটি বই বের করা হতো...এখন আর ওসব দেখা যায় না।"

ছফা মুচকি হাসলো। পত্রমিতালী সম্পর্কে তার ভালোই ধারণা আছে। ছোটোবেলায় সেও এরকম বন্ধুত্ব করেছে গ্রামে বসে। ঢাকাসহ বড় বড় কয়েকটি শহরে তার কিছু পত্রমিতালী বনধু ছিলো, বলা বাহুল্য, তারা সবাই ছিলো মেয়ে! এ-সময়কার ফেসবুক যে আসলে পত্রমিতালীরই একটি ডিজিটাল সংস্করণ সেটা এর আগে কখনও মনেই হয় নি। প্রথমে ই-মেইল, সেলফোন এসে চিঠি-পত্র হটিয়ে দিলো, তারপর ফেসবুক এসে বিতারিত করলো পত্রমিতালীকে।

"অনেকটা সে-রকমই," বললো সে।

“ও,” মাস্টার আস্তে করে বললেন। “সেজন্যেই তেমন কিছু জানেন। না।”

কিছু বললো না ছফা।

“ভদ্রমহিলা অলোকনাথ বসুর নাতবৌ,” কথাটা বলেই উদাস হয়ে গেলেন তিনি। যেনো অতীতে ফিরে যাবার চেষ্টা করছেন।

ছফা আর আতর উদগ্রীব শ্রোতা হয়ে বসে রইলো।

“অলোকনাথ বসু ছিলেন সুন্দরপুরের সবচাইতে প্রভাবশালী পরিবারের শেষপ্রজন্ম,” গভীর করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে অবশেষে বলতে শুরু করলেন আবার। “কয়েক পুরুষ ধরে তারা জমিদার ছিলেন।”

“অলোকনাথ বসুর নাতবৌ মুশকান জুবেরি হয় কি করে?”

ছফার দিকে তাকালেন মাস্টার। “আপনার প্রশ্নটা একদম সঙ্গত। যেকোনো কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ এ প্রশ্ন করবে। এর পেছনে একটা গল্প আছে।”

“কি গল্প?”

“অলোকনাথ বসুর একটাই সন্তান ছিলো, অঞ্জলি বসু। উনি অনেক চেষ্টা করেছেন পুত্রসন্তানের জন্য, দ্বিতীয়বার বিয়েও করেছিলেন কিনতু লাভ হয় নি। ও ঘরে কোনো সন্তানই জন্মায় নি। যাইহোক, মেয়েটা একটু বড় হবার পর পুত্রসন্তানের ইচ্ছে পরিত্যাগ করেন তিনি, মেয়েকে ভালোভাবে লালন-পালন করার দিকেই মনোযোগ দেন।” একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন, “অঞ্জলিকে ঢাকায় পাঠানো হয় পড়াশোনার জন্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় সে, ওখানেই তার সাথে সাঈদ জুবেরির পরিচয় হয়। তারা দুজনেই ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েছিলো। ভাষা আন্দোলনে অংশ নেয়ার অপরাধে জেলও খেটেছে। অলোকনাথ বসু তার মেয়ের এই সম্পর্কের ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেন

নি। তার জন্য ব্যাপারটা ছিলো হৃদয়বিদারক। পুত্রসন্তানের আশা বাদ দিয়ে মেয়েকে ঘিরেই ভবিষ্যৎ বংশধরের স্বপ্ন দেখছিলেন, আর সেই মেয়ে কিনা বিয়ে করতে চায় মুসলিম ছেলেকে...” আবারো থেমে দম নিয়ে নিলেন মাস্টার। “যাইহোক, পিতার অমতে অঞ্জলি বিয়ে করে বসে জুবেরিকে। এটা সম্ভবত ভাষা আন্দোলনের দু-এক বছর পরের ঘটনা। এরপর দীর্ঘদিন মেয়ের সাথে যোগাযোগ রাখেন। নি অলোকনাথ।”

“তারপর?” ছফা মনে করলো শ্রোতা হিসেবে দুয়েকটা প্রশ্ন না করলে কেমন দেখায়।

“বিয়ের কয়েক বছর পর ওদের এক পুত্রসন্তান হয়, সেই ছেলেটার বয়স যখন পনেরো কি ষোলো তখন ঢাকাফেরত এক আত্মীয়ের কাছ থেকে অলোকনাথ বসু জানতে পারলেন তার নাতি দেখতে হুবহু তার মতোই হয়েছে। এই খবরটা শোনার পর থেকে উনার মধ্যে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেলো। সমস্ত রাগ চলে গেলো, বলতে পারেন। তাছাড়া উনারও বয়স হয়েছিলো...স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে কয়েক বছর আগে...নানা রকম অসুখ-বিসুখে পেয়ে বসেছিলো..কখন কি হয় কে জানে। তো, লোকমারফত মেয়ের কাছে। খবর পাঠালেন স্বামী-সন্তান নিয়ে বাড়িতে চলে আসার জন্য।”

মাস্টার থেমে গেলে ছফা দ্বিধায় পড়ে গেলো কিছু বলবে কিনা। “অঞ্জলি কি এসেছিলো?” অবশেষে বলেই ফেললো সে।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন মাস্টার। “স্বামী-সন্তান নিয়েই এসেছিলো। অঞ্জলি কিন্তু এমন সময় এলো যখন দেশের অবস্থা মোটেও ভালো ছিলো না।”

“কখন এসেছিলো ওরা?”

“৭০-এর নির্বাচনের পর পর,” বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বৃদ্ধ। “রাজনৈতিক অবস্থা তখন ভালো ছিলো না। অবশ্য ঢাকায় অনেক কিছু হলেও এই সুন্দরপুরে তেমন খারাপ পরিস্থিতি ছিলো না তখনও। প্রায় মাসখানেক এখানে ছিলো বোধহয়, তারপর

আবার ঢাকায় ফিরে যায় কিন্তু এরইমধ্যে অলোকনাথ নিজের সমস্ত সম্পত্তির বিরাট একটি অংশ একমাত্র নাতির নামে উইল করে দেন, বাকি সম্পত্তি উনি দেবোত্তর করে দিয়েছিলেন।”

“তার সম্পত্তির পরিমাণ কেমন ছিলো?”

ছফার দিকে এমনভাবে তাকালেন মাস্টার যেনো সে এক যৌতুকলোভী পাত্র, শুধুমাত্র বিরাট সম্পত্তির গন্ধ পেয়ে ছুটে এসেছে এই সুন্দরপুরে! “জমিদার হিসেবে অনেক সম্পত্তির মালিকই ছিলো কিনতু আস্তে আস্তে সেগুলো কমতে শুরু করে। তারপরও নাতির নামে যখন লিখে দিয়ে যান তখনও বেশ ভালো কিছু জায়গা-জমি আর স্বর্ণালঙ্কার ছিলো।”

ছফা চুপ মেরে রইলো।

“শুনেছি স্বর্ণালঙ্করগুলোর সবই নাতিকে দিয়েছিলেন, আর সম্পত্তির বেশিরভাগ।”

“তারপর উনার নাতি কী করলেন এগুলো পেয়ে?”

“ঐ সময় অলোকনাথ বসুর নাতির বয়স ছিলো খুব কম, মাত্র সাবালক হয়েছে। তাছাড়া উইল করার কয়েক মাসের মধ্যেই স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।” মাস্টার চুপ মেরে গেলেন। এবার দীর্ঘ সময়ের জন্য।

ছফা কিছু বললো না, অপেক্ষায় থাকলো মাস্টারের মুখ খোলার জন্য।

আবারো দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সুন্দরপুরের প্রবীণ শিক্ষক। “পঁচিশে মার্চের পর অঞ্জলি তার স্বামী-সন্তান নিয়ে এখানে বাবার কাছে চলে আসে আবার।” একটু কেশে নিলেন বৃদ্ধ। “এপ্রিলের শুরুতে পাকিস্তানি মিলিটারি সুন্দরপুরে আসে..অলোকনাথ, অঞ্জলি, সাঈদ জুবেরিসহ তার পরিবারের সবাইকে হত্যা করে।”

মাস্টারের চোখেমুখে বিষাদের ছায়া।

“উনারা ঐ সময় এখানেই ছিলেন? মানে সবাই?”

“শুধু রাশেদ জুবেরি বাদে।”

“রাশেদ জুবেরি?”

“অঞ্জলির ছেলে।”

“ও তখন কোথায় ছিলো?”

প্রবীণ লোকটি ছফার দিকে তাকালেন। চেহারায় বিষাদের ছায়া। প্রায় অস্ফুটস্বরে বললেন, “আমার এই বাড়িতে!”

“আপনার বাড়িতে?”।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন মাস্টার। “হুম। মিলিটারি হামলা চালাবার ঠিক আগে দিয়ে রাশেদ জুবেরি আমার সাথেই ছিলো। আমার কাছে এসেছিলো কিছু বই ধার নিতে। ছেলেটা খুব বই পড়তো। সুন্দরপুরে তো কোনো বইয়ের দোকান ছিলো না তখন... লাইব্রেরিও ছিলো না...অবশ্য এখনও নেই...” চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললেন, “ওর মা অঞ্জলিই বলেছিলো আমার কাছে প্রচুর বই আছে। সে জানতো আমি বই-টই পড়ি।”

“আপনার কাছে বই ধার নিতে এসে বেঁচে গেলো রাশেদ জুবেরি?”

“তা বলতে পারেন।”

আর কোনো প্রশ্ন না করে চুপ মেরে গেলো ছফা।

“পাকিস্তানি মিলিটারি সবাইকে খুন করে লাশগুলো জমিদার বাড়ির জোড়-পুকুরে ফেলে দেয়। পরে মিলিটারি জমিদার বাড়িটা দখল করে ওখানে ক্যাম্প বানায়...” মাস্টার

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ঐ ক্যাম্পে অনেককে ধরে নিয়ে নির্যাতন করা হয়েছিলো," ভদ্রলোক যেনো উদাস হয়ে গেলেন।

অনেকক্ষণ চুপ থেকে আতর আলী উসখুশ করতে শুরু করলো, কিন্তু তাকেশান্ত থাকার ইশারা করলো ছফা।

"এখানকার বদরবাহিনীর কিছু মেম্বার আমাদের গ্রামের অনেক হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করে...এরমধ্যে আমার অনেক আত্মীয়ও ছিলো।" মাস্টারের চোখ দুটো কেমন ঘোলা হয়ে গেলো। "আমাকেও করেছিলো.."।

ছফা কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বললো, "রাশেদ জুবেরি, তার কি হলো?"

দীর্ঘশ্বাসের সাথেই বললেন মাস্টার, "যখন জানতে পারলাম মিলিটারি ওর পরিবারের সবাইকে হত্যা করেছে তখন আমি ওকে নিয়ে নিরাপদ কোথাও পালানোর চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তখন পুরো গ্রাম ঘিরে রেখেছিলো মিলিটারি আর তাদের দোসররা। ওরা এই বাড়িতেও হানা দেয়। উপায় না দেখে বড় কবরস্তানে গিয়ে লুকাই আমরা।"

কবরস্তানের কথা শুনে ছফার মনে পড়ে গেলো একটু আগে সে কবরে পড়ে গেছিলো।

"একটা পুরনো কবর...শেয়াল-কুকুর হয়তো গর্ত করে রেখেছিলো...আমরা দু-জন ওটার মধ্যে ছিলাম সারাটা রাত।"

একটু আগে কবরে পতিত হবার ব্যাপারটা মামুলি হয়ে গেলো এ কথা শুনে। "তারপর?"

"পরদিন খুব ভোরে রাশেদকে নিয়ে আমি সুন্দরপুরের বাইরে যাবার চেষ্টা করলে মিলিটারির কাছে ধরা পড়ে যাই।"

"রাশেদ জুবেরি ধরা পড়ে নি?"

মাথা দোলালেন মাস্টার। "না। আমি ধরা পড়লেও ও পালিয়ে যেতে পেরেছিলো।"

"আপনাকে মিলিটারি ধরার পর কি করলো?"

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বৃদ্ধ। "কী আর করবে..জমিদার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখলো। মারধোর করলো। শেষে মুসলিম হয়ে গেলাম জীবন বাঁচাবার জন্য...ওরা ছেড়ে দিলো আমাকে।"

ছফা আর কিছু বললো না।

"যুদ্ধের বাকি সময়টা এখানেই ছিলাম। পাঁচ-ওয়াক্ত নামাজ পড়তাম, শান্তি কমিটির মিটিংয়ে হাজির থাকতাম..." আবারো দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছফার দিকে তাকালেন। "...সেই হিসেবে আমাকেও রাজাকার বলতে পারেন!"

বিবৃত হবার অভিব্যক্তি লুকানোর চেষ্টা করলো ছফা। "রাশেদ জুবেরির এর কোনো খবর পান নি?"

"না। আমি ভেবেছিলাম ও হয়তো মারা গেছে।"

"যুদ্ধ শেষে জানলেন মারা যায় নি?"

"হুম।"

"তারপর?"

"যুদ্ধের পর অলোকনাথের সমস্ত জায়গা-জমি অর্পিতসম্পত্তি হিসেবে নিয়ে নিলো সরকার। বাপ-মা, পরিবার-পরিজন হারিয়ে রাশেদ জুবেরির মানসিক অবস্থা এমন ছিলো যে, সম্পত্তিগুলো ফিরে পাবার কোনো চেষ্টাই করেনি তখন। কয়েক মুহূর্তের সুনসান নীরবতা ভেঙে আবারো বলতে লাগলেন তিনি, "পরে শুনেছি ও এখান থেকে পালিয়ে

গিয়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলো। যুদ্ধশেষে ঢাকায়ই থাকতো। বনানীতে ওর বাবার বিরাট একটি বাড়ি ছিলো।”

“ঐ ছেলেটা কি সম্পত্তিগুলো আর উদ্ধার করার চেষ্টা করে নি?”

“কয়েক বছর পর সম্পত্তিগুলো ফেরত পাবার চেষ্টা করেছিলো কিন্তু সফল হয় নি।”

“সে কি করতো? মানে কাজের কথা বলছি।”

“শুনেছি ব্যবসা করার চেষ্টা করেছিলো, সুবিধা করতে পারে নি। আসলে বাবার সম্পত্তি আর নানার কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রচুর স্বর্ণালঙ্কার বিক্রি করে ঢাকায় বেশ সচ্ছলভাবেই থাকতো সে। সম্ভবত বাড়ি ভাড়ার টাকায় চলতো। মাঝেমধ্যে এখানে আসতো…কয়েকটা দিন আমার এখানে থেকে আবার ঢাকায় চলে যেতো। একটু বাউণ্ডুলে আর অগোছালো ছিলো। সংসার করার দিকে আগ্রহ ছিলো না। খুব বই পড়তো। নেশার মতো বই নিয়ে পড়ে থাকতো সে,” একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, “৯৪ কি ৯৫’র পর দীর্ঘদিন আর এখানে আসে নি। আমার সাথেও যোগাযোগ হয় নি। অনেকদিন পর শুনতে পেলাম ও অসুখে পড়েছে।”

“এটা কোন সালের ঘটনা?”

ছফার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকালেন মাস্টার। “২০০৬ সালের দিকে হবে।”

“উনার কি রোগ হয়েছিলো?”

“ক্যান্সার..প্রোস্টেট ক্যান্সার।”

“উনি কি সুস্থ হতে পেরেছিলেন?”

মাথা দোলালেন বৃদ্ধ। “না।”

“তাহলে মুশকান জুবেরির সাথে

মাস্টার হাত তুলে থামিয়ে দিলেন তাকে। “বলছি। ২০১০ সালের দিকে একটা কাজে ঢাকায় গেছিলাম কয়েকদিনের জন্য, তখন হাসপাতালে গিয়ে ওকে দেখে এসেছিলাম। ভীষণ অসুস্থ ছিলো...দেখাশোনা করার মতো কেউ নেই বলে মাসের পর মাস হাসপাতালেই পড়ে থাকতো।”

||||||||| “মি. জুবেরি কোন্ হাসপাতালে ছিলেন?” উদগ্রীব হয়ে জানতে চাইলো ছফা।

||||||||| “অরিয়েন্ট হাসপাতাল।” একটু থেমে ঢোক গিলে নিলেন। “আমি ঢাকা থেকে ফিরে আসার ছয় কি সাত মাস পর মুশান জুবেরি নামের মহিলা এসে হাজির হয় সুন্দরপুরে। নিজেকে রাশেদের স্ত্রী দাবি করে সে।”

মাস্টারকে চুপ থাকতে দেখে ছফা বলে উঠলো, “এ ব্যাপারে কি আপনার মনে কোনো সন্দেহ রয়েছে?”

চোখ পিটপিট করে তাকালেন বৃদ্ধ। “মারাত্মক অসুস্থ, বিছানায় শুয়ে থাকা একজন মানুষ কখন বিয়ে করলো, কিভাবে করলো-এটা ঠিক হিসেবে মেলাতে পারি না। প্রোস্টেট ক্যান্সারের রোগিকে বিয়ে করাটাও বিরল ব্যাপার নয় কি? তাছাড়া যে লোক সুস্থ-সবল অবস্থায় সংসার করার নাম নেয় নি, সে কিনা দুট করে মৃত্যুশয্যায় বিয়ে করে বসলো... স্বীকার করছি, আমি এই বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে সন্দেহ করি এখনও

“উনি যখন এখানে আসেন রাশেদ জুবেরি কি তখনও বেঁচে ছিলেন?”

“না।”

“তাহলে মি. জুবেরি কবে মারা গেছিলেন? আর বিয়েটাই বা করলেন কবে?”

"ভদ্রমহিলা এখানে আসার দু-একমাস আগে জুবেরি মারা যায়...তাদের বিয়েটা কবে হয়েছিলো সেটা আমি জানি না।"

"মুশকান জুবেরি সম্পত্তিগুলো কিভাবে পেয়ে গেলেন? সম্পত্তিগুলো তো রাশেদ জুবেরি উদ্ধারই করতে পারেন নি।"

ছফার দিকে তাকিয়ে রইলেন মাস্টার। "এসব খবর আমার ভালো করে জানা নেই। লোকজন এ নিয়ে নানান ধরণের গালগল্প করে বেড়ায়। কোটা সত্যি কে জানে," এরপর আতরের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন তিনি, "আপনার সাথে যে আছে ও-ই বরং এ ব্যাপারে ভালো বলতে পারবে।"

ইনফর্মার বিগলিত হাসি দিয়ে ছফাকে আশ্বস্ত করলো। "মাস্টরসাব, ঠিকই কইছেন... এইটা আমি আপনেরে ডিটেইল কমু নে।"

আতরকে কিছু না বলে মাস্টারের দিকে তাকালো নুরে ছফা। "ঐ মহিলা কি রবীন্দ্রনাথের ভক্ত নাকি?...রেস্টুরেন্টের অমন নাম দিয়েছে যে?"

"উনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভক্ত কিনা সেটা আমি বলতে পারবো না তবে আমার মনে হয় নামটার সাথে ভক্ত হবার না-হবার কোনো সম্পর্ক নেই।"

ছফা আগ্রহী হয়ে উঠলো। "ভক্ত না-হলে এমন নাম রাখার কারণটা কি?"

মাস্টার গভীর করে দম নিয়ে নিলেন। "আগেই বলেছি, মহিলা কেন এমন নাম রেখেছেন সেটা আমি জানি না তবে এমন নামে আমি খুব একটা অবাক হই নি।"

নড়েচড়ে বসলো ছফা।

"সত্যি বলতে কি, রবীন্দ্রনাথ আসলেই এখানে কখনও খেতে আসেননি!"

“উনার আসার কথা ছিলো নাকি?” আগ্রহী হয়ে উঠলো ছফা।

স্থিরচোখে চেয়ে থেকে আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিলেন বৃদ্ধ, তারপর গম্ভীরকণ্ঠে বললেন “...ছিলো, কিন্তু উনি আসেন নি।”

“কেন আসেন নি?”

গভীর করে দম নিয়ে নিলেন সুন্দরপুরের বৃদ্ধমাস্টার। “অলোকনাথের বাবা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক মানুষ। তাদের মধ্যে জানাশোনাও ছিলো। এক জমিদারের সাথে আরেক জমিদারের সম্পর্ক থাকাটাই তো স্বাভাবিক।” একটু কেশে নিলেন তিনি। “শুনেছি, অলোকনাথের বাবা। ত্রিলোকনাথ বসু রবীন্দ্রনাথকে সুন্দরপুরে আসার নেমন্তন্ন করেছিলেন। কবির জন্য বিশাল আয়োজন করেছিলেন তিনি। ঢাকা আর লক্ষৌ থেকে বাবুর্চি এনে রান্না-বান্নাও করেছিলেন হরেকরকম পদের। নিজের বাড়িটাও সাজিয়েছিলেন...আয়োজনে কোনো কমতিই ছিলো না কিন্তু একেবারে শেষমুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ প্রকাশ করে জানিয়ে দেন তিনি আসতে পারছেন না।”

“উনি...মানে রবীন্দ্রনাথ কেন আসলেন না? কারণটা কি ছিলো?”

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মাস্টার। “এটা ১৯১৮ সালের ঘটনা। যেদিন উনি রওনা দেবেন তার আগের দিন উনার বড়মেয়ে মাধুরিলতা মারা যায়।”

“ও,” আস্তে করে বললো ছফা।

“সম্ভবত মিসেস জুবেরি এই গল্পটা রাশেদের কাছ থেকে শুনে থাকবেন...তাই অমন অদ্ভুত নাম দিয়েছেন।”

মাস্টারকে চুপ মেরে যেতে দেখে ছফা উঠে দাঁড়ালো। তার দেখাদেখি আতরও। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। বলার মতো আর কিছু নেই বৃদ্ধের। “আপনাকে ধন্যবাদ,” বললো সে। “অনেক সময়

নষ্ট করলাম আপনার। ভালো থাকবেন। নমস্কার।”

মাথা নেড়ে সায় দিলেন বৃদ্ধ। ছফা আর আতর কয়েক পা এগোতেই পেছন থেকে আস্তে করে কিন্তু দৃঢ়তার সাথে বলে উঠলেন, “আমার কাছে মিথ্যে বলার দরকার ছিলো না।”

চমকে উঠলো তারা দুজন। মাস্টারের ঘোলা দু-চোখ যেনো জ্বলজ্বল করছে। তারা কিছু বলার আগেই বৃদ্ধ বলে উঠলেন আবার :

“আমি মিথ্যে কথা একদমই পছন্দ করি না।” ছফা কিছু বলতে যাবে অমনি তিনি হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন। “কিছু বলতে হবে না। আপনি কে, কোন উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন সে-সব জানার কোনো আগ্রহ নেই আমার।”

তারপর কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন তিনি। একটু শব্দ করেই দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। কয়েক মুহূর্ত দরজার কপাটের দিকে ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো ছফা। দরজার পাশে চেয়ারের উপরে রাখা হারিকেনের আলোয় একটা লেখা পড়ার চেষ্টা করলো সে। “উনার নামটা যেনো কি?”

তবে আতর আলী মুখ খোলার আগেই লেখাটা পড়তে পারলো সে।

.

অধ্যায় ৭

রমাকান্তকামার!

অন্ধকারে বিড়বিড় করে উঠলো ছফা।

টাউনে ফিরে যাচ্ছে তারা, তবে শর্টকাট পথ ছেড়ে, কবরস্তানটি এড়িয়ে ঘুরপথে যাচ্ছে এখন।

ছফা জানে রমাকান্ত একটি নাম, যেমন রজনীকান্ত, সজনীকান্ত। কিনতু কামার নিশ্চয় পদবী-টাইটেল। ওটা নামের থেকে আলাদা করেই লেখে সবাই। সম্ভবত মাস্টার নিজের নামটাকে আরেকট বৈশিষ্টপূর্ণ করার জন্য রমাকান্ত আর কামারের মাঝখানে কোনো ফাঁক রাখেন নি। ফলে নামটি উল্টো করে বললে কিংবা লিখলে একই থাকে! এটাও কি এক ধরণের অ্যাম্বিগ্রাম? ছফা নিশ্চিত হতে পারলো না।

মাথা থেকে রমাকান্তকামার বিদায় করে দিয়ে আতর আলীর বয়ানের দিকে মনোযোগ দিলো সে। বিসতৃত ধানক্ষেতের আইল ধরে এগিয়ে যেতে যেতে মুশকান জুবেরির আগমনের গল্পটি বলে যাচ্ছে ইনফর্মার। গল্পটি ছফাকে বেশ আগ্রহী করে তুললো।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পর অলোকনাথ বসুর সম্পত্তিগুলো সরকার অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে নিয়ে নিলেও ওগুলো মূলত ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতাদের ভোগ-দখলেই ছিলো। ২০০৮ সালের দিকে মুশকান জুবেরি সম্পত্তিগুলো নিজের অধিকারে নিয়ে নেয় খুব সহজে কারণ রাজনীতিবিদদের জন্য ওই সময়টা ছিলো খুবই কঠিন। তবে ২০০৯ সালে মিলিটারি চলে যাবার পর আস্তে আস্তে রাজনীতিকেরা আবার ফিরতে শুরু করে, তখন ঝামেলা বেঁধে যায়। পুনরায় বেদখল হয়ে যায় কিছু সম্পত্তি। অবশেষে স্থানীয় এমপির সাথে একটা বোঝাঁপড়া করে নেন ভদ্রমহিলা, ফলে কিছু সম্পত্তি ফিরে পান। সেই সম্পত্তির পরিমাণও নেহায়েত কম নয়।

ভদ্রমহিলা এখানে এসেই সরাসরি জমিদার বাড়িতে উঠলেন। সেটা ২০০৮ সালের ঘটনা। অলোকনাথ বসুর বাকি সম্পত্তিগুলোও তিনি নিজের দখলে নিয়ে দেখভাল করতে শুরু করলেন। ব্যাপারটা সুন্দরপুরে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠলেও এ-নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি কেউ, কারণ স্থানীয় এমপি মহিলাকে সব ধরণের সাহায্য করেছেন। এই সাহায্য মোটেও নিঃস্বার্থ ছিলো না, বিনিময়ে বোসবাবুর সম্পত্তির বিরাট একটি অংশ লাভ করেন তিনি। যেসব সম্পত্তি দেবোত্তর করে দিয়েছিলেন সেগুলোর প্রায় সবটা চলে গেছে এমপির

পকেটে, বাকি যে সম্পত্তিগুলো জুবেরির নামে লিখে দিয়েছিলেন সেগুলো পেয়ে যায় ঐ মহিলা।

"খালি জমি না, এহন ঐ বেটিরেও ভোগ-দখল করবার চায় এমপিসাব," বেশ রসিয়ে রসিয়ে বললো আতর।

তারা এখন বিসতৃর্ণ ক্ষেত পেরিয়ে একটা ডোবার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। একটুখানি খামতি নিয়ে আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে জ্বলজ্বলে চাঁদ। প্রায় পূর্ণিমা। জ্যোৎস্নার আলোয় প্লাবিত চারপাশ।

"উনাকে ভোগ-দখল করতে চায় মানে?" ছফা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

আতরের বিশ্রী হাসিটা আরো প্রকট হয়ে উঠলো চাঁদের আলোয়। "বুঝলেন না?" তারপর কোনো জবাবের আশা না করেই বলতে লাগলো, "এমপিসাব এহন ঐ বেটিরে শাদী করবার চায়।"

"আপনাদের এমপি কি বিবাহিত না?"

হা-হা-হা করে হাসলো পুলিশের ইনফর্মার। "ঘরে বউ থাকলে কি ব্যাটমানুষ আর বিয়া করবার চাইবো না?"

এ কথার কোনো জবাব দিলো না ছফা।

"হুনেন, আমাগো এমপির বাপ-দাদারা সবতে তিন-চাইরটা কইরা বিয়া করছে..এহন সে যদি বাপ-দাদার ইজ্জত রাখতে চায়, তারে তো কমসে কম দুইটা বিয়া করনই লাগে, নাকি?"

কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে আবার সে বললো, "এমপি যে ঐ মহিলাকে বিয়ে করতে চায় এটা কি এখানকার সবাই জানে?"

“সবাই জানবো কেমনে? এতো ভিতরের খবর তো সব্বতে জানোনের কথা না।”

“ঐ মহিলা কি এই বিয়েতে রাজি হচ্ছে না?” রবীন্দ্রনাথের ভেতরে প্রাইভেট রুম থেকে গম্ভীর মুখে এমপির বের হয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা ভেসে উঠলো ছফার চোখে।

“ঐ বেটি এতো সহজে রাজি হইবো নি...আজব!”

“কেন রাজি হবে না?”

“আরে, ঐ বেটি ভালা কইরাই জানে বাকি জায়গা-জমি খাওনের ধান্দায় এমপিসাব হেরে দুই নম্বর বিবি বানাইবার চাইতাছে।”

“এতো জমির মালিক হবার পরও এমপি আরো চাইছে?”

আতর এমনভাবে তাকালো ছফার দিকে যেনো সে দিন-দুনিয়া সম্পর্কে যথেষ্ট আনাড়ি। “পুলিটিশিয়ানগো খিদা কুনোদিন শেষ হয় না..বুঝলেন। হেরা কব্বরে গেলেও খাই-খাই করে।”

মুচকি হাসলো ছফা। আজব একটা দেশ। সে এখন পর্যন্ত এমন কোনো জায়গায় যায় নি যেখানকার লোকজন রাজনীতিবিদদের পছন্দ করে, তাদের সম্পর্কে ভালো কথা বলে, অথচ যুগ যুগ ধরে এদেরকেই ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসিয়ে যাচ্ছে।

“আমাগো ওসিসাব কি কয় জানেন?”

“কি বলে?”

“ওসিসাব কয়, ঐ বেটি এমপিরে জাদু করছে। নাকে দড়ি লাগায়া ঘুরাইতাছে হেরে। বেটি কুনোদিনও এমপিরে বিয়া করবো না...কিনতু ডাইরেক্ট না-ও করবো না। এইটাই বেটির চালাকি।”

“হুম।” ছফা আর কিছু বললো না। তার মাথায় এখন ঘুরছে অন্য চিন্তা।

ক্ষেত পেরিয়ে একটা বসতবাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় করুণ সুরে মেয়েমানুষের কান্নার শব্দ ভেসে এলো।

“বুঝলেন কিছু?” পেছন ফিরে বললো আতর।

“কি?” ছফা কিছুই বুঝতে পারছে না।

“ফালুর অ্যাডভান্স কব্বর তো এইবারও মিস হইলো না মনে হইতাছে!”

কথাটা বলার সময় ইনফর্মারের মুখে শোকের লেশমাত্র দেখা গেলো না, যেনো খুব মজার কিছু ঘটে গেছে।

আরেকটু এগোতেই এক নারীকণ্ঠের বিলাপ কানে এলো। সুরে সুরে কেঁদে চলেছে সে।

“আমি এহন কেমনে একলা থাকুম...ও তমিজের বাপ! তুমি আমারে রাটি কইরা কেমনে চইলা গেলা!”

হাসিটা জোর করে চেপে রাখলো ছফা। মনে মনে নিজেকে ভ সনা করলো এজন্যে। কিন্তু সুর করে কাউকে কাঁদতে শুনলে নিজের হাসি চেপে রাখতে পারে না। শৈশব থেকেই এটা হয়ে আসছে। নিকটজন হারিয়ে মানুষজন যখন সুর করে বিলাপ করতে শুরু করে ছফার তখন বড় হাসি পায়। সে জানে এটা নির্মম, অসভ্যতা। পৈশাচিকও বটে।

“কতো কইতাম, আদারে-পাদারে হাগামুতা কইরো না...হুনলা না! আমার কথা তুমি হুনলা না?”

মৃত্যুর মতো করুণ ব্যাপারের সাথে হাগা-মুতার কী সম্পর্ক ভেবে পেলো সে। ভেতরে হাসির দমক আরো বেড়ে গেলো। দ্রুত পা চালিয়ে বিলাপের সুর আর বাণী থেকে নিজেকে

দূরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলো কিন্তু আতর আলীর হাটা এখন গদাইলস্করি হয়ে গেছে। সে হাগা-মুতার সাথে মৃত্যুর সংযোগ নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলো।

"তমিজের বাপ এখলাস মিয়া গুয়ের গাড়ায় পইড়া মরছে মনে লয়।"

ছফা কিছু বললো না।

"..বুইড়া আবার পায়খানায় কাম সারতে ডরায়...খোলা জায়গা না হইলে বেটার হাগা বাইর অয় না। এইটা নিয়া বউ-বাচ্চারা খোটা দিতো," একমনে বলে যেতে লাগলো আতর।

ছফা বুঝতে পারলো তমিজের বাপের এমন আচরণ করার কারণটা কি। অনেকেই ক্লয়স্ট্রোফোবিয়ায় আক্রান্ত হয়। আবদ্ধ কোনো জায়গায় বেশিক্ষণ থাকতে পারে না, দম বন্ধ হয়ে আসে, এক ধরণের ভীতি জেঁকে ধরে। গ্রামের মানুষ এসব জটিল বিষয় বোঝে না। তারা মনে করে এগুলো নিছক কোনো বাতিক।

"সারাজীবন খোলা জায়গায় আর গাছের নীচে কাম সারতো...অভ্যাস হইয়া গেছিলো আর কি।"

ছফা এই প্রসঙ্গটা পাল্টাতে চাইলো। "আচ্ছা, ঐ মহিলা...মানে মুশকান জুবেরি কি জমিদার বাড়িতে একাই থাকে?"

"না। একটা মাইয়া থাকে লগে।"

"আর কেউ না?" অবাক হলো সে। এরকম গ্রামে বিরাট একটি বাড়িতে দু-দুটো মেয়েমানুষ একা থাকে!

"বোবা ইয়াকুবও থাকে...পোলাটা দারোয়ানের কাম করে।"

"এই তিনজন? আর কেউ না?"

“জমিদার বাড়িতে এরাই থাকে, তয় বাড়ির সীমানার বাইরে চাইরদিকে বোসবাবুর অনেক জায়গাজমি আছে…ওইহানে কিছু লোকজন থাকে।”

“ওরা কারা?”

“এই ধরেন গরুর খামারের লোকজন, মাছ চাষ দেখাশোনা করে যারা..শাক-সবজি… আরো কতো কি যে করে বেটি তার কুনো ঠিক নাই

ছফা বুঝতে পারলো মহিলা জায়গা-জমিগুলোর ভালোমতোই সদ্ব্যবহার করছে।

“বেটির কইলাম সাহস আছে,” বললো আতর। চলতে চলতেই পেছনে ফিরে তাকালো সে। “সাহস না থাকলে এমুন জায়গায় আইসা নাড় গাঁড়বার পারে, কন?”

“মহিলার সাথে যে মেয়েটা থাকে সে কে? কোনো আত্মীয়?”

“আরে, না। ওই মাইয়াটাও কাম করে…ফয়-ফরমাশ খাটে আর কি।”

একটু চুপ থেকে বললো ছফা, “ঐ জমিদার বাড়িটা কি অনেক বড়?”

“ম্যালা বড়…আগের দিনের জমিদার বিরাট বাড়ি, জোড়া পুকুর…একটা পুরুষগো লাইগা…আরেকটা মাইয়া মানুষের…” মুচকি হাসলো আতর, “বিরাট বাড়ি, বাগান, পুকুর না থাকলে কি জমিদার কওন যায়?” আবারো পেছন ফিরে তাকালো। “বাড়িটা এটু দেখবেন নাকি?”

“না। আজ থাক কাল যাবো। আজ অনেক রাত হয়ে গেছে।”

“ঐ বাড়ির সামনে দিয়াই কিন্তু যাইতে হইব…ইচ্ছা করলে দুর থেইকা একটু দেইখা নিতে পারেন?”

দ্বিধায় পড়ে গেলো ছফা। "যাওয়ার পথেই পড়বে ওটা?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো আতর। "আমরা তো কবরস্তান দিয়া শর্টকাট না মাইরা ঘুরপথে যাইতাছি..ঐ বাড়ির সামনে দিয়াই কইলাম যাইতে হইবো।"

"ঠিক আছে...তাহলে চলেন।"

পাঁচ মিনিট পর আতর দু-পাশে ঘন ঝোপের মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া একটি রাস্তা ধরে এগোতে লাগলো।

"এইখান থেইকা বাড়ির সীমানা শুরু.. শ্যাষ হইছে এক্কেবারে নামায় গিয়া..বিরাট বড় বাড়ি...দৌড়ায়াও শ্যাষ করবার পারবেন না।"

ছফা জানে নীচু ভূমিকে অনেক জায়গায় 'নামা' বলে। আতরের পাশপাশি হাটছে সে। দু-হা কিছুই বললো না। চারপাশে তাকিয়ে দেখছে। একটা মোড় নিতেই দেখা গেলো একটু দূরে বিশাল একটি গ্রিলের দরজা। পুরনো আমলে বড়-বড় বাড়িতে এরকম সদর-দরজা দেখা যেতো। তবে গ্রিলের পেছনে পাতলা টিন লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। সম্ভবত এটা করেছে। মুশকান জুবেরি। ফলে গ্রিলের ফাঁক দিয়ে ভেতরের কিছু দেখা যায় না এখন।

প্রায় আট-নয় ফিটের মতো উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা মূল বাড়িটা। দেয়ালগুলোর পেছনে বড় বড় গাছ আর ফাঁকে ফাঁকে দেয়াল ডিঙিয়ে বাইরে চলে আসা লম্বা ঝোঁপগুলো যেনো আরো বেশি আড়াল করে দিয়েছে অন্দরমহলটাকে। হঠাৎ মাটির দিকে চোখ যেতেই থমকে দাঁড়ালো সে।

আতরও দাঁড়িয়ে পড়লো। "আর সামনে যাইবেন না?"

ছফা বুঝতে পারলো না কী বলবে। "না...মানে..." তার চোখ এখনও মাটির দিকে।

"কী দেখতাছেন?" আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করলো ইনফর্মার।

"মহিলার কি গাড়ি আছে?"

"হ। জমিদারের বৌ..গাড়ি না থাকলে চলে?"

একটু থেমে আবার বললো, "দুইটা গাড়ি আছে...একটা মালপত্তর টানে, আরেকটা বেটি নিজে চালায়। ক্যান, কি হইছে?"

"না। কিছু না।" মুখ তুলে তাকালো ছফা। মেইনগেট থেকে রেললাইনের মতো সমান্তরাল দুটো মেঠোপথ চলে গেছে তাদের পেছন পর্যন্ত। সে কিছু বলতে যাবে তার আগেই পেছন থেকে একটা শব্দ শুনতে পেলো। ফিরে তাকালো তারা। আবছা অন্ধকারে বোঝা গেলো না কিন্তু কেউ একজন যে তাদের দিকে হেঁটে আসছে সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ। নেই। যে আসছে তার পদক্ষেপ বেশ ভারি।

আতরের একটা হাত টান দিয়ে পাশের ঝোপের আড়ালে চলে গেলো

"কি হইছে?" চাপাকণ্ঠে বললো বিস্মিত ইনফর্মার।

"এই লোকটা নিশ্চয় জমিদার বাড়িতে যাচ্ছে।"

"হ। তো কি হইছে?"

"আমি চাই না সে আমাদের এখানে দেখুক।"

আতর আর কিছু বললো না, চুপ মেরে রইলো।

একটু পরই দেখতে পেলো বলশালী এক যুবক হেলেদুলে আসছে। তাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় যুবকের আবছা অবয়ব দেখতে পেলো তারা।

“এই পোলা এইখানে কী করতে আইছে!” যুবকের অপসৃয়মান অবয়বের দিকে তাকিয়ে থেকে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠলো আতর।

“ছেলেটা কে?”

“ফালু!”

“ফালু?” বুঝতে না পেরে বললো ছফা।

“আমাগো কবরস্তানে গোর খুদে।”

অ্যাডভান্স কবর খুরে রাখে যে! “ও এখানে কী করতে এসেছে?” ছফাও যারপরনাই বিস্মিত হলো এবার।

.

অধ্যায় ৮

ঝড় উঠেছে তপ্ত হাওয়ায় হাওয়ায়।
মনকে সুদূর শূন্যে ধাওয়ায়
অবগুণ্ঠন যায় যে উড়ে
চক্ষে আমার তৃষ্ণা…

গুণগুণ করে গাইতে গাইতে দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দিলো মুশকান।

ঘরটা প্রায় অন্ধকার, তাই আলো জ্বালিয়ে দিলো, সেই আলো বড় টিমে। ঘরের চারপাশে দেয়াল জুড়ে কতোগুলো ক্যাবিনেট। কিছু ক্যাবিনেটের কপাটে কাঁচ লাগানো, ভেতরে কি আছে সবই দেখা যায়, তবে বাকিগুলোর ভেতরের জিনিস দেখার কোনো উপায় নেই।

এখানে বড় বড় জারে অদভুত সব জিনিস সংরক্ষিত করা আছে। দেখলে যে কেউ ভাববে এখানে বুঝি প্রাণীদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংরক্ষণ করা হয়।

ঘরের এককোণে চমৎকার একটি কিচেন টেবিল। মার্বেল পাথরের উপরিভাগটা একদম পরিস্কার। কতোগুলো কিচেন নাইফ আর বিভিন্ন ধরণের কিচেন-সরঞ্জাম আছে টেবিলের পাশেই। বড় বড় বেশ কয়েকটি হাড়ি-পাতিল আর পাত্রও দেখা যাচ্ছে। কিচেন টেবিলের কাছেই রয়েছে দুটো। গ্যাস-বনার। একটি আদর্শ রান্নাঘর এটি। বেশ আধুনিকও বটে।

এটাই মুশকানের ল্যাবরেটরি, এখানেই সে খাবার নিয়ে গবেষণা করে। নিত্যনতুন খাবার আর স্বাদ তৈরি করার কারখানা। দিন এবং রাতের অনেকটা সময় এই ল্যাবরেটরিতেই কাটিয়ে দেয় সে। এখানেই সীমিত পরিসরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। কোনটার সাথে কোটা মেশাবে, কতটুকু মেশাবে, আর কতোক্ষণ ধরে মেশাবে সবই পরীক্ষা করে। ঘরে রান্না করার সব ধরণের সরঞ্জাম থাকলেও একটি পরিচিত জিনিস নেই-প্রেসার কুকার।

মুশকান কখনও প্রেসার কুকার ব্যবহার করে না। প্রেসার কুকারে করা খাবার কখনও মুখেও দেয় না সে। এই জিনিসটা তার সুক্ষম জিভের জন্য বিষ! রান্নার মতো একটি শিল্পকে প্রেসার কুকার সত্যি সত্যি খুব চাপের মধ্যে ফেলে দিয়ে চিড়ে-চ্যাপ্টা করে দেয়। এটা হলো কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানোর মতো ব্যাপার। ফলাফল যা হবার তা-ই। স্বাভাবিক স্বাদ আর পাওয়া যায় না। ওটা হারিয়ে যায় প্রচণ্ড চাপে পড়ে! মুশকান বুঝতে পারে না মানুষ কেন এই জিনিসটা ব্যবহার করে। রান্না করা যদি এতোই ঝামেলার কাজ মনে করে। তাহলে বাইরে থেকে খাবার কিনে এনে খায় না কেন? চটজলদি খাবার উদর ভরতে পারে, কিন্তু মন ভরাতে পারে না। বাজে রান্না আর বাজে স্বাদের খাবার জিভকে ভারি করে তোলে, জিভের সমস্ত সুক্ষমতাকে ধ্বংস করে দেয়। বিভিন্ন স্বাদের পার্থক্য বুঝতে হলে জিভকে নিরন্তর সুরক্ষা করতে হয়। অবশ্য যারা খাবারকে পেট ভরার জিনিস মনে করে তাদের কথা আলাদা। এই জনপদের ইতিহাস হলো অভাব আর দুর্ভিক্ষের ইতিহাস। এখানে পেট ফুলিয়ে খাওয়াই স্বস্তির ব্যাপার।

কিচেন টেবিলসংলগ্ন সিঙ্কে দু-হাত ভালোমতো ধুয়ে নীচু হয়ে কিচেন টেবিলের নীচ থেকে একটা মাঝারি আকারের পাত্র তুলে আনলো। পাত্র ভর্তি মাংস। সেই সকাল থেকে তেতুল মিশিয়ে রেখে দিয়েছে। সে জানে, মাংসের অনেক ভেতরে ঢুকে পড়েছে তেতুলের রস। মাংস নোনতা, তেতুল টকা নোনতা আর টকের মিশ্রণ কতোটা ভালো হয় সেটা দেখার জন্যই এটা করেছে। মাংসগুলো হাত দিয়ে টিপে দেখলো। বেশ নরম হয়ে উঠেছে। নীচ হয়ে আরেকটা ছোটো পাত্র তুলে নিলো এবার। সবুজ রঙের ঘন তরলে ভরা। পুদিনা পাতার ভর্তা এটি। পাত্রটা উপুড় করে সবটা ঢেলে দিলো মাংসের পাত্রে। এবার টেবিলের নীচ থেকে একটা বোতল নিয়ে মুখটা খুলে লাল টকটকে তরল ঢালতে শুরু করলো। প্রায় আধ বোতল ঢেলে দেবার পর রেখে দিলো ওটা। দু-হাত দিয়ে পাত্রের মাংসগুলো দলাই মলাই করলো কিছুক্ষণ। এরপর পাত্রটা তুলে একটা বার্নারের উপর বসিয়ে সুইচ টিপে আগুন জ্বালিয়ে দিলো। অটো ইগনিশান বার্নার, তাই দেয়াশলাইয়ের দরকার পড়ে না। বার্নারের আগুন একেবারে কমিয়ে ঢিমেতালে করে রাখলো। আস্তে আস্তে উত্তাপ পেয়ে মাংসগুলো ধীরে ধীরে রান্না হবে। দ্রুত করলে এর যে-রকম স্বাদ আশা করছে তা কোনোভাবেই পাওয়া যাবে না। পাত্রটার উপর ঢাকনা দিয়ে ঘরের এককোণে চলে গেলো সে।

অসংখ্য জার থেকে একটা অসচ্ছ জার নামিয়ে আনলো মুশকান, রাখলো কিচেন টেবিলের উপর। এই জারের ভেতরে কি আছে বোঝা যাচ্ছে না। জারের মুখটা খুলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো। চোখেমুখে স্পষ্ট দ্বিধা। আলতো করে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরলো সে। অবশেষে সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে জারটা আবার আগের জায়গায় রেখে দিলো।

ক্যাবিনেটে রাখা এক সাইজের অসংখ্য বোতলের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো সে। এগুলোই তার আসল সিক্রেট। রেসিপি সিক্রেট রাখাটা প্রায় অসম্ভব। তারপরও কাজটা করা যায়। পুরনো ঢাকার এক বাবুর্চির কাছ থেকে সে শিখেছিলো কিভাবে নিজের হাতের জাদু সংরক্ষণ করা যায়। লোকটা যে স্বাদের মোরগপোলাও রান্না করতো সেটা কেউ নকল করতে পারতো না। এর কারণ সে পোলাও রান্না হবার মাঝখানে বিশেষ কিছু মিশিয়ে

দিতো! কি মেশাতে মুশকানকে সে জানিয়েছিলো। খাসির মাথা প্রক্রিয়া করে অল্পকিছু মসল্লার সাহায্যে গরম পানিতে সেদ্ধ করতে করতে এক ধরণের সুপ বানাতো। সাঙ্গোপনে নিজের সাগরেদসহ এবং সবার আলেক্ষ্য সেই সুপ ঢেলে দিতো মোরগপোলাওয়ে। ব্যস, অসাধারণ একটি স্বাদের জন্ম হতো। আইডিয়াটা দারুণ লেগেছিলো মুশকানের। এটাকে সে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে এখন। রবীন্দ্রনাথের রেসিপিগুলোতেও একই কৌশল খাটায় সে।

আয়েশী ভঙ্গিতে বার্নারের কাছে গেলো এবার। পাত্রের ঢাকনা খুলে দেখে নিয়ে চামচ দিয়ে এক টুকরো মাংস মুখে পুরে চেখে দেখলো। ঢাকনাটা আবার পাত্রের উপরে চাপিয়ে দিয়ে বানারের আগুন একদম কমিয়ে দিলো।

ঘরের বাতি নিভিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

*

মানুষজনের পাদ মারার খবরও রাখে যে আতর আলী তার কোনো ধারণাই নেই গোরখোদক ফালু কেন মুশকান জুবেরির বাড়িতে যাচ্ছে।

এই মহিলার সাথে ফালুর সম্পর্কটাই বা কি সেটাও তার অজানা। ছফার কাছে অদ্ভুত ঠেকলো ব্যাপারটা, আর সেটা ইনফর্মারের কাছে একদমই লুকালো না।

"আপনি এখানকার সব খবর রাখলেও আমার মনে হচ্ছে এই মহিলার ব্যাপারে আপনার জানাশোনা একদমই কম।"

আতর আলী গাল চুলকে নিলো একটু। তার অক্ষমতা নিয়ে কথা বলছে সাংবাদিক। এদিকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার মতোও কিছু নেই। কথাটা একদম সত্যি। এই মহিলা সম্পর্কে খুব কমই জানে, কিনতু সে যতোটুকু জানে বাকিরা তাও জানে না। ফিসফাস করে কিছু কথা বলে-দূর থেকে বাঁকাচোখে দেখে জমিদার বাড়ি আর অদভুত রেসটুরেন্টটি-এই

তো। এর বেশি কিছু করার কথা তারা চিন্তাও করতে পারে না। লোকাল এমপিকে যে মহিলা আঁচলে বেঁধে রেখেছে তাকে ঘাটানোর সাহস হবে কার?

"ঐ বেটি এইখানকার না...কইথেকা আইছে তাও কেউ কইবার পারবো না...মানুষের লগে মেশেও না..." নিজের পক্ষে সাফাই গাইলো ইনফর্মার। "...খালি এমপি, ডিসি, এসপির লগে হের খাতির...হেগোরে শাড়ির নীচে রাখে...হের ব্যাপারে নাক গলানোর সাহস এই সুন্দরপুরের কারোর নাই।"

ছফা কিছু না বললো না। তারা এখন জমিদার বাড়ি থেকে একটু দূরে বিরাট একটি বটগাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকে একটা সরু পথ চলে গেছে মেইনরোডের দিকে। এ-পথ দিয়েই মুশকান জুবেরির গাড়ি যাতায়াত করে।

"লোকজন আবার হেরে এটু ডরায়ও।"

আতরের দিকে তাকালো ছফা। "কেন?"

ইনফর্মার গলাটা নীচে নামিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বললো, "ঐ বেটি একটা ডাইনি।"

এর আগেও আতরের মুখ থেকে এ কথাটা শুনেছে সে। "আপনি ঐ মহিলাকে ডাইনি কেন বলেন, একটু খুলে বলেন তো?"

"আপনেরা শহরের মানুষ, আমাগো কথা বিশ্বাস করবেন না। মনে করবেন মুখু মাইনষের গালগপ্প।"

"না, না। আপনি বলেন। আপনার কথা অবশ্যই বিশ্বাস করবো। আপনি তো অন্য সবার মতো নন।"

মনে হলো কথাটা শুনে আতর খুশি হয়েছে। "তাইলে হূনেন, হাসমত চোরা নামের এক পোলা আছে আমাগো গেরামে...হে অনেকদিন আগে রাইতের বেলায় বেটির বাড়িতে

ঢুকছিলো চুরি করবার মতলবে, কিন্তু ঐ বাড়িতে ঢুইকা সে এমন ডরন ডরাইছে…কী আর কমু?”

“সে ভয় পেয়েছিলো কেন?”

“ও দেখছে, বেটি রাইতের বেলায় ডাইনি হইয়া যায়?”

“তাই নাকি?!” বিস্মিত হলো ছফা।

“আমি কইলাম ওর কথা বিশ্বাস করি নাই..” একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে, “…পরে বুঝলাম, হাসমত মিছা কয় নাই।”

ইনফর্মারের দিকে তাকালো ছফা। লোকটার চোখমুখ খুবই সিরিয়াস। “আপনি পরে কিভাবে বুঝতে পারলেন এটা?” উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলো সে।

আতর আলী কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বললো, “বেটি এইহানে নাড় গাঁড়বার পর থিকাই হের কাম-কাইজ আমার কাছে সুবিধার মনে হইতাছিলো না। একদিন করলাম কি, সাহস কইরা রাইতের বেলায় বেটির বাড়িতে ঢুইকা পড়লাম।”

“কী বলেন? দারোয়ান ছিলো না মেইনগেটে?”

অশ্লীল হাসি দিলো ইনফর্মার। “বোবা তহন লীলা-খেলায় মশগুল!”

ভুরু কুচকে তাকালো নুরে ছফা। “মানে?”

“ঐ বোবা আর বেটির ফুটফরমাশ খাটে যে মাইয়াটা…ওগোর মইদ্যে একটা লাইন আছে, বুঝলেন?” দু-হাতের তর্জনী আঙটার মতো আর্টকে এক চোখ টিপে বললো সে।

মাথা নেড়ে সায় দিলো ছফা। বুঝতে পেরেছে সে। “কিন্তু এই খবর আপনি কিভাবে জানলেন? আর ওইদিন ওরা এসব করছে সেটাই বা বুঝতে পারলেন কিভাবে?”

মুচকি হাসি দিয়ে বলতে শুরু করলো আতর, “আমাগো টাউনে তো একটাই ডিপিনচারি..হাফিজ মিয়া চালায়…আমি একদিন রাইতের বেলা বোবারে হাফিজ মিয়ার দোকান থেইকা ফোকনা কিনতে দেখলাম…”

ফোকনা মানে যে কনডম সেটা বুঝতে পারলো ছফা।

“ আমি তো তাজ্জব…বোবা একটা আবিয়াত্তা পোলা…হে ওইটা দিয়া কী করবো? কার লগে করবো!”

ছফা উদগ্রীব হয়ে রইলো বাকি কথা শোনার জন্য।

“আমি করলাম কি, বোবার পিছন পিছন হাটা দিলাম। বোবায় জমিদার বাড়িতে গিয়া ঢুকলো কিন্তু গেট লাগাইয়া সোজা বাড়ির ভিতরে যে ঢুকছে তো ঢুকছেই, গেটে আহনের আর নাম নাই…”

“আপনি বাইরে থেকে এটা কিভাবে দেখলেন? গেটের গ্রিলগুলো তো প্লেইন-শিট দিয়ে বন্ধ করে দেয়া?”

“আরে, তহন গেটটা লোহার শিকের আছিলো..বাইরে থেইকা সব দেখা যাইতো…পরে বেটি ঢাইকা দিছে।”

“ও।” ছফা আর কিছু বললো না।

“বোবারে গেটে না দেইখা আমি দেয়াল টপকাইয়া ঢুইকা পড়লাম ঐ বাড়িতে।”

“ ছফা প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকালো ইনফর্মারের দিকে। “বলেন কি! তারপর?”

“জানালা দিয়া অনেক ট্রাই করছিলাম কিন্তু কিছু দেখবার পারলাম না। বাত্তি জ্বালানো আছিলো না, সব দরজাও বন্ধ…খালি দোতলার একটা ঘরে বাত্তি জ্বলতাছে…তহন আমি দালানের লগে যে বড় আমগাছটা আছে ঐটার উপরে উইঠা গেলাম…” একটু থামলো সে। “আমি মনে করছিলাম বোবার লগে মনে হয় ঐ বেটির ইটিস-পিটিস আছে।”

ছফা কিছু বললো না। ইনফর্মারের জায়গা সে হলেও এরকমই সন্দেহ করতো।

“তয় গাছে উঠার পর চমকায়া গেলাম…দেহি ঐ বেটি দোতলার বারিন্দায় বইসা চেয়ারে দোল খাইতাছে আর গান শুনতাছে…হাতে একটা গেলাস…পরথমে বুঝি নাই…পরে ঠাওর কইরা দেখি রক্ত!”

“কি?”

মাথা নেড়ে সায় দিলো ইনফর্মার। “গেলাসে কইরা রক্ত খাইতাছে!”

“কী বলেন?” ছফা অবিশ্বাসে বলে উঠলো। “রক্ত খাচ্ছে?!”

ঢোক গিললো আতর। “আপনে বিশ্বাস করবেন না, এরপর কি হইলো।”

“কি হলো?”

“বেটি ঘাড় ঘুরাইয়া আমার দিকে তাকাইলো! কেমতে জানি বুইঝা গেছিলো আমি গাছের উপরে থেইকা দেখতাছি।”

“মহিলা আপনাকে দেখে ফেললো?”

মাথা নেড়ে সায় দিলো ইনফর্মার। “হ।”

“তারপর কি করলো?”

“বেটি কিছুই করলো না…খালি আমার দিকে চায়া রইলো, ডাইনির মতো মিচকা হাইসা মুখ ঘুরায়া চেয়ারে দোল খাইতে খাইতে রক্ত খাইতে লাগলো আবার! যে কিছু হয় নাই!”

“কী বলেন? আপনাকে দেখেও উনি কিছুই করলেন না? চিৎকার চেঁচামেচি করলেন না?” ছফা অবিশ্বাসে বলে উঠলো। “আজব তো!”

“আরে আজবের কী দেখছেন! আসল কথা তো এহনও কই-ই নাই। আমার জায়গায় অন্য কেউ হইলে গাছ থেইকা পইড়া যাইতো ঐদিন…পাতলা পায়খানা শুরু কইরা দিতো!”

ভুরু কুচকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো ছফা।

“বাপের জন্যেও আমি এমন কিছু দেহি নাই!”

“কী দেখেছিলেন আপনি?”

“ঐ বেটি যহন আমার দিকে তাকাইছে তহন তার চক্ষু দুইটা আগুনের মতো জ্বলতাছিলো! আন্ধারে বিলাই আর শিয়ালের চোখ যিমুন জ্বলে তার চায়াও বেশি! কুনো মানুষের চক্ষু এমন কইরা জ্বলে, ক?”

ইনফর্মারের দিকে অবিশ্বাসে তাকালো ছফা। “মহিলার চোখ দুটো জ্বলছিলো?”

.

অধ্যায় ৯

সুরত আলীর হোটেলে ফিরে জামা-কাপড় না ছেড়েই মোবাইলফোনটা নিয়ে বিছানার উপরে চুপচাপ বসে আছে ছফা। ব্যাটারির চার্জ একদম শেষ। চার্জে দিয়ে জরুরি একটা

ফোন করার পর থেকেই এভাবে বসে আছে সে। কিছু অব্যাখ্যাত প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে তার মাথায়। তারচেয়েও বড় কথা সীমাহীন এক কৌতূহল তাকে অস্থির করে তুলেছে।

একজন গোরখোদক কেন রাতের বেলায় মুশকান জুবেরির বাড়িতে যাবে? মহিলার সাথে ঐ গোরখোদকের কি সম্পর্ক? আর আতর আলী যে ভয়ানক গল্পটা বললো সেটাই বা কতোটুকু সত্যি? যেখানে শিক্ষিত লোকজনই ভূতপ্রেতের মতো কুসংস্কারে বিশ্বাস করে, অতিপ্রাকৃত গালগল্পে। আস্থা রাখে সেখানে এই গণ্ডগ্রামের অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত লোকজন কী দেখে কী বলছে কে জানে! কিন্তু আতরের কথাগুলো তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারছে না। লোকটা নিরীহ কোনো গ্রামবাসী নয়, খুবই ধুরন্ধর আর টাউট টাইপের। পুলিশের সাথে তার নিত্য ওঠা-বসা। এখানকার মাদকব্যবসা থেকে শুরু করে সব ধরণের অপকর্মের সাথে জড়িত। ভয়-ডরও খুব একটা নেই।

একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিত, মুশকান জুবেরি রহস্যময়ী একটি চরিত্র। এ পর্যন্ত তার সম্পর্কে খুব সামান্যই জানতে পেরেছে, তাতেই মনে হচ্ছে মহিলার অনেক গোমড় রয়েছে। আর সেগুলো সুকৌশলে, অত্যন্ত যত্নের সাথে লুকিয়ে রাখে সে। রবীন্দ্রনাথে মহিলা যেভাবে তার দিকে তাকিয়েছিলো সেটা মনে করলো আবার সেই দৃষ্টি মোটেও স্বাভাবিক ছিলো না। চাহনিতে কিছু একটা ছিলো। অব্যক্ত, অব্যাখ্যাত কিছু। যেনো সব কিছু টের পেয়ে গেছে!

তার স্থির বিশ্বাস, মুশকান জুবেরির সমস্ত গোমড় লুকিয়ে আছে দুটো জায়গায়-যেখান থেকে এসেছে আর এই সুন্দরপুরে যেখানে সে থাকে, ঐ জমিদার বাড়িতে। বাড়িটা দূর্গের মতোই। বিশ্বস্ত লোকজন ছাড়া কেউ ঢুকতে পারে না ওখানে। তার ধারণা রবীন্দ্রনাথে তেমন কোনো রহস্য নেই, তবে ওটার অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে হয়তো। প্রতিদিন অসংখ্য লোকজন আসে খাওয়া-দাওয়া করতে-এমন জায়গায় আর যা-ই হোক রহস্য থাকবে না। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত মহিলার একটি অ্যালিবাই! কিংবা নিছক পাগলামি।

ছফা নিশ্চিত, মুশকান ঢাকা থেকে এসেছে। এর পক্ষে বেশ যুক্তিও আছে তার কাছে। প্রথমত, মি. জুবেরি দীর্ঘদিন ঢাকার একটি হাসপাতালে ছিলেন। অন্তত মহিলার দাবিমতো

তাদের বিয়ে হবার সময়কালে। মুশকানের সাথে যদি জুবেরির আদৌ দেখা হয়ে থাকে-রমাকান্তকামারের মতো ছফারও এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে-তাহলে সেটা ঢাকাতেই। হয়েছে। দ্বিতীয়ত, মুশকানের সাথে ক্ষমতাসীন এমপির খুব ভালো সম্পর্ক। আর কে না জানে, ওরকম হোমরাচোমরারা যে যেখানেই থাকুক, তারা ঢাকাতেই পড়ে থাকে। এই দেশটা ঢাকাকেন্দ্রীক। ঐ মহিলা যদি ঢাকা থেকে এসে থাকে তাহলে খুব দ্রুতই অনেক কিছু জানা যাবে।

আরেকটা ব্যাপার নিয়ে চিন্তিত, সে এখানে কেন এসেছে, কি করতে এসেছে সেটা ঐ মহিলার পক্ষে জানা অসম্ভব। তার আচরণে এমন বাড়াবাড়ি কিছু ছিলো না যে মহিলা সন্দেহ করবে। এখন পর্যন্ত এক আতর আলী ছাড়া এখানকার কারো সাথে সে মেশেও নি। যার-তার কাছ থেকে মহিলার ব্যাপারে জানতেও চায় নি। এখানে আসার পর থেকে প্রতিটি পদক্ষেপ খুবই সতর্কতার সাথে ফেলেছে। রমাকান্তকামার তার ব্যাপারে মহিলাকে কিছু বলবে সে সম্ভাবনাও ক্ষীণ। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে মুশকানের সাথে মাস্টারের সম্পর্ক নেই। তারপরও মহিলা কিছু একটা টের পেয়ে গেছে।

স্বজ্ঞা?

নাকি প্রজ্ঞা?

মাথা দোলালো ছফা। এসবের কিছুই না। এটা হলো অপরাধীর সেই চিরায়ত আচরণ-যে ভালো করেই জানে সে কি করেছে। সুতরাং অন্যদের চেয়ে বেশিই সতর্ক থাকবে সে।

একটু আগে ইনফর্মার আতরকে যখন সে বললো হোটেলে ফিরে যাবে তখন লোকটা জানালো কী একটা কাজে তাকে পাশের গ্রামে যেতে হবে। কথাটা শুনে খুশিই হয়েছিলো ছফা। ইনফর্মারকে দুশ' টাকা ধরিয়ে দিয়ে বিদায় করতে চেয়েছিলো কিন্তু পারে নি। টাকা পেয়ে বিগলিত হয়ে একটা খালি ভ্যান-রিক্সায় তাকে তুলে দিয়ে সে নিজেও উঠে বসে, হোটেলের কাছেই নাকি সে যাবে। ফলে বাধ্য হয়ে তাকে হোটেলে ফিরে আসতে হয়।

হাতঘড়িতে সময় দেখে নিলো। এখনও খুব বেশি সময় পার হয় নি। বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালো সে। সুতীব্র কৌতূহল তাকে ঘরে আটকে রাখতে পারলো না। চার্জার থেকে মোবাইলফোনটা খুলে পকেটে ভরে বেরিয়ে গেলো সে।

*

আতর আলী থানায় যায় নি। যাবার কোনো কারণও নেই। তারপরও থানায় যাবার ভান করেছে সাংবাদিককে বুঝিয়ে দেবার জন্য যে, ইনফর্মার হিসেবে এখনও বহাল তবিয়েতে আছে সে। আদতে বেশ কিছুদিন ধরে থানার ত্রি সীমানায়ও যায় না। থানা থেকে কবে যে ডাক পড়বে তার কোনো ঠিক নেই।

কয়েক দিন আগে একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলো সে। ভুলটা অবশ্য তার একার ছিলো না কিন্তু শাস্তিটা তাকে একাই পোহাতে হচ্ছে। কাক কাকের মাংস খায় না, পুলিশও পুলিশের দোষ খুঁজে পায় নি। পেলেও শাস্তি দেবার বেলায় ভয়ানক কৃপনতা দেখিয়েছে।

সুন্দরপুর থানার এসআই আনোয়ারের সাথে বেশ খাতির তার। দু-জুনে মিলে দীর্ঘদিন ধরেই বাণিজ্য করে আসছিলো। টাউন আর গ্রামের নিরীহ অথচ সচ্ছল পরিবারের সন্তানদের ধরে এনে টাকার বিনিময়ে থানা থেকে ছাড়িয়ে দেবার ধান্দাটা চলছিলো নির্বিঘ্নেই। প্রতিরাতে এসআই আনোয়ার হাজার-হাজার টাকা কামাচ্ছিলো আর তা থেকে সামান্য ভাগ পাচ্ছিলো। আতর। এমনও রাত গেছে, তিন-তিনটি আদম ধরে এনেছে আর সবগুলোই আতরের ইনফর্মেশনে। সে-ই খবর দিয়েছিলো, লুঙ্গি-ব্যবসা করে পুবপাড়ার আলতাফ মিয়া বেশ ভালো টাকা কামাচ্ছে; এখানে সেখানে জায়গা-জমিও কিনছে; তার কলেজ পড়ুয়া ছেলে টুকটাক গাঁজা-ফেন্সিডিলও ধরেছে খারাপ ছেলেপেলের পাল্লায় পড়ে; সুতরাং মুরগি হিসেবে ছেলেটা বেশ ভালো ডিমই দেবে!

কথামতোই এসআই আনোয়ার, যাকে তার স্বভাব-চরিত্রের জন্যে স্বগোত্রীয় পুলিশ আর পরিচিতজনেরা আড়ালে-আবডালে জানোয়ার বলে ডাকে, আলতাফ মিয়ার বখে যাওয়া

ছেলেটাকে ধরে আনলো থানায়। কপাল খারাপ, ঐসময় ছেলেটার সাথে নিষিদ্ধ মাদকজাতীয় কিছু ছিলো না। বাড়ি থেকে একটু দূরে, প্রাইমারি স্কুলের মাঠে বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডা মারছিলো সে। তাতে অবশ্য সমস্যা হয় নি। কেউ নিষিদ্ধ জিনিস সঙ্গে নিয়ে ঘোরাফেরা করার আগপর্যন্ত তো সে অপেক্ষা করতে পারে না। আইনের হাত অনেক লম্বা, কিন্তু জানোয়ারের হাত শুধু লম্বা নয়, অনেক বেশি নোংরাও। সেই নোংরা হাত যার উপরে পড়বে তার পকেটে গাঁজা, ফেন্সিডিল, ইয়াবা আপনা আপনিই চলে আসবে।

ছেলেটাকে থানায় ধরে এনে একটা ফেন্সিডিল আর কিছু গাঁজার পুরিয়া রিকভারি হিসেবে দেখিয়ে দিলো এসআই। ব্যস, কেস খাড়া। আসামীর কাছ থেকে নিষিদ্ধ মাদক উদ্ধার করা হয়েছে। কমপক্ষে তিন-চার। বছরের জেল তো হবেই। ছেলের বাপের কাছে আতর যখন খবরটা দ্রুত পৌঁছে দিলো তখন বেচারা আলতাফ মিয়ার জান বের হবার জোগার। লুঙ্গি ব্যবসায়ি লুঙ্গির গিট দিতে দিতে উদ্বেগের চোটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে আতরকে সঙ্গে নিয়ে। স্বভাবতই আতরের কাছে চটজলদি সমাধান চাইলো ছেলের বাপ। সেও মহা উৎসাহে বাতলে দিলো সহজ উপায় : ঐ এসআই আনোয়ারকে নগদ এক লাখ টাকা দিয়ে দিলেই কেস ডিসমিস হয়ে যাবে। রাতের মধ্যেই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসবে, পরিবারের সবার সঙ্গে রাতের খাবার খেয়ে ঘুমাতে পারবে তার কাননের একমাত্র নন্দন!

আলতাফ মিয়া একটু গাই-গুই করে রেটটা কমাতে অনুরোধ করে তাকে। সে তো গ্রামেরই ছেলে। তার কি উচিত না একই গ্রামের মানুষকে একটু উপকার করা। সুযোগ বুঝে আতরও দান মেরে দেয়। নগদ পাঁচ হাজার টাকা বাগিয়ে এক লাখকে পঞ্চাশে নামিয়ে আনে। ওদিকে থানায় গিয়ে এসআই আনোয়ারকে বোঝাতে সক্ষম হয় বহুকষ্টে পঞ্চাশে রাজি করিয়েছে, এরচেয়ে বেশি চাইলে ছেলের বাপ বিগড়ে যেতে পারে। পঞ্চাশেই খালাস করে দেয়া উচিত। আনোয়ার জানোয়ারের মতো দৃষ্টি হেনে সন্দেহ করলেও রাজি হয়ে যায়।

যাইহোক, রাত সাড়ে দশটার মধ্যে থানার ভেতরে একরুমে ব্যাপারটা ফয়সালা করতে বসে আলতাফ মিয়া আর এসআই আনোয়ার। আতরও সেখানে উপস্থিত ছিলো, কিন্তু

সব ওলট-পালট হয়ে যায় পঞ্চাশ হাজার টাকা লেনদেন করতে গিয়ে। আচমকা সেখানে হাজির হয় স্থানীয় এমপির এক ভাতিজা। ছেলেটা বয়সের চেয়ে বেশি সেয়ানা। এমপি-চাচার পাওয়ারের গরম তাকে অকালে পাকিয়ে ফেলেছে। তারা জানতে পারে, আলতাফ মিয়ার বখে যাওয়া ছেলের জানেদোস্ত এই পাকনা ছেলেটি!

কপাল খারাপ হলে যা হয়, ঐদিন রাতেই কী একটা জরুরি কাজে এমপিসাহেব সুন্দরপুরে চলে এসেছিলো। ক্ষমতাধর চাচাকে কাছে পেয়ে ভাতিজার আধ-কেজির কলিজা বেড়ে সোয়া-কেজি হয়ে যায়। থানায় ঢুকে হাতেনাতে ধরে ফেলে পঞ্চাশ হাজার টাকার লেনদেন। আলতাফ মিয়ার ছেলের তার মতো একজন বন্ধু থাকতে সামান্য এক এসআইকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে ম্যানেজ করতে যাবে কেন? তাহলে আর ক্ষমতাধর এমপির ভাতিজা হয়ে কী লাভ হলো!

তা তো বটেই। আলতাফ মিয়ার হাসি সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায় তখন। যেনো পুচকে এক ত্রাণকর্তা নাজেল হয়েছে তার ছেলেকে উদ্ধার করতে। মুহূর্তে পুরো ঘটনা তালগোল পাকিয়ে গেলো। সুন্দরপুরের ওসি এসব কিছুই জানতো না। সব শুনে সেও ক্ষেপে আগুন। তাকে না জানিয়ে, ভাগ না দিয়ে দিনের পর দিন এসআই না-জানি কতো মুরগি ধরে এনে ‘ডিম খেয়েছে!

পঞ্চাশ হাজার তো গেলোই এমনকি আতরকেও কিছুক্ষণ আগে বাগিয়ে নেয়া পাঁচ হাজার টাকা হাতজোড় করে ফিরিয়ে দিতে হলো। ওসির হাতে তিন-চারটা চরথাপ্পড় আর এমপির ভাতিজার থ্রেট’ ছাড়াও অশ্রাব্য গালিগালাজ উপরি হিসেবে জুটে গেলো তার কপালে।

আতর ভেবেছিলো কয়েকদিনের মধ্যে এসআই আনোয়ার বদলি হয়ে যাবে উচ্চারণ করতে কষ্টকর খাগড়াছড়ি কিংবা রাঙ্গামাটির কোনো অখ্যাত থানায়। কিন্তু তা হয় নি। তবে ঐদিনের পর থেকে আতরের জন্য সুন্দরপুর। থানা কম্লেক্সে ঢোকাটা নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

ওসির কাছ থেকে পুনরায় ডাক না পেলে তার পক্ষে থানায় ঢোকা সম্ভব হবে না। এসআই আনোয়ার অবশ্য তাকে আশ্বাস দিয়েছে, কিছুদিন পর সব ঠিক হয়ে যাবে।

সুতরাং থানার কথা বললেও সাংবাদিককে হোটেলে নামিয়েই ভ্যানটা নিয়ে সে সোজা চলে যায় একরামের ডেরায়। দিন দিন তার গাঁজার ব্যবসা ফুলে-ফেঁপে উঠছে। প্রতিদিন তার কাছ থেকে একশ টাকা আর দুটো গাঁজার স্টিক নজরানা হিসেবে নেয়। সে যে থানায় ঢুকতে পারে না, ওসির কাছে। অপদস্থ হয়েছে এসব কথা যদি একরাম জানতে পারে তাহলে দু-পয়সাও দেবে না। আতরের আশংকা, খুব জলদি থানা থেকে ডাক না পেলে খবরটা চাউর হতে আর বেশি সময় নেবে না। যাইহোক, একরামের ডেরা থেকে বখরা আর দুটো স্টিক নিয়ে রওনা দেয় বড় কবরস্তানের দিকে।

এখন কবরস্তান থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে গাঁজার স্টিকে জোরে জোরে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে সে। এর আগে ফালু পোলাটার দিকে তার নজর খুব একটা পড়ে নি। একজন গোরখোদকের ব্যাপারে নাক গলাতে যাবে কে? মানুষজন কবরস্তান আর গোরখোদক পারতপক্ষে এড়িয়েই চলে। ফালু কি করে, কোথায় যায়, কিভাবে থাকে সে-সব নিয়ে কোনো আজাইরা আর ভাদাইমা লোকও মাথা ঘামাবে না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে পোলাটার দিকে নজর দেয়া দরকার ছিলো। তার অ্যাডভান্স কবর খোদা-খুদির ব্যাপারটা আমলেই নেয় নি এতোদিন। এখন তো দেখতে পাচ্ছে ঐ ডাইনির সাথে তলে তলে তার দারুণ খাতির! নিশ্চয় কোনো ব্যাপার আছে ওদের মধ্যে। আর এটা তাকে জানতেই হবে। সুন্দরপুরে এতোবড় ঘটনা ঘটবে আর আতর কিছু জানতে পারবে না তা তো হয় না।

শেষ কটা টান দিয়ে গাঁজার স্টিকটা মাটিতে ফেলে কবরস্তানের দিকে এগিয়ে গেলো সে। সাবধানে ছোটো ছোটো টিবির মতো কবরগুলো এড়িয়ে চলে গেলো ফালুর ঝুপড়ি ঘরের সামনে। কবরস্তানের একমাথায় বড়সড় দুটো কাঁঠাল গাছের পাশে ওটা অবস্থিত। ভেতরে কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। বেড়ার ফাঁকফোকর দিয়ে ঘরের ভেতরে উঁকি মারলো।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। দরজাটা ধাক্কা দিতেই দেখলো ওটা ভেতর থেকে বন্ধ করা নেই। বাইরে দরজার কয়ড়ার সাথে ছোটো একটা টিপ-তালা ঝুলছে। নিশ্চিত হলো ফালু ঘরে নেই।

ছোটো-বড় কবরগুলো এড়িয়ে সে চলে গেলে কিছুক্ষণ আগে যেখানে সদ্য খোরা এক কবরে নুরে ছফা নামের সাংবাদিকটি পড়ে গেছিলো। আকাশের চাঁদ দক্ষিণ-পশ্চিমে হেলে পড়লেও বেশ ভালো আলো ছড়াচ্ছে, সেই আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলো দৃশ্যটি।

সদ্য খোরা কবরটি নেই।

.

অধ্যায় ১০

অপূর্ণ চাঁদ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে। রাত এগারোটাই সুন্দরপুরের জন্য গভীর রাত। চারদিক নেমে এসেছে সুনশান নীরবতা, সেইসাথে ভারি হয়ে আসছে কুয়াশার চাদর। চারপাশ ঘোলাটে। ঠাণ্ডা বাতাস হাঁড়ে কাঁপন না ধরালেও গায়ে এসে লাগছে বেশ।

সাইকেলটা থামিয়ে জ্যাকেটের বোতামগুলো লাগিয়ে নিলো ছফা। হোটেল রুম থেকে বের হবার পর পথে কোনো রিক্সা না পেয়ে ম্যানেজারের বাই-সাইকেলটা ধার নিয়েছে। একটা কানটুপিও পরেছে সে। তার কালো জিন্স-প্যান্ট আর মরচেপড়া রঙের গ্যাবাডিনের জ্যাকেট এরকম রাতের জন্য যে নিখুঁত ক্যামোফ্লেজ সৃষ্টি করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিনতু তার কোনো ধারণাই নেই, রাতের এমন সময়েও একটু দূর থেকে একজন মানুষ ঠিকই তাকে দেখে চিনতে পেরেছে।

আজ অনেকদিন পর সাইকেল চালিয়ে মাইলখানেক পথ পাড়ি দিতেই পা দুটো আড়ষ্ট হয়ে গেলো। স্কুল-কলেজের পুরোটা সময়েই সাইকেল চালাতে সে। এমনকি তিন বছর আগে যখন টের পেলো ফিটনেস আর আগের মতো নেই তখন আবারো সাইকেল চালাতে

শুরু করে। তবে তার এই স্বাস্থ্য সচেতনতার জোশ ছিলো মাত্র দু-সপ্তাহ। সকালের আরামের ঘুম হারাম করার মতো স্বাস্থ্য-সচেতন মানুষ সে কখনওই ছিলো না।

রবীন্দ্রনাথের সামনে দিয়ে যাবার সময় দেখতে পেলো রেস্তোরাঁটি বন্ধ হয়ে গেছে। জ্বলজ্বলে সাইনে অদভুত নামটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে যাচ্ছে এখনও। ওটা অতিক্রম করে আরেকটু সামনে এগিয়ে আবারো থামলো। সে নিশ্চিত, সামনের ডান দিক দিয়ে যে সরু পথটি চলে গেছে গ্রামের ভেতরে, এটা দিয়েই জমিদার বাড়িতে যাওয়া যাবে। প্যাডেল চালিয়ে সে-পথ ধরেই এগোতে লাগলো। বেশ ধীরে ধীরে প্যাডেল মারছে, সে চাইছে না তেমন কোনো শব্দ হোক কিন্তু কাঁচামাটির পথটি বড় এবড়োখেবড়ো, বার বার সাইকেল ঝাঁকি খাচ্ছে আর আপনা-আপনিই টুং-টাং করে বেজে উঠছে বেল। ডানহাতটা এমনভাবে হ্যান্ডেলের উপর রাখলো যেনো বেলের উপরে আঙুলের স্পর্শ লাগে, এর ফলে ঐ টুং-টাং শব্দটা বন্ধ হয়ে গেলো।

জমিদার বাড়ির অনেকটা দূরে থাকতেই সাইকেল থেকে নেমে পড়লো সে। সাইকেল নিয়েই পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেলো বাকিটা পথ। জমিদার বাড়ির মেইনগেটের কাছে এসে সতর্কভাবে আশেপাশে তাকালো। কেউ নেই। থাকার কথাও নয়। গেটের ভেতরে কারোর কোনো রকম উপস্থিতিও টের যাচ্ছে না। দরজার ওপাশে ঐ বোবা দারোয়ান ঘাপটি মেরে আছে কিনা কে জানে। তাকে আগে নিশ্চিত হতে হবে। মাটি থেকে একটা ঢিল তুলে নিয়ে মেইনগেট লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলো। গ্রিলের দরজায় লেগে টুক করে শব্দ হলেও কারোর সাড়া-শব্দ পাওয়া গেলো না। তারপরও একটু সময় নিয়ে অপেক্ষা করলো সে। আরো বেশি নিশ্চিত হতে হবে। আরেকটা ঢিল ছুঁড়ে মারলেও কোনো সাড়া-শব্দ পেলো না। পরক্ষণেই আপনমনে হেসে ফেললো। বোবা তার ঢিলের শব্দ কি করে শুনবে, সে তো কানেই শোনে না!

একটু ভেবে নিলো সে। ছেলেটা গেটের পেছনে আছে কিনা সেটা খুব সহজেই দেখা যাবে।

এবার মেইনগেটের ডানপাশের সীমানাপ্রাচীর ধরে একটু এগিয়ে গেলো ছফা। দেয়াল টপকানোর মতো ভালো জায়গা দরকার। প্রাচীরের ওপাশে বড় বড় গাছ, কিছু গাছের ডাল-পালা বাইরের দিকে ঝুঁকে আছে। আবছা অন্ধকারেই দেখতে পেলো সীমানাপ্রাচীরটা বেশ পুরনো। জায়গায় জায়গায় পলেস্তারা খসে পড়ছে। সম্ভবত মূল জমিদার বাড়িটি তৈরি করার সময়েই এটা নির্মাণ করা হয়েছিলো, তবে পাঁচ ফুট উঁচু পুরনো প্রাচীরের উপরে আরো তিন চার ফুটের নতুন দেয়াল তৈরি করা হয়েছে এখন। পুরনো প্রাচীরের পুরুত্ব বিশ ইঞ্চির নীচে হবে না, সে-তুলনায় নতুন দেয়ালের পুরুত্ব। বড়জোর দশ ইঞ্চির মতো।

একটা জায়গায় এসে দেখতে পেলো দেয়ালের উপর দিয়ে নাম-না জানা একটি গাছের ডালপালা ঝুঁকে আছে। সাইকেলটা দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে আস্তে করে সিটের উপর উঠে দাঁড়ালো সে। দেয়ালের উপর দিয়ে জমিদার বাড়ির ভেতরে তাকিয়ে দেখতে পেলো গেট থেকে মূল বাড়ি পর্যন্ত কাউকে দেখা যাচ্ছে না। দোতলা বাড়িটার সামনের লনের মাঝখানে একটি ফোয়ারা আছে তবে সেটা অকেজো। তারপরও পুরনো

আমলের দোতলা বাড়িটি আভিজাত্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুই দিকে বড় বড় চারটা ফ্রেঞ্চজানালা, মাঝখানে তিন-চার ধাপের নক্সা করা সিঁড়িযুক্ত সদর দরজা। দোতলাটি ঠিক নীচের তলার মতোই তবে মাঝখানে একটা ঝুল বারান্দা আছে। সদর দরজার ঠিক উপরে এর অবস্থান। কারুকার্য করা প্রাচীরঘেরা ছাদ। সম্ভবত ভবনটি রেনোভেট করার সময় প্রথমদিকের কিছু সুক্ষম নক্সা আর কারুকাজ হারিয়ে গেছে। পুরো ভবনটি সাদা রঙে রাঙানো। সেই রঙ হলদেটে হয়ে গেছে। জানালাগুলো পুরনো আমলের হলেও সম্ভবত নতুন করে বানানো হয়েছে। কাঠের ফ্রেমগুলো দেখতে নতুন, শত বছরের পুরনো বলে মনে হচ্ছে না।

মূল বাড়ির নীচতলায় বামদিকে এবং দোতলার ডানদিকের একটি ঘরে বাতি জ্বলছে। বাইরের ঘাসের লনটি একেবারে ছিমছাম। কিছু পাতাবাহার গাছ আছে ওখানে। মেইনগেট থেকে ইট বিছানো একটি ড্রাইভওয়ে চলে গেছে মূল বাড়ির সদর-দরজা পর্যন্ত। দরজার

উপরে জ্বলছে একটি লালচে বারে বাতি, সেই আলোতে কিছুটা আলোকিত হয়ে উঠেছে লনটি, তবে বিশাল জায়গার তুলনায় তা একেবারেই অপ্রতুল। পুরনো দালানের ডানপাশে টিনের চালার একটি ছোটো ঘর। দেখে মনে হচ্ছে ওটা গাড়ি রাখার কাজে ব্যবহার করা হয়।

কয়েক মুহূর্ত সাইকেলের সিটের উপরে দাঁড়িয়ে থেকে সবকিছু ভালো করে দেখে নিলো ছফা। সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার ঠিক নীচে, ওপাশের দেয়ালজুড়ে কিছু ফুলের গাছ আর পাতাবাহার চলে গেছে ডান দিক দিয়ে। দোতলা বাড়ি পর্যন্ত। তবে ওদিক দিয়ে বাড়ির পেছন দিকে যাবার কোনো রাস্তা নেই। ওখানে একটা ঘর তোলা হয়েছে। ইটের দেয়াল আর টিনের ছাদ। এটা নিঃসন্দেহে অনেক পরে বানানো হয়েছে, সম্ভবত মুশকান জুবেরি আসার পর। ঘরটার পাশেই একটা আমগাছ। আর সম্ভবত এই গাছটায়ই উঠেছিলো। এবার বাড়িটার বামদিকে ভালো করে তাকালো। দেখতে পেলো ঘাসের লনের উপর একটা মেঠো পথ। সেটা চলে গেছে বাড়ির বামদিক দিয়ে পেছনে। ছফা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে যতোটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে ওখান দিয়েই বাড়ির পেছন দিকে যাবার রাস্তা। পুরনো দিনের এরকম প্রতাপশালীদের বাড়িতে অন্দরমহলে প্রবেশের জন্যে রাস্তা থাকাটাই স্বাভাবিক। অনেক জমিদার বাড়িতে এটা দেখেছে সে, বিশেষ করে ঘোড়াগাড়ি কিংবা রথ যাতায়াত করতে পারে এমন প্রশস্ত পথ।

এভাবে অনেকক্ষন ধরে বাড়িটা পর্যবেক্ষণ করার পর আস্তে করে ডান পা-টা দেয়ালের উপরে তুলে দিয়ে অনায়াসেই ওটার ওপর উঠে বসতে পারলো। এবার লাফ দেবার পালা। কাজটা তার জন্য সহজ। উপরের দিকে তিন ফুটের মতো দেয়াল নীচের দেয়াল থেকে কম পুরু, ফলে চার-পাঁচ ইঞ্চির একটি ধাপ তৈরি হয়ে গেছে। সেই ধাপে পা রেখে নীচু হয়ে গেলো, শরীরটা ঝুলিয়ে দিলো আস্তে করে, তারপরই ছোট্ট একটা লাফ। কাঁচামাটি আর ঘাসের উপরে পড়তেই সামান্য একটি ভোতা শব্দ হলো কেবল।

উঠে দাঁড়ালো ছফা। পাশের একটি ফুলগাছের আড়ালে চলে গেলো সে। পুরো বাড়িটা সুনশান। দূর থেকে একটা মৃদু শব্দ ভেসে এলেও বুঝতে পারলো না ওটা কিসের। একে

তো শব্দটা ক্ষীণ আর ভোতা, তার উপরে ঝিঁঝি পোকার ডাক মিলেমিশে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। এখন তাকে বাড়ির পেছনদিকে যেতে হলে দোতলা বাড়িটার সম্মুখভাগের লনের উপর দিয়ে চলে যেতে হবে বামদিকে। এটা হবে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। বাড়ির ভেতর থেকে কেউ দেখে ফেলতে পারে।

দেয়ালের পাশে একটি ফুলগাছের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে রইলো। সে। আতরের কাছ থেকে যতোটুকু জেনেছে, এই বাড়িতে মাত্র তিনজন মানুষ বাস করে। মুশকান জুবেরি ছাড়াও বোবা ইয়াকুব নামের এক দারোয়ান আর কাজের একটি মেয়ে থাকে। সুতরাং সাহস করে লনটা পেরোনোর সিদ্ধান্ত নিলো। একটামাত্র লালচে বাতির আলোয় চতুরটি খুব একটা আলোকিত নয়। প্রথমে এক দৌড়ে ফোয়ারার বেইসের কাছে গিয়ে নীচু হয়ে বসে পড়লো, তারপর সতর্ক দৃষ্টিতে দেখে নিলো বাড়ির সামনে থেকে কেউ দেখছে কিনা। নিশ্চিত হয়ে নিঃশব্দে দৌড়ে গেলো বাড়িটার বামদিকে।

মূল বাড়ির বাম দিকে যে আরেকটা দোতলা ভবন আছে সেটা এইমাত্র আবিষ্কার করলো। এই দোতলাটি খুবই ছোটো। মাত্র দুটো বড়সড় ঘর। বাইরের দিকে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় যাবার ব্যবস্থা আছে। এই ছোটো স্থাপনাটির সাথে মূল ভবনের দুরত্ব হবে বড়জোর পনেরো-বিশ ফিটের মতো। কিন্তু দুটো ভবনে যাতায়াতের জন্য দোতলার উপরে একটি প্যাসেজ রয়েছে; অনেকটা সংযোগ-সেতুর মতো। দুটো ভারি লোহার বিমের উপরে স্থাপন করা হয়েছে এই ঝুলন্ত প্যাসেজটি। ওটার ছাদ টালি দিয়ে ঢাকা, কুড়েঘরের মতো দু-দিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে। সম্ভবত পার্শ্বভবনটি চাকর-বাকরদের কোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। মণিবের হুকুম পেয়ে দ্রুত। ছুটে আসার জন্য দোতলার সাথে এর একটি প্যাসেজ দিয়ে সংযোগ করা হয়েছে। এরকম ভবন ছফা আরো দেখেছে। সবই জমিদার আমলের বিত্ত বৈভবের বর্হিপ্রকাশ।

মাথার উপরে প্যাসেজটির দিকে তাকালো সে, তারপর নজর দিলো সামনের দিকে। ইটবিছানো একটি পথ চলে গেছে বাড়ির পেছনে। পা টিপে টিপে সেই পথ ধরে এগিয়ে

গেলো। জায়গাটা বেশ অন্ধকার, ফলে তার জন্যে সুবিধাই হলো। কয়েক পা সামনে এগোতেই দেখতে পেলো বামদিকে সার্ভেন্ট কোয়ার্টারটা শেষ হতেই একটা খিলানুক্ত প্রবেশদ্বার। একেবারে ভগ্নপ্রায়। বাড়িটা মেরামত করা হলেও এটার কোনো সংস্কার করা হয় নি। খিলানের কাছে এসে ভেতরে উঁকি দিলো। অন্ধকারেও চোখে পড়লো ছোটোখাটো আঙিনার মতো একটি জায়গা। সেই খোলা জায়গাটির উত্তর পূর্ব দিক জুড়ে ইংরেজি 'এল' অক্ষরের মতো করে পাশাপাশি চারটি পাকাঘর। সবগুলোই জীর্ণ, বহুকালের পুরনো।

ছোটো ছোটো ঘরগুলোর উপযোগীতা কি বুঝতে বাকি রইলো না তার। জমিদার বাড়িটা সেই যুগে নির্মাণ করা হয়েছে যখন সবাই বাথরুম-টয়লেট যথাসম্ভব মূল বাড়ি থেকে দুরে রাখতো। তবে সে নিশ্চিত, মুশকান জুবেরি এগুলো আর ব্যবহার করে না। বাড়ির ভেতরে নতুন করে বাথরুম-টয়লেট বানিয়ে নিয়েছে নিশ্চয়। দেখেও মনে হচ্ছে পুরনো শৌচাগারগুলো এখন পরিত্যক্ত।

খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বারটি অতিক্রম করে সামনের দিকে পা বাড়ালো। ইটবিছানো পথটি চলে গেছে সোজাসুজি সামনের দিকে, তবে অন্ধকারে সেটা ঠাওর করতে পারলো না, শুধু বুঝতে পারলো পথটি বহু পুরনো।

বাড়িটা রেনোভেট করার সময় এটার তেমন সংস্কার করা হয় নি। কিছুটা সামনে গিয়েই ইটের পথটি মাটির আস্তরণ আর আগাছায় ঢেকে গেছে। সেই পথের বাম দিক ঘেষে সীমানা প্রাচীর চলে গেছে, প্রাচীর আর পথের মাঝখানের জায়গাটি ঘন ঝোঁপঝাঁড়ে পরিপূর্ণ।

জমিদার বাড়ির সামনের খোলা চত্বর থেকে পেছনের জায়গাটি বেশ বড়। বাড়িটার পেছনদিকে এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত পাকা আঙিনা। মাটি থেকে কমপক্ষে চারফুটের মতো উঁচু হবে ওটা।

দু-দিকের সীমানা প্রাচীরগুলো অসংখ্য বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়ে হারিয়ে গেছে। হাসনাহেনা ফুলের গন্ধে মৌ মৌ করছে জায়গাটা। বাগানে নানান। ধরণের ফুলগাছও আছে। আবছা আবছা অন্ধকারেও কিছু সাদা-ফুল চোখে পড়লো তার। অন্ধকারে ঠাওর করতে পারলো না বাগানের শেষ সীমাটুকু। যেনো গাঢ় অন্ধকার আর গাছপালার ভীড়ে হারিয়ে গেছে।

আতর আলী তাকে বলেছে, বাড়িটার পেছনে বিশাল জলাশয় আছে। সম্ভবত বাগানটা গিয়ে মিশেছে সেই জলাশয়ে। তাহলে জোড়-পুকুরটা কোথায়? সে জানে এই বাড়িতে নারী-পুরুষের জন্য আলাদা দুটো পুকুর আছে। ওটা সম্ভবত খাল আর বাড়ির পেছন দিককার কোনো জায়গার মাঝামাঝিতে অবস্থিত।

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ পেয়ে চমকে উঠলো ছফা। বুঝতে পারলো মূলবাড়ির ভেতর থেকে কেউ বেরিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে বামদিকের ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে নীচু হয়ে বসে রইলো, দেখতে পেলো, টর্চ হাতে এক নারীমূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে ভবনের পেছন দিকের আঙিনায়। চিনতে পারলো সে।

মুশকান জুবেরি!

ভদ্রমহিলা আঙিনায় এসে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। যেনো বাতাসের গন্ধ নিচ্ছে! সাদা রঙের শাড়ির উপরে লাল টকটকে একটা শাল জড়িয়ে রেখেছে এখন। হাতে একটা টর্চলাইট নিয়ে ধীর পদক্ষেপে আঙিনা থেকে নেমে বাগান পেরিয়ে ঘন গাছপালা আর ঝোঁপঝাঁড়ের ভেতর দিয়ে চলে গেলো সে।

একটু পরই ছফা বেড়িয়ে এলো ঝোপের আড়াল থেকে। এরকম রাতের বেলায় মুশকান জুবেরি টর্চ হাতে কোথায় যাচ্ছে?

সতর্ক পদক্ষেপে কিন্তু অনেকটা মন্ত্রমুগ্ধের মতো টর্চের আলো অনুসরণ করে এগিয়ে গেলো ছফা। ইট বিছানো পথের উপর পড়ে থাকা শুকনো পাতায় পা পড়তেই মচমচ করে

শব্দ হচ্ছে। মুশকান জুবেরি যদি হঠাৎ পেছন ফিরে দেখে তাহলে ধরা পড়ে যাবে, তাই ইট-বিছানো পথ থেকে নেমে গেলো। বেড়ালের মতো সাবধানে পা ফেলে সামনের ছোটো একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে বসে পড়লো সে। একটু থেমে সামনের বড় একটা গাছের আড়ালে চলে গেলো দ্রুত। মুশকান জুবেরি ধীরপায়ে শুকনো পাতা মাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ করেই চোখের সামনে টর্চের আলোটা উধাও হয়ে গেলো। ছফা ধরে নিলো মহিলা সম্ভবত টর্চটা বন্ধ করে দিয়েছে।

থমকে দাঁড়ালো সে। কয়েক মুহূর্ত ভেবে আগের চেয়ে আরো বেশি সতর্ক হয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকারের দিকে পা বাড়ালো কিন্তু দশ কদম সামনে এগোতেই দেখতে পেলো পুরনো একটি দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। ঝোঁপ-ঝাঁড় আর গাছপালাগুলো শেষ হয়ে গেছে সেই দেয়ালের খুব কাছে এসে। মাথার উপরে গাছগুলোর ডালপালা মৃদু চাঁদের আলো আটকে দিয়েছে, ফলে জায়গাটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। মুশকান জুবেরি যেনো দেয়াল ভেদ করে হারিয়ে গেছে চোখের নিমেষে!

অধ্যায় ১১

আতর আলী হা করে চেয়ে আছে মাটির দিকে। গর্ত বলে কিছু নেই সেখানে! অথচ একটু আগেই এখান দিয়ে যাবার সময় বেচারা সাংবাদিক সদ্য খোরা কবরে পড়ে নাস্তানাবুদ হয়েছিলো।

চারপাশে তাকিয়ে হাটু গেড়ে বসে পড়লো সে। ফালুর সদ্য খোরা 'অ্যাডভান্স' কবরটি সুন্দর করে ভরাট করে ফেলা হয়েছে। এমনভাবে সেটা করা হয়েছে যেনো সহজে বোঝা না যায়, কিন্তু আতরের চোখে স্পষ্ট ধরা পড়ছে কবর ভরাট করার লক্ষণগুলো। আলগা মাটি ফেলে ভরাট করার চিহ্ন এখনও রয়ে গেছে। ফালু চেষ্টা করেছে এই কবরটা খোরার কোনো চিহ্ন যেনো না থাকে। কিন্তু কেন?

উঠে দাঁড়ালো আতর।

ফালুকে সে এতোদিন নিতান্তই তারছেঁড়া পোলা হিসেবে দেখে এসেছে। ওর ব্যাপারে তার শ্যেনদৃষ্টি কখনওই পড়ে নি। এখন মনে হচ্ছে। ছেলেটা বোবা-ডাকাইত! ভালোমানুষের ছদ্মবেশে অগোচরে কিছু একটা করছে, আর সেটা সাংঘাতিক কিছুই হবে। ওর নিশ্চয় বিরাট কোনো গোমড় আছে। ঐসব গ্রামবাসীর জন্য তার করুণা হলো যারা মনে করে ফালু একজন কামেল লোক, স্বয়ং আজরাইলের সঙ্গে তার খাতির রয়েছে, জান কবচের খবর আগেভাগে টের পেয়ে যায় সে, তাই সুন্দরপুরে কেউ মারা যাবার আগেই কবর খুরে রাখে। আজও তাই করেছিলো, তারপর তমিজের বাপও পা পিছলে গুয়ের গাড়ায় পড়ে মরলো, সবই ঠিক আছে কিনতু বুড়োর লাশ দাফন করার আগে কবরটা কেন ভরাট করে ফেলা হলো? তাহলে ফালুর 'অ্যাডভান্স' কবর খোরার উদ্দেশ্যটা কি ছিলো?

এইসব প্রশ্ন মাথায় নিয়েই আতর আলী আবারো চলে এলো গোরখোদকের ঝুপড়ি ঘরের সামনে। এবার আর কোনো হাঁক-ডাক দিলো না, দরজা দিয়েও চেষ্টা করলো না, সোজা চলে গেলো ঘরের বামদিকে। ওখানে একটা টিউবওয়েল আর ধোয়া-মোছার জন্য পাকা-জায়গা আছে। টিউবওয়েলের দিকে মুখ করে আছে ঝুপড়ি ঘরের একটি জানালা। ওটা বন্ধ থাকলেও কপাট দুটো ধাক্কা মারতেই খুলে গেলো। জানালায় কোনো শিক দেয়া নেই। অনায়াসেই ঘরের ভেতরেকে যেতে পারলো সে।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। সেই অন্ধকার চোখে সয়ে যেতে একটু সময় নিলো। পকেটে একটা মোবাইলফোন আছে যার ডিসপ্লে কাজ করে না। অগত্যা দেয়াশলাইর কাঠি জ্বালালো আতর।

আমকাঠের একটা চৌকি, কাপড় রাখার আলনা, এককোণে পানি রাখার মাটির কলস, কিছু হাড়ি-পাতিল আর কোদাল, শাবল, টুকরি দেখতে পেলো।

আরেকটা কাঠি জ্বালিয়ে ঘরটায় শকুনি নজরে দেখে নিলো সে। একজন নিঃসঙ্গ গোরখোদকের ঝুপড়িঘর যেরকম থাকার কথা তার চেয়ে বেশি কিছু নেই। কিন্তু পুলিশের সাথে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে সে, তার নাকে অন্য কিছুর গন্ধ খুব দ্রুতই ধরা পড়ে। উপুড় হয়ে চৌকিটার নীচে দেয়াশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠির আলোয় দেখলো। ঘুটঘুটে অন্ধকারেও জিনিসটা চিনতে পেরে ইনফর্মারের শরীরে কাটা দিয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। একটা ময়লা চাদরে কিছু মুড়িয়ে রেখেছে কিন্তু ফাঁক-ফোকড় দিয়ে মানুষের শরীরের হাঁড় বের হয়ে আছে!

কঙ্কাল!?

একটু ভয় পেলেও বুকে সাহস নিয়ে কাপড়টা খুলে দেখার চেষ্টা করলো। লাশের আর অবশিষ্ট কিছুই নেই আছে শুধু হাঁড়গোড। তাতে লেগে আছে পচা মাংসের অবশিষ্ট। কাদামাটিও হতে পারে, তবে অন্ধকারে দেয়াশলাইর কাঠির আলোয় নিশ্চিত হতে পারলো

না। কাপড়টা সরিয়ে আরেকটু দেখতে যাবে অমনি ঝুপড়ি ঘরের বাইরে কারোর পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠলো সে। সঙ্গে সঙ্গে হাতের জ্বলন্ত কাঠিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলো।

ফালু?

পায়ের শব্দটা এখন ঝুপরি ঘরের দরজার খুব কাছে চলে এসেছে। আতর কিছু বুঝে ওঠার আগেই দরজার ফাঁক-ফোকর দিয়ে টর্চের আলো এসে পড়লো ঘরের ভেতরে। নিমেষে তার শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেলো।

*

ঘুটঘুটে অন্ধকারে একটি পুরনো দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ছফা। এ মুহূর্তে কিংকর্তব্যবিমূঢ় শব্দটিই তার বেলায় বেশি প্রযোজ্য। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে নিজেকে ধাতস্থ করার চেষ্টা করলো। অন্য অনেকের মতো সে কুসংস্কারগ্রস্ত নয়, ভুত-প্রেত, জিন-পরীতেও তার বিশ্বাস নেই। একজন যক্তিবাদী মানুষ হিসেবে সে জানে জগতে যুক্তির বাইরে কিছুই নেই; কিছু ঘটেও না। তার অভিজ্ঞতা বলে, সমস্ত রহস্য আর অব্যাখ্যাত ব্যাপারগুলো আসলে সাময়িক বিভ্রম। অজ্ঞানতা। এক সময় রহস্য ভেদ করে ঠিকই সত্য জানা যায়।

দু-চোখ কুচকে সামনের দেয়ালের দিকে ভালো করে তাকালো। এখান দিয়ে অবশ্যই কোনো প্রবেশপথ আছে। মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগের ঘটনা, তার স্পষ্ট মনে আছে ঐ মহিলা ইটবিছানো পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলো। সামান্যতম ডানে-বামে নয়, একেবারে সোজা।

মাথার উপরে ঘন ডালপালা থাকার কারণে চাঁদের আলো বাঁধা পড়েছে, ফলে জায়গাটা ঘুটঘুটে অন্ধকার, স্পষ্ট করে কিছু দেখার উপায় নেই। তবে ইটবিছানো পথটি যে দেয়ালের দিকেই চলে গেছে সেটা বুঝতে পারলো। মুশকান জুবেরির মতো তার হাতে টর্চলাইট থাকলে বুঝতে পারতো সামনে আসলে কি আছে।

সামনের দিকে একটু এগিয়ে অন্ধের মতো দেয়ালটা হাতরাতে চাইলে কিনতু নাগাল পেলো না। আরেকটু সামনে বাড়লো, এবারও তার হাত দেয়ালটা স্পর্শ করলো না। বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ালো ছফা। টের পেলো নিঃশ্বাস বেড়ে গেছে। ইটবিছানো পথের উপরে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। মোবাইলফোন বের করে ডিসপ্লের আলো জ্বালাতে পারছে না নিজের উপস্থিতি চাউর হবার ভয়ে। তাই অন্ধকারে চোখ সয়ে আসার জন্য একটু অপেক্ষা করলো, আর সেটা হতেই ধরতে পারলো দৃষ্টি বিভ্রমের কারণটা।

জমিদার বাড়ির পুবদিকে জোড়পুকুর অবস্থিত। মূল বাড়ি থেকে পুকুরটা আলাদা করা হয়েছে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর দুটো দেয়াল দিয়ে। দেয়াল দুটো একই রেখায় অবস্থিত নয়। দক্ষিণ দিক থেকে যে দেয়ালটা এসে মিলেছে ইটবিছানো পথের কাছে, তার থেকে ছয়-সাত ফিট পরে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় দেয়ালটি। ওটা চলে গেছে উত্তর দিকে। দুটো দেয়ালের মাঝে যে ফাঁক সেটাই কাজ করে খোলা প্রবেশদ্বার হিসেবে। কোনো দরজা না থাকলেও অন্দরবাড়ির মহিলাদের স্নান করার দৃশ্য এই প্রবেশদ্বারের সামনে। দাঁড়িয়ে দেখা সম্ভব নয়। জোড়পুকরে যেতে হলে দটো দেয়ালের মাঝখানে ছোট্ট একটা গলি দিয়ে যেতে হবে। এর ফলে রাতের অন্ধকারে বিভ্রমের সৃষ্টি হয়েছে। পুরনো দিনের এই স্থাপত্য-কৌশলে মুগ্ধ হলো ছফা। এই সহজ সরল টেকনিকটা মঞ্চে রাখা বিশাল আকারের হাতি ভ্যানিশ করার জাদুতে ব্যবহার করে থাকে জাদুকরেরা।

ছোট্ট গলিটিতে ঢুকে পড়তেই বেশ কিছুটা দূরে উজ্জ্বল আলোর উৎস চোখে পড়লো তার। জোড়পুকুরটার শান বাঁধানো ঘাটের আগে বেশ কিছুটা খালি জায়গা আছে, সেখানে উজ্জ্বল আলোর একটি বাতি জ্বলছে। চিনতে পারলো সে। দেখতে অনেকটা বড়সর হারিকেনের মতো হলেও এর আলো বেশ উজ্জ্বল। ছোটোবেলায় তারা এটাকে গ্যাস-বাতিও বলতো। এক সময় গ্রামে-গঞ্জে বেশ জনপ্রিয় ছিলো এটা। জিনিসটার নাম অনেক চেষ্টা করে মনে করতে পারলো না নুরে ছফা। যাহোক, তার দৃষ্টি আটকে রইলো একজন বলশালী আর মাঝারিগগাছের যুবকের দিকে, তারা দু-জন দাঁড়িয়ে আছে একটা গর্তের পাশে। মুশকান জুবেরি তাদের সামনে দাঁড়িয়ে কী যেনো বলছে। হাতের টর্চটা দিয়ে কিছু

একটা দেখাচ্ছে গর্তের নীচে। গর্তের পাশেই আলগা মাটির স্তূপ, একটা কোদাল, বেলচা আর ভাঁজ করা চটের ছালা পড়ে আছে। গতটা আকারে কবরের চেয়ে সামান্য বড় হবে।

ছফা টের পেলো তার কপালে ঘাম জমতে শুরু করেছে। হৃদস্পন্দন থমকে আছে যেনো। দেয়ালের প্যাসেজটার পাশেই বড় একটা গাছের নীচে তিন-চার ফুট উঁচু ঘন ঝোপের আড়ালে মূর্তির মতো বসে রইলো সে। উজ্জ্বল আলোয় পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে খালি গায়ের গোরখোদক ফালু ময়লা জিন্স প্যান্ট হাটু পর্যন্ত গুটিয়ে রেখেছে। তার সারা শরীর আর মুখ ঘেমে একাকার। হাপাচ্ছে সে। কবর খুরে পরিশ্রান্ত এখন। কপালের ঘাম হাত দিয়ে কেঁচে ফেললো একবার। নিজের খোরা গর্তের তাকিয়ে কী যেনো দেখছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মাঝারিগোছের যুবকের দৃষ্টিও সেদিকে। তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হচ্ছে না। সম্ভবত এটাই বোবা দারোয়ান। মুশকান জুবেরি মাথা নেড়ে সায় দিয়ে কী যেনো বললো তাকে। সঙ্গে সঙ্গে গোরখোদক ছেলেটাকে নিয়ে চটের ছালাটা মেলে ধরলো সে, দু-দিকে দুটো প্রান্ত ধরে উপুড় হয়ে গর্তের নীচে বিছিয়ে দিলো ওটা।

টর্চটা বন্ধ করে গভীর মনোযোগের সাথে গর্তের নীচে তাকিয়ে আছে। মুশকান জুবেরি। অবশেষে সন্তুষ্ট হয়ে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে কিছু একটা ইশারা করতেই ফালু আর ইয়াকুব কোদাল-বেলচা নিয়ে গর্তের মধ্যে আলগা মাটি ফেলতে শুরু করে দিলো।

নুরে ছফা টের পেলো তার নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে গেছে। মুশকান জুবেরি কী করছে! কাউকে কবর দিচ্ছে!? একজন নয় নিশ্চয়।

সর্বনাশ!

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে গোরখোদক ফালু এসব কাজে খুব দক্ষ। যন্ত্রের মতো দ্রুত হাত চালিয়ে আলগা মাটিগুলো কোদালে করে নিয়ে ফেলে দিচ্ছে গর্তের মধ্যে। বোবা দারোয়ান অবশ্য ধীরগতিতে মাটি ফেলে যাচ্ছে।

মুশকান জুবেরি এখন বাগানের আশেপাশে তাকাচ্ছে। আকাশের দিকেও এক পলক তাকালো। বুকের কাছে দু-হাত ভাঁজ করে রেখেছে। তার ডানহাতে টর্চটা। গায়ে জড়ানো শাল থুতনি পর্যন্ত ঢেকে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে গর্ত ভরাট করার কাজে সন্তুষ্ট।

ঝোপের আড়াল থেকে গর্তের নীচে কি আছে ছফার পক্ষে সেটা দেখা সম্ভব হচ্ছে না, তবে সে জানে একটা জিনিসই থাকতে পারে ওখানে, আর এটা ভাবতেই তার গায়ে কাটা দিয়ে উঠলো। মনে হলো এরকম গভীর রাতে নির্জন এই বাড়িতে ঢোকাটা ঠিক হয় নি। কতো বড় বিপদ তার জন্যে অপেক্ষা করছে কে জানে। এরা যদি টের পেয়ে যায় তাহলে কি হবে ভাবতেই তার হাত-পা অসাড় হয়ে গেলো। বোবা দারোয়ান, গোরখোদক ফালু আর মুশকান জুবেরিকে মানুষ বলে মনে হচ্ছে না।

নিজেকে খুব সাহসী মনে করলেও এই প্রথম ছফা টের পেলো সে। দারুণভাবেই ভড়কে গেছে। এখন যদি ঐ গোরখোদক আর দারোয়ান ছেলেটা তার দিকে তেড়ে আসে তাহলে ঝোপের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াবার মতো শক্তি থাকবে কিনা সন্দেহ। পা দুটো খুব ভারি অনুভূত হচ্ছে। তার কাছে, বুকে চলছে হাতুড়িপেটা। গভীর করে দম নিলো সে। শ্বাসপ্রশ্বাস এলোমেলো হয়ে গেছে। নিজেকে স্বাভাবিক রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করলো।

মুশকান জুবেরি বুকের কাছে হাত রেখেই দাঁড়িয়ে আছে, তার দৃষ্টি গর্তে মাটি ফেলার দিকে নেই, আশেপাশের অন্ধকারে চোখ বুলাচ্ছে। ছফা বুঝতে পারলো মহিলার মধ্যে এক ধরণের ভৌতিক সৌন্দর্য আছে। উজ্জ্বল গ্যাস বাতির আলোয় তার চোখ দুটো কেমন জানি দেখাচ্ছে তবে আতর আলীর বর্ণনামতো সেই চোখ মোটেই জ্বলজ্বল করে জ্বলছে না। ইনফর্মার সম্ভবত ভয় পেয়ে দৃষ্টি বিভ্রমের শিকার হয়েছিলো।

গর্তটা প্রায় ভরাট হয়ে উঠেছে। ফালুর শরীর দিয়ে দরদর করে ঘাম ছটলেও বিরাহীনভাবেই সে মাটি ফেলে যাচ্ছে কোদাল দিয়ে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে পারছে না বোবা ইয়াকুব।

ছফা দেখতে পেলো মুশকান জুবেরি তার মুখটা সামান্য উঁচু করে গভীর করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

বাতাসের গন্ধ নিচ্ছে?!

হঠাৎ করে ছফার বুকের রক্ত আরেকবারের জন্য হিম হয়ে গেলো। ঝোপের আড়ালে মূর্তির মতো বসে রইলো সে। আতরের বলা গল্পটা মনে পড়ে গেলো। সঙ্গোপনে প্রার্থনা করলো এটা যেনো তার বেলায় না ঘটে। এই মুহূর্তে মুশকান জুবেরি যদি তার দিকে তাকায় সে স্থির থাকতে পারবে না। তার দু-চোখ কুচকে গেলো। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মিসেস জুবেরির নাসারন্ধ্র ফীত হয়ে আছে। মহিলা আলতো করে দুচোখ বন্ধ করে ফেললো কয়েক মুহূর্তের জন্য, যেনো শিকারীপশু শিকারের গন্ধ পাচ্ছে। তারপরই ছফার হৃদপিণ্ডে কাঁপন ধরিয়ে ঘাড়টা না ঘুরিয়েই আড়চোখে ঝোপের দিকে তাকালো সে। তার উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে? মহিলার মুখে বাঁকাহাসিও ফুটে উঠলো এ সময়।

ঝোপের পেছনে হতবিহ্বল হয়ে বসে রইলো নুরে ছফা। সে বিশ্বাসই করতে পারছে না মুশকান জুবেরি কী করে বুঝে গেলো সে এখানে আছে।

শুধু এটুকুই। আড়চোখে তাকানো, মুখে বাঁকাহাসি, আর কিছু করলো না রহস্যময়ী নারী। আতরের সাথেও মহিলা ঠিক এরকমই করেছিলো।

কিন্তু তাকে অপ্রস্তুত করে দিয়ে আচমকাই বোবা দারোয়ানকে হাত তুলে মাটি ফেলার কাজ থামানোর নির্দেশ দিলো মুশকান, তারপর হাতের টর্চটা তুলে ঝোপের দিকে দেখিয়ে দিতেই ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে বেলচা রেখে ছুটে আসতে লাগলো ঝোপের দিকে।

ঘটনার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গেলো ছফা। বুঝতে পারছে না কী করবে!

.

অধ্যায় ১২

লুঙ্গির প্রান্ত দুটো দু-হাতে ধরে হাটুর উপরে তুলে রীতিমতো দৌড়াচ্ছে আতর।

ফালুর ঘরে যেভাবে ঢুকেছিলো ঠিক সেভাবেই জানালা দিয়ে বেরিয়ে টিউবওয়েলের পাশ দিয়ে সোজা চলে যায় কবরস্তানের দক্ষিণ দিকে। বেড়ালের মতো নিঃশব্দে পালাতে পারেনি। একটা পুরনো কবরের উপর পা পড়তেই মাটি দেবে হুমুরিয়ে পড়ে যায় সে।

"ওই? কে? কে?"

তার পড়ে যাবার শব্দ শুনে ঝুপরি ঘরের দরজার কাছ থেকে বাজখাই কণ্ঠটা বলে উঠেছিলো। টর্চের আলোও ফেলেছিলো শব্দটার উৎস আন্দাজ করে। আতর আর উঠে দাঁড়ায় নি। চুপচাপ কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করে যাতে ফালু মনে করে শিয়াল কিংবা বাঘডাস হবে হয়তো। কে না জানে, গ্রামের কবরস্তানে এদের নিত্য আনাগোনা। কবর খুরে পচা গলা লাশ খেতে এদের জুরি নেই।

আতরের ধোঁকায় কাজ হয়। গোরখোদক আর উচ্চবাচ্য না করে কয়েক মুহূর্ত পরই একটা বড়সর মাটির চাকা ছুঁড়ে মারে শব্দের উৎসের দিকে। ঢিলটা পড়ে আতরের খুব কাছেই। হারামজাদার নিশানা বলতে হবে। একটুর জন্যে ওটা গায়ে লাগে নি। টর্চের আলোটা সরে যেতেই শুনতে পায় বিড়বিড় করে কেউ কিছু বলছে। তবে শেয়াল আর বাঘডাশের চৌদ্দগুষ্টি উদ্ধার করে দেয়া গালিগালাজগুলো আতরকে স্বস্তি এনে দেয়।

গালাগালি থেমে যেতেই আস্তে করে উঠে দাঁড়ায় সে, অন্ধকারে পা টিপে টিপে কবরগুলো এড়িয়ে দক্ষিণ দিকে নেমে পড়ে। ওই জায়গাটা একটু নীচ, ঝোঁপঝাঁড় আর ডোবায় ভরতি। উপায়ন্ত না দেখে লুঙ্গিটা হাটুর উপরে তুলে কাদা-পানিতে নেমে পড়ে সে। কবরস্তান থেকে একটু দূরে, বিস্তৃর্ণ ক্ষেতের কাছে আসতেই জোরে জোরে দৌড়াতে শুরু করে।

মহাসড়কে আসতেই দম ফুরিয়ে গেলো আতরের। পথের পাশে থেমে একটু জিরিয়ে নিলো। পায়ে কাদা লেগে থাকার কারণে এখনও লুঙ্গিটা হাটুর উপরেই তুলে রেখেছে। অনেকক্ষণ বিরতি দিয়ে একটা-দুটা বাস-ট্রাক চলে গেলেও মহাসড়কে রিক্সার কোনো বিকার দেখা পেলো না। রাতের এ সময় টাউনেই রিক্সা পাওয়া কঠিন, এই সড়কে সারারাত বসে থাকলেও পাবে না। একটু সামনে এগিয়ে সড়কের পাশে ডোবা থেকে পা দুটো ধুয়ে নিলো, তারপর একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলো সে।

সড়কের একপাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে আতরের মাথায় অনেকগুলো প্রশ্ন ঘুরতে লাগলো। ফালুর ঘরে চৌকির নীচে চাদরে মোড়া জিনিসটা কি সত্যি সত্যি লাশের কঙ্কাল ছিলো, নাকি এটা তার মনের ভুল? না। সে নিশ্চিত, ওটা মানুষের কঙ্কালই ছিলো। কথা হলো, ঐ হারামজাদা নিজের ঘরের খাটের নীচে লাশের হাড্ডিগুড্ডি রেখে দিয়েছে কেন?

আতরের মাথা আর কাজ করে না। এই প্রশ্নের জবাব তার জানা নেই। এমনকি আন্দাজ করতে গিয়েও হিমশিম খেলো।

*

পালিয়ে যাবার তাড়না বোধ করলেও ছফা কিছু করার আগেই দেখতে পেলো বোবা দারোয়ান তার ডানদিক দিয়ে চলে গেলো সরু প্যাসেজটার দিকে। সে মোটেও তার দিকে ছুটে আসছিলো না। ভাগ্য ভালো, ঝোপের আড়াল থেকে উঠে দৌড় দেবার আগেই বুঝতে পেরেছিলো এটা।

বোবা ভেতরের বাড়িতে চলে যাবার পর হাফ ছেড়ে বাঁচলো সে। তবে নিশ্চিত হতে পারছে না, মুশকান জুবেরি কি আসলেই ঝোপের আড়ালে তার উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে কিনা। যদি টের পেয়ে থাকে তাহলে এমন আচরণ করছে কেন? তবে এটাও ঠিক, আতর আলীর উপস্থিতি জেনে যাবার পরও মহিলা ঠিক এমনটাই করেছিলো, কোনো রকম চিৎকার-চেঁচামেচি করে নি।

এবার তাকে অপ্রস্তুত করে দিয়ে মুশকান জুবেরি টর্চলাইটটা জ্বালিয়ে তার দিকে আলো ফেললো।

ঠিক তার উপরে নয়, তার থেকে একটু দূরে, ডানে-বামে! ঝোপের আড়াল থেকে ছফা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মহিলার ঠোঁটে মুচকি হাসি। গোরখোদক ফালু গর্তটা প্রায় ভরে ফেলছে মাটি দিয়ে। দৃশ্যটা সে দেখতে পেয়ে একটু থেমে তাকালো ঝোপের দিকে। কিছু বললো মুশকান জুবেরিকে। মহিলা মুচকি হাসি দিয়ে মাথা দুলিয়ে জবাব দিলো। তবে কী বলছে সেটা তা দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না।

কয়েক মুহূর্ত ভেবে ছফা আর কোনো ঝুঁকি নিলো না। বসা অবস্থায়ই আস্তে করে একটু পিছিয়ে গেলো, তবে তীক্ষ্ণণ নজর রাখলো মুশকান জুবেরির দিকে। এভাবে আরেকটু পেছনে সরে গিয়ে উপড় হয়ে থেকেই ঘুরে আস্তে আস্তে প্যাসেজটায় ঢুকে পড়লো, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দ্রুত পা চালিয়ে বাড়িটার পেছন দিককার আঙিনার কাছে কাছে চলে গেলো। সে। মাত্র কয়েক গজ সামনে এগোতেই চমকে গেলো। অল্পের জন্যে মুখ দিয়ে অস্ফুট একটি আর্তনাদ বেরিয়ে যাচ্ছিলো প্রায়। কয়েক মুহূর্ত জমে রইলো বরফের মতো।

তার সামনে, মাত্র দশ গজ দূরে পাকা আঙিনার উপরে এক তরুণী। বসে আছে। তার পাশে পিতলের থালা, তাতে কিছু খাবার আর পানিপাত্র। মৃদু চাঁদের আলোতেও চকচক করছে ও দুটো। মেয়েটা বিন্দুমাত্র না চমকে পিটপিট করে তাকিয়ে আছে তার দিকে!

ছফা ভড়কে গিয়ে আস্তে করে কয়েক পা পিছিয়ে গেলো। মেয়েটা অন্ধকারে তাকে চিনতে পারছে না, কিন্তু বোঝার চেষ্টা করছে। এক পা দু পা করে বেশ কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো সে। ভালো করেই জানে এরপর কি হবে। মুশকান জুবেরি যেটা করে নি এই মেয়ে সেটাই করবে-তারস্বরে চিৎকার দিয়ে ‘চোর চোর’ বলে চেঁচিয়ে উঠবে এখনই।

কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে মেয়েটা কিছুই করলো না। গাছের আড়াল থেকে আস্তে করে উঁকি মেরে দেখলো ছফা। দৃশ্যটা তাকে বিস্মিত করলো আরেকবার : আঙিনায় বসে থাকা তরুণী আপন মনে মাথার চুলে বিলি কাটছে আর গুনগুন করে কোনো লোকজ গান গাইছে! যেনো একটু আগে সে কিছুই দেখে নি!

গাছের আড়ালে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো সে। টের পেলো তার গা কাটা দিয়ে উঠেছে। চোখের সামনে ভুত দেখলেও এতোটা ভয় পেতো কিনা সন্দেহ।

এই বাড়িতে কী হচ্ছে এসব? এরা সবাই এমন কেন?!

তার এই ভাবনাটা বাধাগ্রস্ত হলো কারোর পায়ের শব্দে। চমকে পেছনে। ফিরে তাকালো সে। দুই দেয়ালের মধ্যে যে প্যাসেজটা আছে সেখান দিয়ে টর্চের আলোকরশ্মির আভা দেখতে পেলো। মুশকান জুবেরি আসছে!

কয়েক মুহূর্ত পরই ধীরপায়ে মিসেস জুবেরি বেরিয়ে এলো প্যাসেজটা দিয়ে। ডানে-বামে কোথাও না তাকিয়ে সোজা চলে গেলো বাড়ির দিকে। আঙিনায় উঠেই ঐ মেয়েটাকে কিছু বললো কিনতু সেটা বোঝা গেলো না। মেয়েটা খাবারের থালা আর পানিপাত্র রেখেই চুপচাপ উঠে মুশকান জুবেরির সাথে সাথে বাড়ির ভেতরে চলে গেলো।

ঝোপের পেছনেই বসে রইলো ছফা। গোরখোদক ফালু এখনও পুকুরপাড়ে আছে সম্ভবত সেও চলে আসবে এক্ষুণি।

তাই হলো। দুই-তিন মিনিট পরই ওখানে আলোর বন্যা বইয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলো একজন। ফালুর একহাতে সেই গ্যাস-বাতি, অন্যহাতে গামছা, ওটা দিয়ে মুখে-গলায় ঘাম মুছতে মুছতে জমিদার বাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এখন তার গায়ে একটা শার্ট চাপানো। সম্ভবত ওটা খুলেই মাটি খোরা

আর ভরাটের কাজ করেছিলো, কাজ শেষে আবার পরে নিয়েছে।

ফালু ঝোপটা অতিক্রম করতেই হাফ ছেড়ে বাঁচলো ছফা। এখন জোর পুকুরটার পাশ দিয়ে এ বাড়ির বাইরে যাবার চেষ্টা করবে সে। তার ধারণা। ওদিক দিয়ে অবশ্যই বের হবার কোনো রাস্তা আছে। হয়তো তাকে আবারো দেয়াল টপকাতে হবে।

হাইজ্যাক-বাতিটা আঙিনায় রেখে খাবারের থালার পাশে বসে হাতের গামছা দিয়ে মুখ আর গলা মুছতে লাগলো ফালু। পিতলের পানিপাত্রটা যেই হাতে তুলে নিয়েছে গোরখোদক অমনি লাফ দিয়ে উঠলো ছফা। তার ঘাড়ের উপরে কিছু একটা পড়তেই শিরশির করে জ্যাকেটের কলারের ফাঁক গলে ঢুকে পড়েছে ভেতরে। নিজেকে কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারলো না গোরখোদক সঙ্গে সঙ্গে পাত্রটা রেখে ঝোপের দিকে তাকালো। তার চোখেমুখে বিস্ময়। গ্যাস-বাতি হাতে নিয়ে মুখের কাছে তুলে ধরলো সে।

ছফা লাফ দিয়ে উঠে তার শরীরটা মুচড়িয়ে ছোট্ট প্রাণীটার হাত থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করলো কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারলো একটা বড়সড় প্রাণী তাকিয়ে আছে তার দিকে! গ্যাস-বাতির উজ্জ্বল আলোয় চোখ কুচকে ফেললো সে।

"ওই! ওই! ওইহানে কে রে?" চিৎকার দিয়ে বলেই গোরখোদক ফালু গ্যাস-বাতিটা হাতে নিয়ে তেড়ে আসতে লাগলো তার দিকে।

ইতরপ্রাণীর হাত থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা আপাতত বাদ দিয়ে। দেয়ালের প্যাসেজটার দিকে প্রাণপণে ছুটে গেলো ছফা। সে জানে মারাত্মক বিপদে পড়ে গেছে। তার পেছনে ধেয়ে আসছে এমন একজন গোরখোদক যে আজরাইলের মৃত্যুর পরোয়ানার খবর আগেভাগেই টের পেয়ে যায়। কিন্তু এ মুহূর্তে নুরে ছফার কাছে মনে হচ্ছে, লোকটা স্বয়ং মৃত্যুদূত।

.

অধ্যায় ১৩

এতোটা পথ হেঁটে এসে অনেকটাই ক্লান্ত আতর আলী। তার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। হোটেল সানমুনের ম্যানেজারের কথা শুনে তার দিকে সন্দেহের চোখে চেয়ে আছে। ঐ সাংবাদিক নাকি অনেক আগেই হোটেল থেকে বের হয়ে গেছে, আর ফিরে আসে নি। ম্যানেজার অবশ্য জানে না ভদ্রলোক একজন সাংবাদিক।

ঘন্টাখানেক আগে সে নিজে একটা ভ্যানে তুলে দিয়েছে লোকটাকে, তাহলে আবার কোথায় গেলো? এতো রাতে সুন্দরপুরে একা একা ঘুরে বেড়াবে না, এখানকার কাউকে চেনেও না ঐ সাংবাদিক। তাছাড়া রাতের এ সময়ে রিক্সা পাওয়াও মুশকিলের ব্যাপার। কিন্তু ম্যানেজার যখন জানালো, শহরের ঐ ভদ্রলোক তার বাইসাইকেলটা নিয়ে গেছে তখন চিন্তায় পড়ে গেলো। সাইকেল নিয়ে যাবে কোথায়? কী এমন জরুরি কাজ পড়লো যে হঠাৎ করে এতো রাতেই বেরিয়ে পড়তে হলো?

কয়েক ঘণ্টা ধরে তার মাথায় একের পর এক প্রশ্ন এসে ভীড় করছে, জট পাকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু কোনোটারই জবাব পাচ্ছে না। ভেবেছিলো ফালুর ব্যাপারে কিছু তথ্য দিয়ে সাংবাদিককে চমকে দেবে। সে যে আসলেই একজন ইনফর্মার সেটা বুঝতে পারবে নুরে ছফা। সুন্দরপুরের সব খবর তার কাছে আছে-এমন বদ্ধমূল ধারণাটি মারাত্মক হোঁচট খেয়েছে ঐ ডাইনি আর ফালুর কারণে। হারানো গৌরব ফিরে পাবার জন্য ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে আছে।

ম্যানেজারের দিকে তাকালো। তার উপস্থিতি মোটেও পছন্দ করছে না। লোকটা, তবে সাহস করে সেটা প্রকাশও করতে পারছে না। অবাক হলো না আতর। সুন্দরপুরের অনেক মানুষই তার সাথে এমন করে। ম্যানেজারের ডেস্কের সামনে একটা চেয়ারে বসে পড়লো সে। ঠিক করলো ঐ সাংবাদিকের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করবে।

“ইয়ে মানে,” কাচুমাচু হয়ে বললো ম্যানেজার, “সারাদিন ডিউটি কইরা এক্কেবারে টায়ার্ড হয়া গেছি…একটু ঘুমাইতাম…”

“ঘুমান…সমস্যা কি,” নির্বিকার ভঙ্গিতে বললো ইনফর্মার। এক পায়ের উপর আরেক পা তলে আরাম করে বসলো এবার।

“না, মানে…এইটা তো শহরের হোটেল না..সারারাইত খোলা রাখি …বারোটার দিকে বন্ধ কইরা দেই..”

ম্যানেজারের দিকে স্থিরচোখে তাকিয়ে ডেস্কের পেছনে দেয়াল ঘড়িটা দেখে নিলো। “বারোটা তো অহনও বাজে নাই, আপনের বারোটা বাজুক, আমি চইলা যামু।”

আতরের দ্ব্যর্থবোধক কথায় ঢোক গিললো ম্যানেজার। এই হারামজাদা মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি তার বারোটা বাজাতে এসেছে। আর কিছু না বলে চুপ মেরে গেলো সে।

লোকটার দিকে চকিতে চেয়ে মুচকি হাসলো ইনফর্মার। সুরত আলী তার হোটেলটাকে বেশ্যাপাড়া বানিয়ে রেখেছে, রাত গম্ভীর হলেই শুরু হয় মজমা। এই ম্যানেজার যতো গোবেচারা চেহারা করেই রাখুক না কেন সে জানে, লোকটা গভীর জলের মাছ, ডুবে ডুবে জল খায়।

“ব্যবসা কিমুন চলতাছে?”

ম্যানেজার নীচু হয়ে কী যেনো করছিলো, আতরের প্রশ্ন শুনে মুখ তুলে তাকালো। “এই তো…তেমন একটা ভাল না।”

বাঁকাহাসি দিলো সে। “কন কি, ফেরিঘাটের খানকিপট্টিটা তো তুইলা দিছে. অহন তো আপনাগো বিজনেস ভালা থাকনের কথা?”

বিব্রত ভঙ্গি করলো লোকটা। “এইটা খুবই ছোটো টাউন, এইখানে ব্যবসা-বাণিজ্য সব সময়ই মন্দা থাকে।”

"হুনেন, আপনেরে একটা বুদ্ধি দেই, একটু সামনের দিকে ঝুঁকে বললো সে, "খানকিপাড়ার ভুসগি-মাগিগুলারে বাদ দিয়া নতুন কিছু নিয়া আসেন।"

ম্যানেজার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার দিকে চেয়ে রইলো।

"আগের মতো তো আর যাত্রাপালা হয় না...যাত্রাপালার মাইয়াগুলা কাম কাইজও পায় না...ওগোরে হোটেলে তুলেন...পিপড়ার মতো কাস্টমার আইবো।"

ম্যানেজার কিছু বলতে যাবে অমনি পুলিশের একটা জিপ এসে থামলো হোটেলের সামনে। আতর আর ম্যানেজার দু-জনেই জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো।

জিপ থেকে নামলো সাদাপোশাকের এক মাঝবয়সী লোক।

"ওসিসাব?!" বিস্মিত ইনফর্মার দাঁড়িয়ে পড়লো, ম্যানেজারের দিকে তাকালো সে। লোকটা আবারো বিব্রত ভঙ্গি করছে। "আপনে আগে কইবেন নাওসিসাব আইবো?" এ মুহূর্তে এরকম জায়গায় সুন্দরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মুখোমুখি হতে চাইছে না। এমনিতেই এখন ওসির সুনজরে নেই, তার উপরে এরকম জায়গায় দেখা হয়ে গেলে লোকটা যতো না লজ্জায় পড়বে তারচেয়ে বেশি রেগে যাবে তার উপর।

"না, মানে–"।

হাত তুলে ম্যানেজারকে থামিয়ে দিলো সে। লোকটা এখন ডেস্ক ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। "ওসিসাব কি দোতলায় যাইবো?"

"হ।"

আতর আর দেরি না করে গজরাতে গজরাতে সোজা চলে গেলো নীচতলার টয়লেট রুমের দিকে।

*

জোড়-পুকুরের অপর পাড়ে উঁচু ঢিবির নীচে লুকিয়ে আছে ছফা। তার সারা শরীর চুলকাচ্ছে। ঘাড় থেকে পিঠ পর্যন্ত চুলকানির চোটে পুড়ে যাচ্ছে যেনো। সম্ভবত ঝোঁপে থাকা কোনো ছ্যাঙ্গা’ কিংবা ঐ জাতীয় কীট তার ঘাড় দিয়ে পিঠে ঢুকে পড়েছে। তুচ্ছ কীটটা এখনও তার পিঠের কোথাও লেগে আছে, তবে ছফা হাত ব্যবহার করে জ্যাকেটের উপর দিয়ে এমনভাবে ওটাকে পিষে ফেলেছে যে, ভর্তা না-হয়ে যায়-ই না। প্রাণীটা মরে গেলেও তার বিষ ঠিকই ছড়িয়ে দিয়েছে। ছফার ইচ্ছে করছে জ্যাকেট আর শার্টটা খুলে সামনের পুকুরের পানিতে নেমে গোসল করতে কিন্তু এ মুহূর্তে এটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

ঢিবির তালুতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে সে, তার নজর পুকুরের ওপাড়ে। গ্যাস-বাতির আলোয় দেখতে পাচ্ছে জোড়পুকুরটা আসলে দুটো পুকুর নয়, বরং ডিম্বাকৃতির বড় একটি পুকুর, তবে নারী-পুরুষের ঘাট দুটোর মাঝখানে মোটা দেয়াল চলে গেছে পানির মধ্য দিয়ে বেশ কিছুদুর। ফলে ঘাটে গোসল করতে আসা নারী-পুরুষের মধ্যে এক ধররেণর আড়াল তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। ছফার কাছে মনে হলো পুরুষ ঘাটটা ভেঙেচুরে আছে। এটা হয়তো খুব একটা ব্যবহৃত হয় না এখন।

একটু আগে যেখানে মাটিচাপা দেয়া হয়েছে সেখানে গোরখোদক ফালু হাতের বাতিটা উপরের দিকে তুলে ধরে আশেপাশে তাকাচ্ছে, খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে। ছফা যেখানে লুকিয়ে আছে দুর থেকে সেখানেও দেখার চেষ্টা করছে, তবে গোরখোদক পা বাড়াচ্ছে না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে বোঝার চেষ্টা করছে তার অবস্থান।

এমন সময় বোবা দারোয়ান হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো সেখানে। গোরখোদকের সাথে হাত নেড়ে ইশারায় কথা বললো সে। ঘটনা কি জানতে চাইছে। পুকুরের অপরপাড়ের দিকে আঙুল উঁচিয়ে দেখালো ফালু।

ছফা বুঝতে পারছে তাকে এখন সটকে পড়তে হবে, তবে অপেক্ষা করলো ওই দু-জন এরপর কি করে সেটা দেখার জন্য। ওরা এদিকটায় আসতে নিলেই সে দৌড় দেবে। কিন্তু দৌড়ে যাবে কোথায়? ঘন অন্ধকারেও বুঝতে পারছে পুকুরের পুবদিকে সামান্য একটু নীচু জায়গার পরই বড়সড় জলাশয় আছে। সম্ভবত পানির ঠাঁই বেশি হবে না। সাঁতার দিতে গেলেও সেটা হবে বোকার মতো কাজ। আর পানির ঠাই কম হলে তো মহাবিপদ। এরকম জলাশয় দিয়ে দৌড়ে কতোটুকুই বা যেতে পারবে? দুই দু জন তাগড়া যুবক ঠিকই ধরে ফেলবে তাকে।

পুকুরের ওপাড়ে সিদ্ধান্তহীনতায় পড়ে যাওয়া দুই যুবকের দিকে চেয়ে রইলো সে। চকিতে বামদিকে তাকালো। চাঁদের মিয়মান আলোয় দেখতে পেলো, পুকুরের দক্ষিণ দিকে ঝোঁপঝাঁড়ের আধিক্য বেশি। বড় বড় গাছও রয়েছে প্রচুর। সম্ভবত ওখান দিয়ে এগিয়ে গেলেই এই বাড়ি থেকে বের হওয়া যাবে।

ঠিক এ-সময় পুকুরপাড়ে টর্চ হাতে চলে এলো মুশকান জুবেরি। তাকে দেখে বোবা দারোয়ান আর গোরখোদক ছেলেটা এগিয়ে গেলো। দূর থেকে ওদের কোনো কথাই বুঝতে পারছে না ছফা, এমনকি শরীরি ভাষাটাও পড়তে হিমশিম খাচ্ছে। তবে, ফালু আর দারোয়ান কেন তাকে ধরার জন্য এদিকটায় এসে পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে আছে সেটা তার মাথায় ঢুকছে না। ছফাকে আরো বেশি বিস্মিত করে দিয়ে বোবা আর গোরখোদক চুপচাপ ভেতরের বাড়িতে চলে গেলো!

মুশকান জুবেরি টর্চ হাতে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে। তার স্থিরদৃষ্টি ঠিক সেখানে নিবদ্ধ যেখানে ছফা লুকিয়ে আছে। তারপরই ঘুরে চলে গেলো মহিলা।

বলতে গেলে পাঁচ মিনিটের মতো বিবশ হয়ে রইলো সে। মুশকান জুবেরিসহ এই জমিদার বাড়ির কারোর আচরণ বোধগম্য হচ্ছে না তার কাছে। এরা কি স্বাভাবিক মানুষ?

ওরা বাড়ির ভেতরে চলে যাবার পর সুনসান নীরবতা নেমে এলো জোড়পুকুর পাড়ে। যেভাবে ছিলো সেভাবেই পড়ে রইলো সে। যেনো ঘোরের মধ্যে চলে গেছে। তাকে যে এখন পিতৃপ্রদত্ত জীবনটা নিয়ে এখান থেকে পালাতে হবে সে-খেয়াল নেই। তার ঘোর কাটলো অদভুত এক শব্দে। চমকে পেছন ফিরে তাকালো। পেছনের জলাভূমিতে কিছু একটা নড়ছে।

মাছ? সম্ভবত।

মুশকান জুবেরি যে বিভিন্ন ধরণের কৃষিজ ফলনের সাথে জড়িত এটা সে জানে। ক্ষেতে শাক-সবজি, ফলমূল আর পুকুরে মাছ চাষ করে। এমন কি, নিজের বাগানের একপাশে ঔষধি গাছের সংগ্রহও রয়েছে তার। বিপুল জমির প্রায় সবটাই কাজে লাগিয়েছে মহিলা।

কিন্তু তার পেছনে যে প্রাকৃতিক জলাশয়টি আছে ওখানে নিশ্চয় মাছ চাষ করা হয় না। ওরকম মুক্ত জলাশয়ে মাছচাষ করবে কোন বোকা! সে যতোটুক বুঝতে পারছে, পুকুরেই মাছচাষ করা হয়। তাহলে জলাশয়ে ওগুলো কি?

ছফা আস্তে করে তালু দিয়ে নীচে নেমে এলো। পুকুরের পেছন দিকটা বিস্তৃর্ণ নীচু জলাশয় চলে গেছে পুবদিকে। ক্ষয়িষ্ণু চাঁদের আলোয় ভালো করে তাকিয়ে দেখলো তার থেকে দশ-বারো হাত দূরে জলাশয়টি প্রায় পাঁচফুট উঁচু কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে পুকুরপাড় থেকে আলাদা করা হয়েছে। রাতের অন্ধকারে প্রথম দেখায় ওটা চোখে পড়ে নি।

সেই কাঁটাতারের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেলো সে। পানির মধ্যে যে জিনিসটা নড়াচড়া করছে সেটা যেনো উঠে আসছে কাঁটাতারের দিকে। একটু কুঁজো হয়ে ভালো করে দেখলো, সঙ্গে সঙ্গে ভিরমি খেলল সে। এগুলো কী?

.

অধ্যায় ১৪

সুরত আলীর ‘ফাইভ-স্টার হোটেলের টয়লেটে কয়েক মিনিট থেকেই আতরের বমি হবার জোগার হলো। এই হোটেলের নীচতলাটি একদম সস্তা কাস্টমারদের জন্য, ফলে এখানকার সব কিছুই জঘন্য। মশার উপদ্রব যেমন তেমনি টয়লেটের দুরাবস্থা। সুরত আলীর ভাবসাব অনেকটা এমন এসব না পোষালে একটু বেশি টাকা খরচ করে দোতলায় থাকো, কে মানা করেছে?

সস্তার তিন অবস্থা। সুয়ারেজ লাইন জ্যাম হয়ে আছে। হাগা-মুতা সব জমে আছে প্যানে। তার উপরে তিন-চারটা ব্যবহৃত কনডম ভাসছে।

ওয়াক! নাক চেপে কয়েক মিনিট পার করে দিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে। এই সানমুনে আর থাকা যাবে না। এমন কি এর বাইরেও নয়। ওসিসাব একটু ফুর্তি করতে এসেছে। তার ত্রি-সীমানায় থাকার ইচ্ছে নেই আতরের।

হাতে ঘড়ি নেই বলে হোটেল থেকে বের হবার সময় ম্যানেজারের ডেস্কের পেছনে দেয়াল ঘড়িটা দেখে নিলো। রাত ১২টা বাজতে বেশি বাকি নেই, অথচ সাংবাদিক এখনও হোটেলে ফিরে আসে নি। তার কাছে ব্যাপারটা মোটেও ভালো ঠেকছে না। মনের একটা অংশ বলছে, এসব নিয়ে এতো মাথা ঘামিয়ে কী লাভ? ঐ সাংবাদিককে মাত্র দু-দিন ধরে চেনে। এরকম একজনের জন্য এতো দুশ্চিন্তা করার কী আছে। আবার অন্য অংশটা খারাপ কিছুর আশংকা করে কিছুটা উতলা হয়ে উঠছে।

নিজের বাড়িতে ফিরে যাওয়াটা তার জন্য কোনো ব্যাপারই না, এখান থেকে হেঁটে গেলে পাঁচ মিনিটের পথ কিন্তু সেখানে গিয়ে কী করবে? কে আছে তার জন্য? একা মানুষ। রাতের বেলায় ঘরে ঢুকলেই মনে হয় সে দুনিয়াতে সবচেয়ে একলা। সারাদিন এটা-ওটা করে নিজের একাকীত্ব ভুলে থাকা যায় কিন্তু রাত খুবই নির্মম। তাকে সারারাত নিধুম রেখে জানিয়ে দেয়। আদতে সে বড় একা।

এমনিতেও সে রাত-বিরাতে ঘুরে বেড়ায়, যতোটুকু সম্ভব নিজের ঘরে ফিরে যাওয়াটা এড়াতে চায়। থানার সাথে ঝামেলা না-হলে রাত দুটা-তিনটা পর্যন্ত পুলিশদের সাথেই কাটিয়ে দিতো। মুরগি ধরা আর ডিম বের করার কাজে পার করে দিতো সারাটা রাত। মুরগি ধরার কাজ না থাকলে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতো। জুনিয়র এসআই, কনস্টেবলদের সাথে ভাং খাওয়া, বাংলা মদে চুর হওয়া, কখনও কখনও ফেরিঘাটের বেশ্যাপাড়ায় ঢুঁ মারা-সবই করতো। ভালো গাঁজা আর মদ পেলে পুরুষ মানুষের জন্য রাত কাবার করাটা কী আর এমন কঠিন কাজ। তবে আতর একটা জিনিস কখনও খায় না ফেন্সিডিল। হতে পারে সে খুবই নগন্য মানুষ, তাই বলে কাশির সিরাপ খেয়ে নেশা করবে!

এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো সে। সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখলো পেছন থেকে কেউ তার নাম ধরে ডাকছে।

"অ্যাতো রাইতে কই যাও?" ফিরে তাকাতেই রহমান মিয়া বললো তাকে।

"তুমি এতো রাইতে কইথেইকা আইলা?" একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো আতর। রহমান মিয়া সাধারণত রাত দশটার পরই তার চায়ের দোকান বন্ধ করে দেয়। অনেক সময় এগারোটা পর্যন্তও খোলা রাখে, কিনতু কখনও বারোটা পর্যন্ত নয়।

"গেছিলাম একটু পুবপাড়ায়। তমিজের বাপটা আৎখা মইরা গেছে…হে আবার আমার জ্যাঠার সমন্ধি হয়।"

"ও," আর কিছু বললো না আতর। এটা সে মাস্টারের বাড়ি থেকে ফেরার পথেই জেনেছিলো।

"শহরের মানুষটারে দেখলাম কানা-রাইতে সাইকেল নিয়া বাইর হইছে…এখন আবার তুমি এতো রাইতে ঘুরাফিরা করতাছো…ঘটনা কি?"

সাইকেলের কথা বলাতে আতর ভুরু কুচকে ফেললো। "সাইকেল নিয়া কারে দ্যাখছো?"

"এই তো, এটটু আগে তোমার ঐ শহরের লোকটারে সাইকেল চালায়। যাইতে দেখলাম...পরথমে তো চিনবারই পারি নাই...পরে মুখটা দেইখা চিনবার পারলাম।"

ইনফর্মারের মনে আর কোনো সন্দেহ রইলো না, রহমান মিয়া নুরে ছফারে দেখেছে।

"আমি দোকান বন কইরা তমিজের বাপের খবরটা দিতে গেছিলাম মোখলেস আর বেপারিরে...ওগোরে খবর দিয়া ফিরা আহনের সময় দেখলাম ঐ লোক সাইকেল চালায়া যাইতাছে।"

"কই যাইতাছিলো?"

"জোড়পুকুরের দিকে যাইতে দেখলাম।"

নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো আতর। জোরপুকুর মানে জমিদার বাড়ি। ঐ সাংবাদিক তাহলে মুশকান জুবেরির বাড়িতে গেছে! কিন্তু কিভাবে যাবে? সে নিশ্চয় গেটের কাছে গিয়ে বলবে না, আমি একজন সাংবাদিক, মুশকান জুবেরির সাথে দেখা করতে চাই? যদি সেটা করার চিন্তাও করে এতো রাতে নিশ্চয় করাবে না?

"কি ভাবতাছো?"

রহমান মিয়ার প্রশ্নে মাথা দোলালো সে। "না, কিছু না।"

"বাড়িতে যাওনের আগে আরো কিছু আত্মীয়-স্বজনরে খবরটা দিয়া যাই...মরার খবর যতো বেশি মানুষরে জানান যায় ততো বেশি নেকি, বুঝলা?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ইনফর্মার। "যাও, তাইলে নেকি কামাও গিয়া।"

রহমান মিয়া আর কোনো কথা না বলে চলে গেলো।

ফাঁকা রাস্তায় ঘোরের মধ্যে হাঁটতে লাগলো আতর। তাহলে এ কারণেই হোটেলের ম্যানেজারের কাছ থেকে সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়েছে সাংবাদিক। এটা আরো আগেই তার বোঝা উচিত ছিলো। ঐ লোক একটা কাজেই সুন্দরপুরে এসেছে-মুশকান জুবেরির ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়া। সুতরাং সে যদি কোনো কারণে কোথাও গিয়ে থাকে তবে সেটা ঐ মহিলার ব্যাপারেই হবে।

আর কিছু না ভেবে হাটার গতি বাড়িয়ে দিলো সে। শীতের রাত যতো বাড়ে ততোই বাড়ে কুয়াশার তেজ। রাতের এ সময়টাতে ভারি কুয়াশা পড়ছে। আতরের গায়ে পাতলা একটা সোয়েটার। দুই হাত বুকের কাছে ভাঁজ করে শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টা করলো। পায়ের স্যান্ডেল ভেদ করে শীতের হিমবাতাস ঢুকে পড়ছে, তার চেয়ে বেশি ঢুকে পড়ছে লুঙ্গি দিয়ে।

দ্রুতগতিতে হেঁটে কয়েক মিনিটের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের সামনে চলে এলো। হোটেলটা বন্ধ থাকলেও জ্বলজ্বলে সাইনে বিরাট আর ভারিক্কি নামটা নির্জন মহাসড়কের পাশে প্রকটভাবে ফুটে উঠছে বার বার। সেদিকে তাচ্ছিল্যভরে চেয়ে একদলা থুতু ফেললো আতর। রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে মহাসড়ক থেকে নেমে গেলো ছোট্ট রাস্তায়। এই রাস্তাটা চলে গেছে। জমিদার বাড়ির দিকে। তার আশংকা সাংবাদিক ঐ ডাইনির বাড়িতে গিয়ে বিপদে পড়েছে। ফালুর ঘরে যা দেখেছে তা তো মামুলি কিছু নয়। এরকম একটা ছেলে, যে কিনা কবর থেকে লাশ তুলে নিজের ঘরের খাটের নীচে রেখে দেয়, তার সাথে মুশকান জুবেরির যে সম্পর্কই থাকুক সেটা নিশ্চয় ভালো কিছু নয়।

আতরের আরো মনে হলো, জমিদার বাড়িতে তার ঢোকার কাহিনীটা বলার পরই হয়তো সাংবাদিক এরকম সাহস দেখানোর কথা চিন্তা করেছে। গোরখোদক ফালু কেন ঐ মহিলার বাড়িতে ঢুকলো সেটা হয়তো খতিয়ে দেখার জন্য তার মতোই দেয়াল টপকে ঢুকে পড়েছে জমিদার বাড়িতে। কিন্তু শহরের লোকটার কোনো ধারণাই নেই ঐ ডাইনি কতোটা ভয়ঙ্কর।

জমিদার বাড়ির সামনে এসে দর থেকে মেইনগেটের দিকে তাকালো। সে জানে না বোবা দারোয়ান গেটের পেছনে আছে কিনা। দেয়াল টপকে জমিদার বাড়ির ভেতরে ঢোকার কোনো ইচ্ছে তার নেই। সে শুধু দেখতে চায় ভেতরের অবস্থাটা। দেয়াল বেয়ে উঠে বাড়ির ভেতরটা দেখবে বলে বামদিকের সীমানা প্রাচীর ধরে কিছুটা এগিয়ে গেলো। এর আগে যেখান দিয়ে উঠেছিলো সেখানে আসতেই কিছু একটা চোখে পড়লো তার। আবছা আবছা দেখতে পাচ্ছে কিন্তু বুঝতে একটুও অসুবিধা হলো না জিনিসটা কি।

সানমুনের ম্যানেজারের সাইকেলটা সীমানাপ্রাচীরে হেলান দিয়ে রাখা আছে। এরকম জায়গায় সাইকেলটা রাখার একটাই মানে ঐ সাংবাদিক ঠিক এখান দিয়েই দেয়াল টপকে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

হালার সাম্বাদিক করছেটা কি!

*

বিস্ময়লাগা ভয়ের সথে ছফা দেখতে পাচ্ছে কুৎসিত কিছু প্রাণী কাঁটাতারের বেড়ার ওপাশে ছিপছিপে পানিতে নড়াচড়া করছে। প্রাণীগুলোর আকার বেশি বড় নয়। সম্ভবত শিশু অবস্থায় আছে এখন। কিন্তু ওদের মা-বাবারা নিশ্চয় জলাশয়ের মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে!

ছফার মাথায় ঢুকছে না, এসব ভয়ঙ্কর প্রাণী এখানে কেন। এদের তো এখানে থাকার কথা নয়। সেও গ্রামের ছেলে, পনেরো-ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত গ্রামেই থেকেছে। এসএসসি পাস করে ঢাকা শহরে চলে গেলেও গ্রামের সাথে তার সম্পর্ক এখনও অটুট, সুযোগ পেলেই গ্রামে চলে যায়, নদীতে পুকুরে সাঁতার কাটে। কই, কখনও তো এরকম জিনিস দেখে নি।

আতর বলেছিলো মুশকান জুবেরি মাছ চাষ করে, শাক-সবজি আবাদ করে, এমনকি গরুর খামারও দিয়েছে কিন্তু এই জিনিসের কথা বলে নি! আবারো বুঝতে পারলো,

ইনফর্মার কতোটা অজ্ঞ এই রহস্যময়ী মহিলার ব্যাপারে। এর কারণটাও সে ধরতে পারলো- মুশকান জুবেরির সাথে এখানকার সব হোমরাচোমরাদের খাতির-মহিলার ব্যাপারে নাক গলানোর সাহস কেউ রাখে না। আতর আলী ভেবে দেখেছে, এসব ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়ে কোনো লাভ নেই, বরং ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। এখন কিছু টাকা কামাই করার ধান্দা পেয়েছে বলে তাকে সাহায্য করছে মহিলার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে।

মাত্র দশ-বারো গজ দূরে কুৎসিত প্রাণীগুলো ছিপছিপে পানিতে দাপাদাপি করলেও ছফা ওগুলোকে নিয়ে ভয় পাচ্ছে না, তার কারণ কাঁটাতারের বেড়ার জন্য ওরা তার কাছে ঘেষতে পারবে না। তবে তার ভয় হচ্ছে অন্য কারণে–এখান থেকে বের হবার রাস্তাটা কোথায় বুঝতে পারছে। না।

ক্ষয়িষ্ণু চাঁদ হেলে পড়েছে আকাশে। চারপাশে আবারো নজর দিলো সে। তার ধারণা, মহাসড়কটি এই বাড়ির দক্ষিণ দিকে। সড়ক আর বাড়ির মাঝখানে বিস্তৃর্ণ ক্ষেতসহ কিছু নীচু জমি আছে। বাড়ির সীমানাপ্রাচীরের দক্ষিণ দিকেও জলাশয় দেখেছে সে। পুবদিকের জলাশয়ের সাথে দক্ষিণ দিকের জলাশয়ের সংযোগ আছে কি? সে নিশ্চত হতে পারছে না। নিশ্চিত জানা থাকলে ওদিক দিয়েই বের হবার চেষ্টা করতো। তার কেনজানি মনে হচ্ছে জমিদার বাড়িটার তিন-দিক দিয়েই অশ্বখুড়াকৃতির জলাশয় ঘিরে রেখেছে-অনেকটা প্রাচীনকালের দূর্গের মতো। দিল্লির লালকেল্লার তিন দিকেও এরকম পরিখা খনন করা আছে। মুঘল জমানায় ওইসব পরিখাতুল্য জলাশয়ে দানবাকৃতির কুমীর ঘুরে বেড়াতো–একটা প্রাকৃতিক নিরাপত্তা বর্ম!

জমিদার অলোক বসুর বাড়িটিও ঠিক সেভাবে নিরাপদ করে রাখা। হয়েছে। তবে ছফার বিশ্বাস হচ্ছে না, এটা জমিদার অলোকনাথ কিংবা তার বাপ-দাদাদের কাজ। তার দৃঢ় বিশ্বাস, রহস্যময়ী মুশকান জুবেরি বাড়ির তিনদিকে ঘিরে থাকা জলাশয়ে কুমীর চাষ শুরু করেছে নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা গড়ে তোলার জন্য। হয়তো বাড়িটার চারপাশে নীচু ভূমি কিংবা জলাশয় ছিলো আগে থেকেই, মহিলা ওটার সদ্ব্যবহার করেছে মাত্র।

ভালো করে তাকালো চারপাশে। পশ্চিমদিক বাদে জোড়পুকুরের তিনদিকই উঁচু টিবি দিয়ে ঘেরা। গ্রামের ছেলে হিসেবে ছফা জানে এটা করা হয় বন্যার হাত থেকে পুকুরকে রক্ষা করার জন্য। বিশেষ করে নীচু জমি, যেগুলো বন্যার পানিতে তলিয়ে যায় সেখানকার পুকুরের চারপাশ এভাবে উঁচু টিবি দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়। জমিদার বাড়িটি বেশ উঁচুতে বানানো হয়েছে বলে জোড়পুকুরের পশ্চিম দিকটায় টিবি দেবার দরকার পড়ে নি।

পুকুর পাড়ের তিনদিকই সারি সারি নারকেল, সুপারিসহ আরো অসংখ্য গাছে ঘেরা। ছফা পুকুরপাড়ের ঢালের নীচ দিয়ে এগোতে লাগলো। তার বামদিকে সমান্তরালে কাঁটাতারের বেড়া চলে গেছে, ওপাশের প্রাণীগুলো এখনও দাপাদাপি করছে অল্পপানিতে। পুকুরের দক্ষিণ দিকটা ঘন গাছপালায় পরিপূর্ণ। ঝোপের সংখ্যাও বেশি। দেখে মনে হচ্ছে এই অংশটা পরিত্যক্ত কোনো জায়গা। অন্ধকারে দেখতে পেলো কালচে একটা টিবি পুকুরপাড় থেকে দক্ষিণ দিকে হেলে আছে। খুব কাছে যেতেই চোখে পড়লো গাছগাছালির ফাঁকে ভগ্নপ্রায় একটা দালান। ভালো করে তাকালো সে। বুঝতে পারলো একটা পুরনো মন্দির।

এটা তার আগেই বোঝা উচিত ছিলো। এরকম জমিদার অবশ্যই বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে মন্দির বানাবে। এরাও তাই করেছে। তবে দীর্ঘদিন অযত্নে থেকে মন্দিরটা এখন ভগ্নসতুপ ছাড়া আর কিছু না। সেই ভগ্নসতুপের চারপাশে বেড়ে উঠেছে আগাছা, ঝোঁপঝাঁড়, এমনকি বড় বড় গাছ-গাছালি। যুদ্ধের পর জমিদারের সব সম্পতি বেহাত হয়ে যাওয়ার কারণে মন্দিরটা আর ব্যবহার করা হয় নি সম্ভবত। আর মুশকান জুবেরি কয়েক বছর আগে বাড়িটা রেস্টোরেশন করলেও মন্দিরের কিছু করে নি। যে মন্দিরে নিয়মিত প্রার্থনা করা হবে না সেটা অচিরেই বেহাল দশায় পরিণত হবে।

ভগ্নস্তূপটার সামনে শুধু ঝোঁপ-ঝাঁড়ই গজায় নি, বড় বড় গাছপালা জন্মে প্রায় ঢেকে রেখেছে স্থাপনাটি। মাথার উপরে ঝুঁকে আসা গাছের ডালপালা আর ঝোঁপ-ঝাঁড় সরিয়ে

ভগ্নপ্রায় মন্দিরের ভেতরে ঢুকে পড়লো সে। সাপখোরের ভয় করছে না শীতকাল বলে। এ-সময়ে ওইসব জঘন্য আর বিপজ্জনক প্রাণীরা শীতনিদ্রায় থাকে।

একটা শিবমন্দির। আকারে বেশ ছোটো। ফলার মতো তীক্ষ্ণ চূড়াটা ভেঙে যাওয়ায় চেনা যাচ্ছে না। ভেতরের ছোটো কক্ষটি আগাছা আর মাটিতে পরিপূর্ণ। স্থাপনাটির একপাশ দিয়ে সাবধানে পা ফেলে ফেলে ছফা চলে এলো বিপরীত দিকে। হতাশ হয়ে দেখতে পেলো এটাই আসলে মন্দিরের সম্মুখভাগ, আর তার সামনে জলাশয়। নীচু এই জলাশয় চলে গেছে ডানে-বামে আর সামনের দিকে। মন্দিরের সামনের দিকে জলাশয়টি কচুরিপানায় পরিপূর্ণ। খালি চোখে দেখতে পাচ্ছে না পুকুরের পুবদিকের জলাশয়ের সাথে এটা মিশে গেছে কিনা।

খুট করে শব্দ হতেই চমকে উঠলো সে। ঐ কুমীরের বাচ্চাগুলো না তো?! জলাশয়টি যদি বিচ্ছিন্ন না থাকে তাহলে কুমীরগুলো এখানেও চলে আসতে পারে যেকোনো সময়!

দ্রুত ভাঙামন্দির থেকে বের হবার জন্য যে-ই না ঘুরে দাঁড়িয়েছে অমনি ছফার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো।

সামনের ঝোপের মধ্য থেকে একজোড়া জ্বলজ্বলে চোখ চেয়ে আছে তার দিকে!

.

অধ্যায় ১৫

আতর আলী সাইকেলের সিটের উপর থেকে নেমে পড়েছে দ্রুত। এখন দেয়ালের নীচে বসে আছে ঘাপটি মেরে।

একটু আগে দেয়ালের উপর দিয়ে দেখছিলো বাড়িটা কেমন সুনশান। মানুষজন আছে বলে মনে হয় না, কারো কেনো সাড়াশব্দ নেই, শুধু দোতলার একটা ঘর থেকে মৃদু লালচে

আলো দেখা যাচ্ছে। তবে দারোয়ান। ইয়াকুবকে গেটের কাছে না দেখে সে বুঝে গেছিলো ঐ বোবা নিশ্চয় লীলাখেলায় মশগুল। তার তো গেটের পাশেই থাকার কথা। রাতের এ সময় ওখানে না থাকার একটাই মানে-কাজের মেয়েটাকে নিয়ে ওসব শুরু করে দিয়েছে। দৃশ্যটা কল্পনা করে সুড়সুড়ি পেলো না আতর, বরং ঈর্ষায় আক্রান্ত হলো!

দেয়াল টপকানোর কথা ভাবলেও দ্বিধায় পড়ে গেছিলো। স্বল্পপরিচিত কারোর জন্য এতোবড় ঝুঁকি নেয়ার কোনো মানেই হয় না। নুরে ছফা নামের সাংবাদিক তার কাছ থেকে সব শোনার পরও জেনেশুনে ঐ বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। তার যদি কিছু হয় সেজন্যে নিজেই দায়ি হবে। লোকটার কি হয়েছে সে-সম্পর্কে অবশ্য বিন্দুমাত্র ধারণাও করতে পারছে না আতর, তবে খারাপ কিছু হয়েছে বলেই মনে করে সে, তা না-হলে অনেক আগেই ঐ বাড়ি থেকে

বের হয়ে আসতো।

সাইকেলের সিটের উপর দাঁড়িয়ে যখন এসব ভাবছিলো তখনই দেখতে পায় দারোয়ান ছেলেটা বাড়ির পেছন থেকে বেরিয়ে আসছে, আর তার পেছনে ঐ গোরখোদক।

ফালু!

সঙ্গে সঙ্গে সাইকেলের উপর থেকে নেমে দেয়ালের পাশে চুপচাপ বসে পড়ে সে। এই বাড়িতে এতোক্ষণ ধরে হারামজাদা কী করছে! তারচেয়েও বড় কথা, ফালু যদি এখানে এই বেটির বাড়িতে থেকে থাকে তাহলে কবরস্তানে তাকে কে ধাওয়া করলো?!

সত্যি বলতে আতর একটু ভয়ই পেয়ে গেলো। ভুত-প্রেতের ব্যাপারে তার বিশ্বাস একটু অদ্ভুত রকমের-থাকলেও থাকবার পারে! জমিদার বাড়ির গেট খোলার শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে। তার মনে হচ্ছে ফালু বুঝি এখনই চলে আসবে এখানে। সে যে এখানে লুকিয়ে আছে সেটা কেউ জানে না, তারপরও মনের মধ্যে এই ভয়টা কাজ করছে।

ঢোক গিললো ইনফর্মার। ফালুর ভারি পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। সে কি এখানেই আসছে?!

আস্তে আস্তে ভারি পায়ের শব্দটা মিইয়ে গেলে হাফ ছেড়ে বাঁচলো। তার পকেটে ফোন আছে, পাঁচ-ছয় টাকার মতো ব্যালান্সও আছে তাতে কিন্তু সাংবাদিককে ফোন দিতে পারছে না। ওসির হাতে চরথাপ্পড় খাবার সময় ফোনটা তার হাতে ছিলো, ছিটকে মাটিতে পড়ে ডিসপ্লেটা নষ্ট হয়ে গেছে। এখন শুধুমাত্র ইনকামিং ফোন রিসিভ করতে পারে। টাউনের এক মোবাইল মেকানিককে দেখিয়েছিলো, দুমুখ ছেলেটা বলেছে, টাকা খরচ করে এই সস্তা ফোন ঠিক না-করিয়ে নতুন আরেকটা কিনলেই ভালো হয়। কিন্তু নতুন ফোন কিনতে যে টাকা লাগবে সে-টাকা কই? থানায় যেতে পারে না বলে ইনকাম অনেক কমে গেছে, নইলে এই কানা-ফোন নিয়ে কে ঘুরে বেড়ায়!

কী করবে বুঝতে না পেরে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসে রইলো আতর। গাঁজার নেশা পুরোপুরি কেটে গেছে, আরেকটা স্টিক আছে পকেটে, ওটা ধরাবে কিনা বুঝতে পারলো না, এমন কি এখান থেকে ফিরে যাবার সিদ্ধান্তটাও নিতে পারছে না সে। সাংবাদিক যদি ডাইনির বাড়িতে ঢুকে কোনো বিপদে পড়ে থাকে তাহলে তার কীই বা করার আছে, শুধু শুধু বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করা ছাড়া?

অবশেষে ঠিক করলো টাউনে ফিরে যাবে। এখানে সাইকেলটা এভাবে পড়ে থাকলে চোর-বাটপারের খপ্পরে পড়ে যেতে পারে, তারচেয়ে ভালো হবে ওটা নিয়েই ফিরে যাওয়া, তাহলে টাউনে যেমন হেঁটে যেতে হবে না তেমনি বেচারা ম্যানেজারেরও একটা সম্পত্তি রক্ষা পাবে।

সাইকেলের হ্যান্ডেলটা যে-ই না ধরতে যাবে অমনি একটা কথা মনে পড়ে গেলো তার। সাইকেলটা রেখে পকেটে হাত ঢোকালো সে।

*

ছফা প্রথমে ভেবেছিলো ইনফর্মার আতর যে-রকম জ্বলজ্বলে চোখ দেখেছিলো এই বাড়িতে ঢু মেরে সেও বুঝি ঠিক একই জিনিসের দেখা পেতে যাচ্ছে অবশেষে। কিন্তু না, তাকে কয়েক সেকেন্ডের দমবন্ধ করা উত্তেজনা থেকে মুক্তি দিলো চোখ দুটোর মালিক নিজেই!

লেজ গুটিয়ে হারামজাদা পালিয়ে গেলো।

হাফ ছেড়ে বাঁচলো সে। সম্ভবত একটা শেয়াল ভগ্নপ্রায় মন্দিরে বাসা বেঁধেছে।

পুকুর পাড়ে চলে এলো আবার। এখান থেকে বের হওয়াটা তার জন্য যে খুব কঠিন তা নয়। পকেটে মোবাইলফোন আছে, বেশি সমস্যা হলে বাধ্য হয়ে ওটাই ব্যবহার করতে হবে কিন্তু তাতে করে…

ছফার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে তার ফোনটা ভাইব্রেট করে উঠলো। এখানে ঢোকার আগেই রিংটোন অফ করে ভাইব্রেট মোড়ে দিয়ে রেখেছিলো। মন্দির থেকে একটু সরে নীচু হয়ে বসে পড়লো সে, পুকুরের ওপাড় থেকে কেউ যেনো তাকে দেখতে না পায় সেজন্যে।

ডিসপ্লেতে কলার-আইডি দেখে বিষম খেলো।

আতর আলী??

এতো রাতে সে কেন ফোন দেবে? তার নাম্বারই বা পেলো কোত্থেকে? যতোদূর মনে পড়ে, ইনফর্মারকে সে তার ফোন-নাম্বার দেয় নি। দ্রুত কলটা রিসিভ করতেই কণ্ঠটা ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো :

"আপনে কই? ঠিক আছেন তো?"

"আপনি…আমার নাম্বার পেলেন কোথায়?"

“তার আগে কন, আপনে কি ঐ বেটির বাড়িতে হান্দাইছেন নি?”

ছফা খুবই অবাক হলো। “আ-আপনি কি করে জানলেন আমি…মানে, আমি ঐ-”

“আপনের কি মাথা খারাপ হয়া গেছে!” ছফাকে মাঝপথে থামিয়ে দিলো ইনফর্মার, “আমি কেমনে জানলাম হেইটা জরুরি না…আগে কন, এহন কই আছেন? ঠিকঠাক আছেন তো?”

কথাটা বলার আগে ঢোক গিলে নিলো সে। “আ-আমি তো…জোড়পুকুর পাড়ে… মানে, জমিদার বাড়ির ভেতরে আটকা পড়ে গেছি।”

“কি??” বিস্মিত আতর বলে উঠলো। “ওরা আপনেরে আটকায়া রাখছে!?”

“আরে না..ধরা পড়ি নি..আমি পুকুরপাড়ে ঢুকে পড়েছি…এখন বের হতে পারছি না।”

“আপনেরে ওরা কেউ দেহে নাই? কেউ কিছু টের পায় নাই?!” ইনফর্মার খুবই অবাক।

গভীর করে দম নিয়ে নিলো ছফা। “অনেক ঘটনা আছে। সবই বলবো, তবে এখন না। আগে আমাকে এখান থেকে বের হতে হবে। এবার বলেন এখান থেকে কিভাবে বের হবো?”

“আমার ফোনে টাকা নাই….আপনে ফোন দেন। ওপাশ থেকে বললো। আতর।

“ঠিক আছে, দিচ্ছি,” কলটা কেটে দিয়ে ইনফর্মারের নাম্বারে ডায়াল করলো। রিং হতেই রিসিভ করলো সে।

“..আপনে তো ঢুকছেন দেয়াল টপকাইয়া…সাইকেলের উপর উইঠা..না?”

“হুম।” এবার বিস্মিত হলো ছফা। এই লোক এটাও জানে? কিভাবে?

“এহন তো ঐখান দিয়া বাইর হইতে পারবেন না। ফালু হারামজাদা একটু আগে বাইর হয়া গেছে…বোবারে দেখলাম গেটে আইসা বইছে।”

“আপনি কিভাবে দেখলেন?” ছফার কণ্ঠে বিস্ময় সরছেই না।

“আমি এহন ঐ সাইকেলের সামনেই আছি। এটুটু আগে দেওয়ালের উপর দিয়া বাড়ির ভিতরটা দেখছি।”

“বলেন কি?” কথাটা শুনে ছফা নতুন করে মনোবল ফিরে পেলো।

আতর চুপ মেরে রইলো কয়েক মুহূর্ত।

“হ্যালো?”

“আছি তো..ক?”

“এই বাড়ির অন্য কোনো দিক দিয়ে বের হবার রাস্তা নেই?"“

“উমম,” আতর মনে করার চেষ্টা করলো। বর্তমানে জমিদার বাড়ির ভেতরে কোথায় কি আছে সে জানে না। সেই ছোটোবেলায় যখন বাড়িটা পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে ছিলো তখন তারা বন্ধুরা মিলে মাঝেমধ্যে চোর-পলান্তি খেলতো। সেই স্মৃতি থেকে যতোটুকু জানে, বাড়ির ভেতরে জোড়পুকুর আর তার তিনদিকেই রয়েছে জলাশয়। বাইরে থেকে এখনও সেটা বোঝা যায়। তবে আগের মতো গেটটা খোলা থাকে না। কোনো ভাঙা দেয়ালও নেই যে ওখান দিয়ে বের হওয়া যাবে। মহিলা এই বাড়িটাকে শুধু মেরামতই করে নি, একেবারে দূর্গের মতো বানিয়ে ফেলেছে। “আপনে সাঁতার জানেন?” কয়েক মুহূর্ত পর জিজ্ঞেস করলো সে। “জানি..কেন?”

“পুকরের দক্ষিণ দিকে যে ডোবাটা আছে ওইটা সাঁতরাইয়া পার হইতে পারবেন না? পানি কইলাম খুব বেশি নাই…কচুরিপানা দিয়া ভইরা আছে।”

দীর্ঘশ্বাস ফেললো ছফা। ইনফর্মকে কিভাবে খুলে বলে ঐ ডোবাতে ভয়ঙ্কর সব প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে। "ওখান দিয়ে সাঁতরে যাওয়া যাবে না। অন্য কোনো উপায় আছে কিনা বলেন।"

"ক্যান? ওইখান দিয়া সমস্যা কি?"

"অনেক সমস্যা আছে..ওখান দিয়ে আমি কেন, কেউই সাঁতরে পার হতে পারবে না।"

"কন কি?" বোঝাই যাচ্ছে ইনফর্মার অবাক হয়েছে কথাটা শুনে।

"আর কোনো উপায় নেই?"

"এটটু খাড়ান!" ফিসফিসিয়ে বললো আতর।

"কি হয়েছে?" চাপাকণ্ঠেই জানতে চাইলো ছফা।

"একটা গাড়ি আইসা থামছে গেটের সামনে!"

"কি?!" আৎকে উঠলো ছফা। পুলিশ নাকি? হতে পারে। মহিলা নিজে কিছু না করে পুলিশ ডেকে এনেছে। এজন্যেই কি তাকে বাড়ির মধ্যে পেয়েও কিছু করে নি মুশকান জুবেরি?

৪. ফোনটা কানে চেপে রেখে

অধ্যায় ১৬

ফোনটা কানে চেপে রেখেই আতর দেয়ালের সাথে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

জমিদার বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে থেমেছে এইমাত্রহেডলাইট দুটোর উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে আছে মেইনগেটের সামনের অংশ। দারোয়ান গেটের তালা খুলে দিচ্ছে। একটু পরই ঘরঘর শব্দ করে ভারি গেটটা খুলে গেলো।

"আরে না, পুলিশ না," ফোনের অপরপ্রান্তে থাকা ছফাকে বললো সে। "বেটির মালগাড়ি।"

কাভার্ডভ্যানটা এখনও হেডলাইটের আলো জ্বালিয়ে রেখেছে। মেইনগেটটা পুরোপুরি খুলে গেলে আস্তে করে ভেতরে ঢুকে পড়লো ওটা। গাড়ি ঢুকে যাবার পরও দারোয়ান গেটটা টেনে পুরোপুরি লাগালো না, একটু ফাঁক করে রাখলো।

"মালগাড়ি?" ফোনে বলে উঠলো ছফা।

"হ। বেটির এই গাড়িটা হোটেলের মালপত্র টানে।" আতরের চোখ মেইনগেট থেকে সরছে না। একটু দূর থেকে দেখলেও সে বুঝতে পারলো গেটটা পুরোপুরি বন্ধ করা হয় নি। "ঐ গেটটা কইলাম খোলা আছে। এহন আপনে চান্স নিবার পারেন।"

অপরপ্রান্তে ছফা অবাক হলো। "গেট খোলা আছে কেন?"

"গাড়িটা আবার বাইর হইবো এটটু পর।" আতর এটা জানে। এর আগেও রাতের বেলায় এখান দিয়ে যাতায়াতের সময় দেখেছে এই গাড়িটা বাড়ি থেকে বের হচ্ছে। কৌতূহলী হয়ে সে পরদিনই মুশকান জুবেরির হোটেলের এক বাবুর্চির কাছে জানতে চেয়েছিলো। ঐ লোকটার সাথে বেশ ভালো খাতির ছিলো তার। গতবছর সে হোটেলের চাকরি ছেড়ে টাউনের শেষ মাথায় নিজেই একটা হোটেল দিয়ে বসে কিন্তু ডাইনিটার মতো সুস্বাদু আর জাদুকরী খাবার বানাতে পারে নি। সেই লোক আতরকে বলেছিলো, মাঝরাতে জমিদার বাড়ি থেকে পরদিনের সমস্ত মাল-মসলা আর কাঁচা খাবার নিয়ে আসা হয়।

"ঐ গাড়িটা মালপত্র নিয়া..ধরেন, পনেরো-বিশ মিনিটের মইদ্যে বাইর হয়া যাইবো।"

ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে কোনো কথা ভেসে এলো না। সম্ভবত, সাংবাদিক ভাবছে মালপত্র নিয়ে গাড়িটা চলে গেলেই বা কী?

"আপনে এই চান্সে বাড়ি থেইকা বাইর হয়া যান," আর তার কথা শেষ করলো।

"কিভাবে?"

"আমি দেওয়ালের উপরে উইঠা আপনেরে ডাইরেকশন দিমু...ক্যাঠায়। কোনখানে আছে কমু...আপনে বাও বুইঝা আগাইবেন, বুঝলেন?"

অপর প্রান্তে নুরে ছফা কতোটা বুঝতে পারলো কে জানে।

"হ্যালো? বুঝছেন?" সাংবাদিক চুপ মেরে আছে বলে তাড়া দিলো সে।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আছি," তড়িঘড়ি বললো ছফা, "কিন্তু ঐ মহিলা আর কাজের মেয়েটা...ওরা তো দেখে ফেলতে পারে?"

“আপনে না কইলেন হেরা আপনেরে দেখছে?”

আতরের মোক্ষম প্রশ্নে কয়েক মুহূর্তের জন্য জব্দ হয়ে গেলো ছফা। “হ্যাঁ, মানে, তা দেখেছে কিন্তু...”

“তাইলে আর পবলেম কি..জলদি বাইর হয়া যান। আমি সাইকেলের উপরে উঠলাম... আপনে বাও বুইঝা আগাইতে থাকেন...?”

“ঠিক আছে।”

আতর ফোনটা বুক পকেটে রেখে সাইকেলের সিটের উপর দাঁড়িয়ে পড়লো। দেয়ালের উপর দিয়ে তাকালো বাড়িটার ভেতরে। ফোনটা আবার ডানকানে চেপে ফিসফিসিয়ে বলে যেতে লাগলো ছফাকে :

“গাড়িটা কইলাম বাড়ির সামনের দিকে যে দরজাটা আছে সেইখানে রাখছে.ড্রাইভার নিয়া দুইজন...একজন বাড়ির ভিতরে গেলো...ড্রাইভার গাড়িতেই আছে।”

“ঐ বোবা ছেলেটা কোথায়?” অপরপ্রান্ত থেকে চাপাকণ্ঠে জানতে চাইলো ছফা।

“হে তো গেটে নাই..দেহা-ও যাইতাছে না...” তীক্ষ্ণণ চোখে বাড়িটার চারপাশে তাকালো ইনফর্মার। “মনে লয় মলপত্তর টানার কামে হাত লাগাইতাছে।” কয়েক সেকেন্ড পরই তার কথার সত্যতা পাওয়া গেলো। বোবা দারোয়ান আর অন্য একটা ছেলে দু-হাতে কিছু মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে এলো বাড়ির ভেতর থেকে। কাভার্ডভ্যানের পেছনের দরজা খোলাই আছে, ওরা দু জন হাতের মালগুলো গাড়ির ভেতরে রেখে আবার চলে গেলো বাড়ির ভেতরে। এই পুরো ব্যাপারটা ফোনের মাধ্যমে ছফাকে জানিয়ে দিলো আতর।

“তাহলে বোবা ছেলেটা মালপত্র লোড করার কাজে ব্যস্ত?”

"হ, ছফার প্রশ্নে জবাব দিলো সে। "টাইম নষ্ট না কইরা আগাইতে শুরু করেন। হেরা হেগো কাম করতাছে, আপনে আপনের কাম করেন।"

"ঠিক আছে।"

কানে ফোন চেপে রেখে বাড়িটার ভেতরে কড়া নজর রাখলো ইনফর্মার। কাভার্ডভ্যানের ড্রাইভার নিজের সিটে বসে আছে এখনও। বোবা আর অন্য লোকটা বাড়ির ভেতরে যাবার পর আর বের হয়ে আসে নি।

"আগান," তাড়া দিলো আতর। "একদম ক্লিয়ার আছে। বোবা আর। হোটেলের পোলাটা ভিতরে ঢুকছে..."

ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে কোনো জবাব এলো না। "হ্যালো?"

সাড়া নেই।

কান থেকে ফোনটা সরিয়ে ডিসপ্লের দিকে তাকালো। নষ্ট ডিসপ্লে দেখে কিছুই বোঝা সম্ভব নয়। আবারো কানে লাগিয়ে শোনার চেষ্টা করলো সে। কোনো আওয়াজ নেই। মনে হচ্ছে না লাইনে কেউ আছে। চিন্তিত হয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো আতর। সাংবাদিক লাইন কেটে দিয়েছে? না, কেটে দেবার কথা নয়। হয়তো এমনিতেই লাইনটা কেটে গেছে। একটু পর আবার ফোন করবে।

কয়েক মিনিট চলে গেলেও তাকে ফোন করা হলো না। বোবা আর অন্য লোকটা এরমধ্যে দু-বার মালপত্র লোড করে গেছে। সাইকেলের সিটের উপরে দাঁড়িয়ে থেকে বিরক্ত হয়ে উঠলো আতর। ঘটনা কি বুঝতে পারছে না। সাংবাদিক নিজের দরকারেই তার সাথে যোগাযোগ করার কথা, কিনতু তার দিক থেকে কোনো সাড়া-ই নেই। বিরক্তির পাশাপাশি একটা খারাপ আশংকাও জাগলো মনে। লোকটা বের হবার চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলো না তো?

*

পুকুরপাড় থেকে দুই দেয়ালের মাঝখানের প্যাসেজ দিয়ে আবারো মূল বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছে ছফা। তার মেজাজ যারপরনাই খারাপ। একটু আগে আতরের সাথে কথা বলার সময়ই মোবাইলফোনটার চার্জ শেষ হয়ে গেছে! বিপদের সময় সব কিছুই বিরুদ্ধে চলে যায়, নইলে ফোনটা ঠিক এ সময় কেন এমন করবে। ছফা অবশ্য জানে ভুলটা তারই হয়েছে। খুব একটা চার্জ না দিয়েই হোটেল থেকে বের হয়ে গেছিলো। তখন তো আর বুঝতে পারে নি কোনভাবে এখানে এতোক্ষণ আটকে থাকবে।

যাইহোক, ঐ ইনফর্মার নিশ্চয় সাত-পাঁচ ভেবে যাচ্ছে কিন্তু এ মুহূর্তে ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর অবকাশ নেই। তাকে এখন দ্রুত এই বাড়ি থেকে বের হতে হবে। সতর্ক পদক্ষেপে বাড়িটার পেছনের বাগান পেরিয়ে গেলো সে। তাকে কেউ দেখে ফেললে কি হবে তা নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাচ্ছে না। ওরা যা দেখার এরইমধ্যে দেখে ফেলেছে, যা বোঝার তাও বুঝে নিয়েছে।

বাড়ির পেছনে পাকা আঙিনাটার পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখতে পেলো দোতলার একটা ঘরে বাতি জ্বলছে। ফোনটা চালু থাকলে বুঝতে পারতো দারোয়ান আর অন্য দু-জন লোকের অবস্থান কোথায়। ঝুলন্ত প্যাসেজটার নীচ দিয়ে বাড়ির সামনের অংশে আসতেই বাম দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো কাভার্ডভ্যানটা দাঁড়িয়ে আছে মূল ভবনের সদর দরজার সামনে। ভ্যানের পেছনের দরজা খোলা, ভেতরে কিছু মালপত্রও চোখে পড়ছে।

সীমানাপ্রাচীরের যেখানটা দিয়ে সে ঢুকেছিলো সেদিকে তাকালো। অন্ধকারে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। একটা বড় গাছের ডালপালা ঝুঁকে আছে দেয়ালের দু-দিকেই। আতর আলী যদি এখনও থেকে থাকে তাহলে সম্ভবত তাকে দেখতে পাবে। সে হাত নাড়লেও কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না। আতর সম্ভবত দেয়াল থেকে নেমে গেছে। তার ফোন কেটে যাবার পর ইনফর্মার নিশ্চয় বেশিক্ষণ অপেক্ষা করে নি। এমনটি যখন ভাবছে ঠিক তখনই দেখতে পেলো দেয়ালের উপরে একটা ঝুলন্ত ডাল নড়ে উঠছে।

বুঝতে পারলো ছফা। ইনফর্মারের কাণ্ডজ্ঞান বেশ ভালো। সাহস করে। এক পা এগিয়ে গেলো সে। এখন সে পুরোপুরি উন্মুক্ত। বাড়ির ভেতর থেকে কেউ বেরিয়ে এলে তাকে দেখে ফেলতে পারে, তারপরও ঝুঁকি নিলো। গভীর করে দম নিয়ে, কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা এগিয়ে গেলো মেইনগেটের দিকে। গেটের কাছে চলে আসতেই হাফ ছেড়ে বাঁচলো। গেটটা আধভেজানো। যেটুকু ফাঁক আছে তার মধ্য দিয়ে অনায়াসেই বের হয়ে যেতে পারবে।

নুরে ছফা যে-ই না গেট দিয়ে বের হয়ে যাবে অমনি শুনতে পেলো। চিৎকারটা।

"ওই? কে?!"

.

অধ্যায় ১৭

মাঝরাত, চারপাশে বেশ অন্ধকার, তার উপরে গ্রামের এবড়োখেবড়ো পথ, সেই পথ দিয়ে প্রাণপণে দৌড়াতে গিয়ে ছফার অবস্থা কাহিল হয়ে গেলো।

জমিদার বাড়ির মেইনগেট থেকে এক দৌড়ে মহাসড়কে চলে আসাটা চাট্টিখানি কথা নয়। তাকে উদ্দেশ্য করে চিৎকারটা দিতেই সে আর এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করে নি, পেছনে কে ধাওয়া দিলো সেদিকেও খেয়াল করে নি। ভো-দৌড় বলতে যা বোঝায় সে তাই করেছে। জমিদার বাড়ি থেকে অনেক দূরে আসার পর ক্ষণিকের জন্যে পেছনে ফিরে তাকিয়েছিলো, কাউকে দেখে নি। দৌড়ানোর সময়ও তার মনে হয়েছিলো কেউ তার পিছু নেবে না। এতোক্ষণের অভিজ্ঞতায় বুঝে গেছে, এই বাড়ির লোকগুলো স্বাভাবিক আচরণ করে না। সবাই যা করে এরা করে তার ঠিক উল্টোটা। নিজের বাড়িতে অনাহূত একজনকে আবিষ্কার করার পর কেউ এরকম অদ্ভুত আচরণ করবে?

অবিশ্বাস্য!

সড়কের উপর এসে থামলো সে। দম ফুরিয়ে হাফাচ্ছে। হাটুর উপরে দু হাত রেখে উপুড় হয়ে দম নিতে লাগলো। ইচ্ছে করছে কালো পিচের রাস্তায় বসে পড়তে। বহু কষ্টে বুকের লাফানোটা স্বাভাবিক করতে পারলো। টের পেলো পা দুটো কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেছে। তার পায়ের মাংসপেশিগুলো এরকম ভো দৌড়ের জন্য মোটেও অভ্যস্ত নয়। বিগত পাঁচ বছরে এরকম দৌড়াতে হয়েছে বলে মনে করতে পারলো না।

সড়কের দিকে তাকালো। একেবারে ভুতুড়ে। মানুষজন তো দূরের কথা রিক্সা-ভ্যানও দেখা যাচ্ছে না। এখন তাকে দু-মাইল হেঁটে হোটেলে ফিরে যেতে হবে, ভাবতেই গা গুলিয়ে উঠলো। টুং-টাং শব্দ শুনে পেছনে ফিরে তাকালো সে। সড়ক থেকে নেমে যাওয়া কাঁচা রাস্তাটা দিয়ে একটা সাইকেল আসছে তার দিকে।

সোজা হয়ে দাঁড়ালো ছফা, হাফ ছেড়ে বাঁচলো।

"একদৌড়ে এইহানে আইসা পড়ছেন!" সাইকেলটা তার পাশে থামিয়ে বললো আতর। ঐ ড্রাইভার ভো গেটের বাইরেই যায় নাই।" "ওটা ডাইভার ছিলো?"

"হ" আতর সাইকেল থেকে নেমে পড়লো।

ছফা কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলো। বহু দূরে দেখতে পেলো জমিদার বাড়ির দিক থেকে এগিয়ে আসছে একজোড়া হেডলাইট।

কাভার্ডভ্যানটা!

আতরও দেখতে পেলো। "চলেন, গাড়িটা আহোনের আগে ফুইটা পড়ি।"

"আপনি ডাবল চালাতে পারবেন?"

"পারুম।"

ইনফর্মার সাইকেলের সিটে বসতেই তার সামনে রডের উপরে বসে পড়লো ছফা।

“সমস্যা নাই,” প্যাডেল মারার আগে বললো। “গাড়িটা আমাগো পিছনে লাগবো না... ওইটা হোটলে যাইবো।”

তাদের সাইকেলটা মহাসড়কের উপর দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে যেতে লাগলো। ছফা পেছন ফিরে দেখতে পেলো কাভার্ডভ্যানটা এখনও সড়কে উঠে আসে নি। রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করার সময় আলতো করে হাফ ছাড়লো সে।

*

রকিংচেয়ারে বসে দোল খেতে খেতে গভীর ভাবনায় ডুবে আছে মুশকান জুবেরি। মাঝরাত। সুন্দরপুর ঘুমিয়ে পড়েছে অনেক আগে। এমনিতেই এখানকার লোকজন নটা-দশটার পরই ঘুমিয়ে পড়ে, শীতের রাতে এই সময়টা আরেকটু এগিয়ে আসে। গত কয়েক বছর ধরে এখানে থাকলেও দেরি করে ঘুমানোর অভ্যেস তার যায় নি, তবে আজ আরো দেরি করে ঘুমাবে। এর কারণ একটা চিন্তা মাথায় গেঁড়ে বসেছে।

তার বাড়িতে অনাহূতভাবে একজন ঢুকে পড়েছিলো আজ। এমন নয় যে, এরকম ঘটনা এই প্রথম ঘটলো। সুন্দরপুরে তার আগমণের পর থেকে চার পাঁচবার এমন ঘটনা ঘটেছে। আর প্রতিবারই সে মোকাবেলা করেছে। ভিন্নভাবে, এরফলে কাজও হয়েছে দারুণ। ঐ লোকগুলো আর এই বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে ঢোকার সাহস করেনি।

ওরা সবাই ছিলো গ্রামের কৌতূহলী মানুষ, যাদের কাছে তার মতো। একজন মেয়েমানুষ স্বাভাবিক কারণেই আগ্রহের বিষয় হয়ে ওঠে। কিন্তু আজকের লোকটা সে-রকম কেউ নয়, এ-ব্যাপারে সে পুরোপুরি নিশ্চিত। লোকটাকে সে আগেই দেখেছে রবীন্দ্রনাথে। মানুষের কৌতূহলী দৃষ্টি তার চোখ এড়ায় না। একঝলক লোকটার চোখ দেখেই সে বুঝে গেছিলো নিছক খাওয়া-দাওয়ার উদ্দেশ্যে সে আসে নি। এখন প্রমাণিত হলো তার ধারণাই ঠিক। সত্যি বলতে, এরকম ঘটনার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতই ছিলো। লোকটাকে নিজের

হাতের মুঠোয় পেয়েও সে তার মতো করেই সামলেছে। কিন্তু একটা ব্যাপার অস্বস্তি তৈরি করেছে তার মধ্যে-লোকটা কে সে জানে। এমনকি সে নিশ্চিত হতে পারছে না তার কি উদ্দেশ্য। অবশ্য কয়েক মুহূর্তের জন্য তার মনে হয়েছিলো ঐ আসাদুল্লাহ বুঝি তার শয়তানি শুরু করেছে। সে তো ইনিয়ে-বিনিয়ে বলেছেই, তাকে অসন্তুষ্ট করে সুন্দরপুরে কেউ স্বস্তিতে থাকতে পারে না। কিন্তু এখন সে নিশ্চিত, ঘটনা অন্য কিছু।

তার অদভুত আর স্বনামখ্যাত রেসটুরেন্টের ব্যাপারে অনেকেই আগ্রহী। তার তৈরি করা রেসিপিগুলোর গোমড় নিয়েও অনেকে কৌতূহলী কিন্তু এই লোকটাকে সে-রকম কিছু বলেও মনে হচ্ছে না। খাবারের প্রতি এর তেমন আগ্রহ নেই।

গভীর করে নিঃশ্বাস নিলো। আগামীকালের মধ্যেই লোকটার পরিচয় আর উদ্দেশ্য জানতে হবে তাকে। বিপদের গন্ধ পাচ্ছে সে।

রকিংচেয়ারের পাশে কফি টেবিলের দিকে হাত বাড়ালো। মোবাইলফোনটা তুলে নিয়ে একটু দ্বিধায় পড়ে গেলে যেনো, তবে সেটা কয়েক মুহূর্তের জন্য। অবশেষে একটা নাম্বারে ডায়াল করলো।

.

অধ্যায় ১৮

আতর আর ছফা হোটেল সানমুনের রুমে বসে আছে। কয়েক মুহূর্ত ধরে তাদের মধ্যে কোনো কথা হচ্ছে না। একে অন্যের কাছ থেকে আজ রাতের অবিশ্বাস্য ঘটনা শোনার পর দু-জনেই বিস্মিত। তবে আতর তার অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা সবটা বললেও ছফা খুব কমই বলেছে। বিশেষ করে ফালু আর বোবা ইয়াকুব যে কিছু একটা মাটিচাপা দিয়েছে মুশকান জুবেরির উপস্থিতিতে, সেটা ইচ্ছে করেই বলে নি। সে চাচ্ছে না এ-মুহূর্তে এতো বড় একটা সত্য অন্য কেউ জেনে যাক।

“বেটি কুমীর পালে কেন?” অবিশ্বাসভরা কণ্ঠে বললো ইনফর্মার।

“আপনি এটা জানতেন না?” ছফার কণ্ঠে দ্বিগুণ অবিশ্বাস।

ঠোঁট উল্টালো আতর।

মুশকান জুবেরি কেন কুমীর পালে সেটাতে যতোটা না অবাক হচ্ছে তার চেয়ে বেশি অবাক হচ্ছে এই পুরো ব্যাপারটা আতর আলীর মতো। একজন মানুষ জানে না বলে। “বলেন কি!”

“ঐ ডাইনি তার বাড়ির ভিতরে কি করে না করে সেইটা তো বেবাক্তে জানোনের কথা না,” সাফাই গাওয়া শুরু করলো সে। “হে মাছ চাষ করে জানতাম...মুরগি আর গরু-বকরির খামারও আছে কিন্তু...”।

ছফা কিছু বললো না। সে আগেই বুঝে গেছে, মুশকান জুবেরির ব্যাপারে এখানকার কেউই তেমন কিছু জানে না, এমন কি বিবিসি বলে খ্যাত আতর আলীও যৎসামান্যই জানে।

“ফালুর ব্যাপারটা কি করবেন?” সঙ্গত কারণেই আতর প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাইলো। যে বিষয়ে তার জানাশোনা নেই সে বিষয় নিয়ে আলাপ করতে চাচ্ছে না।

“ফালু?” আস্তে করে বললো ছফা। একটু আগে আতরের কাছ থেকে সব শোনার পর এ-ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছে না। গোরখোদক তার অ্যাডভান্স কবর নাকি লাশ ছাড়াই ভরাট করে ফেলেছে, আর তার ঘরের খাটের নীচে রেখে দিয়েছে লাশের কঙ্কাল! ঘটনা আসলেই রহস্যজনক। কিন্তু এ মুহূর্তে ঐ গোরখোদককে নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাচ্ছে না সে। মুশকান জুবেরিই তার প্রধান লক্ষ্য। ফালুর ব্যাপারটা পরে। দেখা যাবে। কিংবা কে জানে, ঐ মহিলার রহস্য উন্মোচিত হলে তার কোনো দরকারই হয়তো পড়বে না-এক ঢিলেই দুই পাখি মারা পড়বে।

“ফালু নিজের খাটের নীচে লাশ রাখে ক্যান?” তাড়া দিয়ে বললো আতর। “লাশ লইয়া হে করেটা কী!”

এ প্রশ্নেরও জবাব দিলো না ছফা। নিজের চোখের সামনে এরচেয়েও বড় কিছু ঘটতে দেখেছে সে।

“ঐ ডাইনির লগে ফালুর কি সম্পর্ক?”

“ফালু আসলে ওর ঘরে কি রেখেছে-কেন রেখেছে সেটা আগে জানতে হবে,” গম্ভীরকণ্ঠে বললো।

ফ্যাকাশে মুখে তাকালো আতর। সে ভেবেছিলো নুরে ছফা তার কাছ থেকে ফালুর ঘটনা শুনে বিনাবাক্যে সব বিশ্বাস করবে।

ছফা দেখলো লোকটার চোখেমুখে এখনও বিস্ময়ের অভিব্যক্তি মিইয়ে যায় নি। এই ইনফর্মারকে যতোটুকু বলেছে তাতেই সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। এখন তার মনে হচ্ছে ওকে কিছু না বললেই বেশি ভালো হতো। হয়তো ভয় পেয়ে নিজেকে গুটিয়ে নেবে পুরোপুরি, তাকে আর সাহায্য করার সাহস দেখাবে না। পরক্ষণেই তার মনে হলো, এতে এমন কোনো সমস্যাও হবে না। সম্ভবত মুশকান জুবেরির ব্যাপারে খুব বেশি সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না এই লোক। তাকে যেটুকু সাহায্য করার তা ভালোমতোই করেছে। এরচেয়ে বেশি কিছু করার সাধ্য নেই তার।

“আপনেরে মুঠির মইদ্যে পায়াও কিছু করলো না?!” ইনফর্মার বিস্ময়ের ঘোরের মধ্যেই প্রশ্নটা করলো।

“আপনার সাথেও কিন্তু একই কাজ করেছিলো মহিলা,” মনে করিয়ে দিলো সে।

"হ, তাও তো ঠিক।" আতর আলী আরো বেশি ধন্দে পড়ে গেলো। "আপনেরে আমি কইছিলাম না ঐ বেটি একটা ডাইনি...এইবার দেখলেন তো!"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। "ডাইনি কিনা জানি না তবে মহিলার অনেক গোমড় রয়েছে। আমাকে এর সবটা জানতে হবে।"

ছফার দিকে ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো আতর। "এইসব জাইনা কী করবেন? পেপারে লিখবেন? লিখা কী হইবো?" মাথা দোলালো সে। "কিছু হইবো না। আমাগো এমপি ঐ বেটির ভাউড়া হয়া গেছে...দেখবেন, বেটি বিপদে পড়লেই হমুন্দিরপুতে আইসা হাজির হইবো।"

"মা" ছফাও এটা হিসেরের মধ্য রেখেছে। যখনই জানতে পেরেছে এমপর সাথে মহিলার সম্পর্কের কথা তখনই সে বুঝে গেছিলো ব্যাপারটা মোটেও সহজ হবে না, এক পর্যায়ে এমপি জড়িয়ে পড়তে পারে।

"আমাগো এমপি কইলাম মানুষ ভালা না." চাপাকণ্ঠে বললো আতর। "মানুষ মাইরা নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হের বাপ-দাদাগো খাইসলত আছিলো...গেঞ্জিগোলের সময় হের বাপে পিচকমিটি করছে...বহূত মানুষ মারছে। এমপিও কম যায় না। কয়টারে গুম করছে...মাটির নীচে পুইতা মারছে, জানেন?"

"আপনি কি ভয় পাচ্ছেন?" বাজিয়ে দেখার চেষ্টা করলো ছফা।

বিব্রত হয়ে ঢোক গিললো ইনফর্মার। "আরে, আমি ডরামু ক্যান..আমি তো কিছু করি নাই। আমি ডরাইতাছি আপনেরে নিয়া।"

"আমাকে নিয়ে ভয় পাবার কিছু নেই। ওরা আমার কিছু করতে পারবে না।"

ছফার আত্মবিশ্বাস দেখে মনে মনে বাঁকাহাসি হাসলো আতর। সব সাংবাদিকই এরকম ভাব করে, নিজেদের মহা ক্ষমতাধর ভাবে, কিন্তু ঠেলায় পড়লে বোঝা যায় ওদের আসলে খুব বেশি শক্তি নেই। এরা পারে শুধু দুর্বলের সাথে চোটপাট দেখাতে। হোমরাচোমরাদের খপ্পরে পড়লে হোগার কাপড় মাথায় তুলে দৌড় দেবে!

"আচ্ছা আমার ফোন নাম্বারটা পেলেন কোথায়?"

ছফার প্রশ্নে আতরের চিন্তায় ছেদ পড়লো। গাল চুলকালো সে। "এইটা তো এক্কেবারে সোজা...আপনে আইজকা ফোনে ট্যাকা ভরছেন না? ঐ ফেলেগজি শামসুর লগে আমার আবার হট টেরাম...ওর নম্বরটা তো আমার মুখস্ত...ওরে ফোন দিয়া কইলাম আপনের নম্বরটার কথা।"

"কিন্তু সে কিভাবে আমার নাম্বার জানবে? মানে, ব্যালান্স রিচার্জ করার সময় তো শুধু নাম্বার লেখা হয়..আর এতে নাম্বারের মধ্যে আমারটা-"

"ভুইলা গেছেন দেহি," কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে বললো ইনফর্মার, "আপনে হের লাস্ট কাস্টমার আছিলেন।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ছফা। এবার সে বুঝতে পেরেছে। তারা যখন ফোনে ব্যালান্স ভরতে গেছিলো তখন দোকানটা বন্ধই করে দিয়েছিলো দোকানি, আতরের অনুরোধে দোকান খুলে ব্যালান্স ভরে দেয়। কিনতু তা-ই যদি হবে তাহলেও একটা প্রশ্ন চলে আসে।

"আমরা চলে আসার পর সে দোকান বন্ধ করে চলে গেছিলো না?"

ছফার প্রশ্নে মুচকি হাসলো আতর। "হ। কিনতু হে তো হিসাবের খাতা আর ফোনটা দোকানে রাখে না...বাড়িতে রাখে।"

"ও," আর কিছু বললো না সে। ইনফর্মার যে বেশ চালাক-চতুর সেটা আরেকবার বুঝতে পারলো।

"এহন কি করবেন?"

আতরের দিকে তাকালো। "মানে?"

"কাইল সকালের কথা কইতাছি।"

"ও," হাই তুললো একটা। রাত অনেক হয়েছে, ঘুম পাচ্ছে তার। "ঐ রেস্টুরেন্টের কোনো কর্মচারি কিংবা বাবুর্চির সাথে কথা বলা যাবে? এরকম কারোর সাথে আপনার খাতির আছে?"

একটু গাল চুলকালো ইনফর্মার। "আছে, তয় হে তো এহন কাম করে।"

"কাজ ছেড়েছে কবে?"

"তিন-চাইর মাস হইবো।"

"সমস্যা নেই। ওর সাথে কথা বললেই হবে।"

"ঠিক আছে তাইলে...আমি সকালে চইলা আসুম নে।"

"এগারোটার আগে না...আমি একটু বেলা করে ঘুমাবো। ঠিক আছে?"

"আইচ্ছা।"

আতরকে বিদায় করে দিয়ে বিছানায় অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো ছফা। শরীরটা খুব ক্লান্ত, বিছানায় শুয়ে পড়লেই ঘুম চলে আসবে হয়তো কিন্তু ঘুমাতে পারবে কিনা সন্দেহ, তার

মাথায় ঘুরছে অসংখ্য প্রশ্ন। এইসব প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে ভাবতে ঘুম চলে যাবে। তার বেলায় সব সময় এমনটিই হয়।

জামা-কাপড় না পাল্টেই বাতি নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

মুশকান জুবেরি, তুমি আসলে কী করো?

.

অধ্যায় ১৯

আতর এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে যে ঠিক অচেনা যেমন মনে হচ্ছে না তেমনি পরিচিত বলেও জোর দিয়ে বলতে পারছে না। রাতের কুচকুচে অন্ধকারে চারপাশটা ভুতুরে হয়ে আছে। এখন ঠিক কটা বাজে সেটাও বলতে পারছে না। হাতের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে ফেললো মনে মনে। সে তো কখনই হাতঘড়ি পরে না।

ভুরু কুচকে সামনের দিকে তাকালো, কিন্তু ভারি কুয়াশার চাদর ভেদ করে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, তারপরও কী এক অজানা আতঙ্কে তার বুকটা লাফাচ্ছে। নিজেকে ভ   সনাই করলো। সে তো কখনও এতোটা ভীতু ছিলো না! শার্টের গলা দিয়ে বুকে থুতু দিলো। সাহস করে কয়েক পা সামনের দিকে এগিয়ে গেলো সে। এখন কানে একটা ভোতা শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

ধুপ! ধুপ! ধুপ!

নির্দিষ্ট বিরতি দিয়ে হচ্ছে শব্দটা। সেই শব্দের উৎসের দিকে এগিয়ে গেলো আতর। আশ্চর্যের ব্যাপার, এতো ভারি কুয়াশা পড়া সত্ত্বেও তার মোটেও শীত লাগছে না। কয়েক পা সামনে এগোতেই কুয়াশার চাদর ফিকে হয়ে আসতে শুরু করলো। থমকে দাঁড়ালো সে।

বুকের হৃদস্পন্দনটাও থেমে গেছে যেনো। একটু আগে যেভাবে হাতুড়িপেটা করছিলো সেটা আর হচ্ছে না।

তার সামনে একটা গর্ত!

ঠিক এরকম একটা গর্তেই সাংবাদিক পড়ে গেছিলো। আর সেটা খুরে রেখেছিলো ঐ হারামজাদা ফালু!

ডানে-বামে তাকালো সে। এক পা পিছিয়ে গেলো আনমনেই। তার দম এখনও আটকে আছে। মনের একটা অংশ বলছে এক্ষুণি দৌড়ে চলে যেতে। অন্য অংশটা সাহস সঞ্চয় করার তাগিদ দিচ্ছে। ভয় পেলে চলবে না। কিসের ভয়? কাকে ভয়? ফালুকে?

চিন্তাটা তার মাথায় আঘাত হানতেই উদভ্রান্তের মতো চারপাশে তাকালো। ফালু কোথায়? একটু আগেই তো ধুপ-ধুপ করে শব্দ শুনেছিলো। নিশ্চয় ফালু আশেপাশেই আছে। যে-ই না ঘুরে পেছনে তাকালো অমনি হাতে পায়ের রক্ত বরফের মতো জমে হিম হয়ে গেলো।

তার থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে কাঁধে একটা কোদাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফালু।

কিছু বলতে চাইলো আতর কিন্তু মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের হলো না। ফালুর চোখ দুটো লাল টকটকে। হঠাৎ করে তার নজর গেলো গোরখোদকের অন্য হাতটায় সাদা কাফনের কাপড়!

ফালু সেই কাফনের কাপড়টা তার দিকে ছুঁড়ে মারলো। সাদা কাপড়টা তার বুকে লেগে পড়ে গেলো মাটিতে। সেদিকে তাকিয়ে দেখলো না আতর। তার দৃষ্টি ফালুর দিকে। এখনও মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের করতে পারছে না।

আচমকা, তাকে একেবারে অপ্রসতুত করে দিয়ে ফালু সামনে এগিয়ে এসে তার বুকে একটা ধাক্কা মেরে বসলো। চিৎপটাং হয়ে খোলা-কবরে পড়ে গেলো সে। কবরের নীচ থেকে

দেখতে পেলো উপর থেকে ফালু তার দিকে চেয়ে আছে। বদমাশটার মুখে বাঁকাহাসি।

“আমার ঘরে ক্যান গেছিলি?” ফ্যাসফ্যাসে গলায় জানতে চাইলো সে।

এর কোনো জবাব দিতে পারলো না আতর। তার গলা দিয়ে কোনো শব্দই বের হচ্ছে না। যেনো জবান বন্ধ হবার সাথে সাথে হাত-পাও অসাড় হয়ে পড়েছে। পরক্ষণেই সে টের পেলো তার উপরে মাটি ফেলা হচ্ছে! ধুপ ধাপ শব্দ করে চাক-চাক মাটি এসে পড়ছে তার উপরে।

না! শব্দহীন চিৎকার দিলো সে।

কয়েক মুহূর্তেই মাটির নীচে চাপা পড়ে গেলো আতর। হাত-পা এতোটাই অবশ হয়ে গেছে যে, কিছুই করতে পারছে না। তবে কি ঐ হারামিটা তাকে জীবন্ত কবর দিয়ে দিচ্ছে!?

হঠাৎ করে টের পেলো তার নাম ধরে কেউ ডাকছে দূর থেকে!

চিনতে পারলো না।

তারপরই একটা হাত এসে পড়লো তার ঘাড়ে। শার্টের কলারটা ধরে তাকে মাটি থেকে টেনে তুলে ফেললো এক ঝটকায়!

ধরফর করে উঠলো তার বুক। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেবার জন্য হাসফাস করতে লাগলো। “কে! কে!” এবার তার মুখ দিয়ে শব্দ বের হলো। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলো একটা পরিচিত মুখ চেয়ে আছে তার দিকে।

*

ছফার ঘুম ভাঙলো দশটার একটু আগে। তারপরও বিছানায় পড়ে থাকলো কিছুটা সময়। উঠতে ইচ্ছে করছে না। গতরাতের ধকল তার শরীর সামলে উঠতে পারে নি। দু-

মাইল সাইকেল চালানো। দেয়াল বাওয়া, ঘণ্টাখানেক সময় ধরে টান-টান উত্তেজনার মধ্যে থাকা, শেষে প্রাণপণে দৌড়! টের পেলো হাত-পায়ের মাংসপেশীগুলো আড়ষ্ট হয়ে আছে।

দীর্ঘদিন পর, বিশেষ করে শীতকাল চলে এলে যখন হঠাৎ করে ব্যাডমিন্টন খেলা শুরু করে, কিংবা অনেকদিন পর গ্রামের বাড়িতে গিয়ে নদী পুকুরে সাঁতার কাটে, তখন শরীরের পেশীগুলো এরকম আচরণ করে।

এবার খেয়াল হলো গতরাতের জামা না-পাল্টেই শুয়ে পড়েছিলো। বালিশের পাশে মোবাইলফোনটা হাতে তুলে নিলো সে। একেবারে ডেড হয়ে

আছে। গতরাতে সেই যে চার্জ শেষ হয়ে গেছিলো আর রিচার্জ করতে মনে নেই। কিছু একটা কথা মনে পড়তেই লাফ দিয়ে উঠে বসলো বিছানায়। তাকে নিশ্চয় অনেক বার ফোন করা হয়েছে।

ফোনটা চার্জ করতে দিয়ে সোজা চলে গেলো টয়লেটে। দ্রুত দাঁত ব্রাশ করে হাত-মুখ ধুয়ে নিলো। জামা পাল্টে নতুন একটা টি-শার্ট আর প্যান্ট পরে নিলো সে। ফোনটা চার্জে থাকা অবস্থায়ই অন করে দিলো এবার। তার ধারণাই ঠিক। ফোন চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে চার-পাঁচটা মেসেজ চলে এসেছে। এরমধ্যে দুটো মিসকল অ্যালার্ট আর দুটো তার এক ঘনিষ্ঠজনের। ছফা আসলে এই ছেলেটার ফোনকলই আশা করেছিলো। প্রথমে এসএমএস-টাই ওপেন করে পড়লো। দেরি না করে দ্রুত কলব্যাক করলো ছেলেটাকে।

দু-বার রিং হতেই কলটা রিসিভ করা হলো।

“সরি, ফোনটা বন্ধ ছিলো, আমিও ঘুমিয়ে ছিলাম...” ওপাশের কথা শুনে গেলো সে। “...হ্যা...গুড...” ছফার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। “ডিটেইল জেনে নাও...ওখানে অনেকদিন ছিলো...সম্ভবত কয়েক মাস...” নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো। “এখনকার নাম মুশকান জুবেরি..হ্যা...জুবেরিটা হাজব্যান্ডের টাইটেল...বিয়ের আগে নিশ্চয় অন্য কোনো

নাম ছিলো..তুমি মুশকান দিয়ে ট্রাই করে দেখো…এই নামের কেউ ছিলো কিনা…আমি শিওর, ওরা জানে…হুম, কেউ না কেউ তো জানেই।”

ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে ফোনের ওপাশের কথাগুলো শুনে যেতে লাগলো সে।

“পুরনো স্টাফদের কাছ থেকে জেনে নাও, হ্যাঁ, ঐ সময়ে যারা ছিলো…সন্দেহ হলে রেকর্ড চেক করে দেখবে…আমি একদম ডিটেইলস চাই, হুম…আর খুব দ্রুত করবে, সব ইনফর্মেশন আমাকে মেইল করে। দেবে…ওকে…ওয়ালাইকুম সালাম।”

ফোনটা রেখে দিলো। সে জানে এখন দ্রুত তথ্য জোগাড় করা যাবে। দারুণ একটা সূত্র পেয়েছে। এটা ধরে এগিয়ে গেলেই অনেক কিছু বের হয়ে আসবে। এজন্যে আতরকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলো সে। লোকটা আসলেই কাজের। সে যতোটুকুই করেছে সেটুকুই যথেষ্ট। টের পেলো খুব খিদে পেয়েছে। নাস্তা করেই লোকটাকে ফোন দেবে।

ঘর থেকে বের হতেই অদ্ভুত একটা খেয়াল চাপলো তার মাথায়। শেষবারের মতো রবীন্দ্রনাথ-এ গিয়ে নাস্তা করলে কেমন হয়?

.

এ ধরনের আরও বই পান ⏩ @bongboi।

অধ্যায় ২০

এতোদিন ধরে যে ডাকের অপেক্ষয় ছিলো সেই ডাক পেয়েও আতর আলীর মনে কোনো খুশি নেই। কেনজানি মনে হচ্ছে এই ডাক সেই ডাক নয়।

সামান্য একজন ইনফর্মার সে। একে ওকে দিয়ে ডেকে পাঠালেই সুরসুর করে থানায় গিয়ে হাজির হতো, কিন্তু না, ওসিসাব তাকে থানায় ডেকে নেবার জন্য এসআই আনোয়ারকে পাঠিয়েছে। জানোয়ারের বাচ্চা আর মানুষ হলো না। ঘুমিয়ে থাকা আতরকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে তুলেছে। ঐ সময় ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের ঘোরে ছিলো সে। সম্বিত ফিরে পেতেই হাফ ছেড়ে বাঁচে। যাক, জীবন্ত কবরস্থ হবার চেয়ে অভদ্র পুলিশের হাতে ঝাঁকুনি খাওয়া অনেক ভালো!

এসআই আনোয়ারকে দেখে সে একটু অবাক হলেও ভয়ও পেয়ে গেছিলো। ভেবেছিলো আবার কোনো ভেজাল হয়ে গেলো কিনা। কিন্তু আনোয়ার তাকে অভয় দিয়ে বলেছে ঘটনা সেরকম কিছু নয়। ওসিসাহেব কী একটা কাজে তাকে ডেকে পাঠিয়েছে, কারণটা নাকি এসআই নিজেও জানে না।

আতর ভালো করেই জানে কথাটা মিথ্যে। ছোটোখাটো থানায় কোনো কথা গোপন রাখাটা কঠিনই বটে। এ কথা যদি কোনো কনস্টেবল বলতো তাহলে না-হয় কথা ছিলো। কিন্তু একজন এসআই জানবে না কেন, কোন দরকারে সে ইনফর্মারকে রীতিমতো বাড়ি থেকে তুলে আনছে?

ওসির রুমে বসে এসব ভাবছে আতর আলী। প্রায় পাঁচ মিনিট হলো এখানে এসেছে, ওসিসাহেবের কোনো খবর নেই। আনোয়ার বলছে ওসি টয়লেটের ভেতরে আছে। আজ সকাল থেকে নাকি বেচারার পেট খারাপ। কথাটা শুনে মুচকি হেসেছে। ভেজাল খেলে পেট খারাপ হয় কিনতু সারারাত ফুর্তি করার পর কারোর পেট খারাপ হয় জানতো না! ওইসব করলেও কি বদহজম হয় তাহলে!

এসআই আনোয়ার, যেকিনা কয়েকদিন আগেও তার পার্টনার ছিলো, সে এখন ওসির রুমে বসে থাকলেও মুখে কুলুপ মেরে রেখেছে। চুপচাপ মোবাইলফোনটা নিয়ে কী সব দেখছে সে, আর এটাই আতরকে বেশি চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।

পুলিশের মোটা বেল্টটা ঠিকঠাক করতে করতে ঘরে ঢুকলো ওসিসাহেব। আতর আর এসআই উঠে দাঁড়ালো সঙ্গে সঙ্গে।

"বসো," আতরের উদ্দেশ্যে কথাটা বলেই নিজের ডেস্কে বসলো ভদ্রলোক। তার চোখেমুখে ক্লান্তি।

আতর বসে গেলেও আনোয়ার দাঁড়িয়ে রইলো।

"বসো," হাত নেড়ে এসআই'র উদ্দেশ্যে বললো এবার। আনোয়ার বসে যেতেই ওসি গভীর করে দম নিয়ে নিলো। "আতর আলী, তুমি তো আমাদের নিজের লোক, যা বলবা ক্লিয়ার-কাট বলবা। ধানাই-পানাই আমার একদম পছন্দ না।"

আতর কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল চোখে চেয়ে রইলো। "আজকাল তুমি কি করতাছো, অ্যাঁ?"

ভুরু কুচকালো ইনফর্মার। ঢোক গিলে বললো, "কই, কিছু না তো?"

মাথা দোলালো ওসি। "দ্যাখো, আমার শরীরটা খারাপ। বেশি প্যাচাল পাড়নের টাইম নাই। যা বলার সোজাসুজি বলি," একটু থামলো সে, আনোয়ারের দিকে চকিতে তাকিয়ে আবার বলতে শুরু করলো, "অচেনা এক লোকের সাথে দুই-তিনদিন ধইরা ঘুরাফিরা করতাছো…কি…মিথ্যা বলছি?"

"না, সত্যি বলছেন," আস্তে করে বললো আতর। সাংবাদিকের সাথে তার ঘোরাফেরার কথা পুলিশ জেনে গেছে বলে একটু অবাকই হলো। তারা তো থানার ত্রিসীমানার মধ্যেও যায় নি।

"ঐ লোকটা কে? সে কি চায়?" কথাটা বলেই তার দিকে স্থিরচোখে চেয়ে রইলো ওসি।

"উনি ঢাকা থেইকা আসছেন..জমি কিনবেন..আমি ইটটু হেল্প করতাছি, স্যার।"

আনোয়ারের দিকে তাকালো ওসি, তারপর আবারো ইনফর্মারের দিকে। “এই সুন্দরপুরে জমি কিনতে আসছে?”

“হ। কিসের যেন খামার করবো। আমারে কইলো ভালা দেইহা কিছু খাসজমি দেখাইতে...আমি কইলাম সমস্যা কি.জমি তো এইহানে মেলা আছে।” মিথ্যে বলতে আতরের কোনো বেগই পেতে হলো না, সব সময়ই সে গুছিয়ে মিথ্যে বলতে পারে।

“সে তোমার খোঁজ কিভাবে পাইলো?”

দাঁত বের করে হাসি দিলো আতর। আগের কুনো পার্টির কাছ থেইকা শুনছে মনে হয়। আমি তো এইটা জিগাই নাই। এইসব নিয়া মাথা ঘামায়া আমার কী লাভ?”

“কিন্তু আমাগো ঘামাইতে হয়,” গম্ভীর কণ্ঠে বললো ওসি। “জি, স্যার?”

“কে কোন উদ্দেশ্যে আসলো, কইথেকা আসলো, কার কাছে আসলো..সব জানতে হয় আমাগো। সব বুঝতে হয়। নইলে আইন-শৃঙ্খলা মেইনটেইন করা খুব টাফ হয়া যায়।”

“তা তো ঠিকই, স্যার। পুলিশ না জানলে কি চলে,” স্বাভাবিক কণ্ঠেই বললো ইনফর্মার।

“কিন্তু এই লোকটা কে, সেই ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না। কি জন্যে সে সুন্দরপুরে আসছে তাও অজানা।”

আস্তে করে ঢোক গিলে পাশে বসা আনোয়ারের দিকে তাকালো আতর। এসআই'র চোখেমুখে কোনো অভিব্যক্তি নেই। মরা ইলিশমাছের মতো নির্বিকার তাকিয়ে আছে তার দিকে।

“কইলাম না, জমি কিনতে আইছে।”

আতরের কথায় মাথা দোলালো ওসি। "আগেই বলছি, তোমারে এখনও আমরা নিজের লোক ভাবি। যতো ঝগড়াঝাটিই হোক না কেন, তুমি আমাদেরই লোক। আজ বাদে কাল তুমি আমাদের সাথেই আবার কাজ করবা।"

আতরের চোখে খুশির ঝিলিক দেখা গেলো। ওসির মুখ থেকে এ-কথা শোনার জন্য সে মুখিয়ে ছিলো এতোদিন। বিগলিত হয়ে সে বললো, "স্যার, আমিও কইলাম নিজেরে আপনাগো লোকই ভাবি।"

আবারো মাথা দোলালো ওসি। "মনে হয় না। তা-ই যদি হইতো তুমি এইসব জমি-জিরাতের গল্প আমদানি করতা না।"

কাচুমাচু খেলো ইনফর্মার। "হাছাই কইতাছি, ওই লোক জমি কিনবার আইছে...আপনে তো জানেনই আমি জমির দালালি করি মাঝেমইদ্যে। ওই লোরে এইখানে-ওইখানে জমি দেখাইতাছি কিন্তু হের পছন্দ হইতাছে না।"

ওসি বাঁকাহাসি হাসলো। "রাইত-বিরাইতে জমি দেখাইলে পছন্দ হইবো। কেমনে, অ্যাঁ? জমি দেখাইতে হয় দিনের বেলায়।"

আতর চোখের পলক ফেলতে ভুলে গেলো। তার মিথ্যেগুলো যখন ধরা পড়ে যায় তখন সাময়িক অসহায় বোধ করে। এ মুহূর্তে যারপরনাই অসহায়। বোধ করতে শুরু করলো সে।

"এরপর থেইকা দিনের বেলায় জমি দেখাইবা, তাইলে পছন্দ হইবো...আর ঐ লোকেরে বলবা, জমি দেখতে চাইলে দেয়াল টপকাইয়া সামনের গেট দিয়া যেন কারোর বাড়িতে ঢুকে। খাস জমি কিনতে চাইলে চোর-বাটপারের মতো ফুচকি-ফাচকি মারার দরকার নাই। ভেজাল জমি কিনতে চাইলে অবশ্য অন্য কথা।"

বজ্রাহত হলো ইনফর্মার। তার মুখে কোনো রা নেই। আজকের দেখা দুঃস্বপ্নের মতোই নির্বাক হয়ে গেলো, বুঝতে পারলো আর কোনো মিথ্যে না বলাই তার জন্য মঙ্গলজনক

হবে। আস্তে করে মাথাটা নীচু করে ফেললো সে।

তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠলো ওসির মুখে। আনোয়ারের দিকে তাকালে সে কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেললো আস্তে করে।

মুখ তুলে তাকালো ইনফর্মার। “স্যার, আমারে মাফ কইরা দেন, দু-হাত জোর করে চোখমুখ যতোটা সম্ভব করুণ করার চেষ্টা করলো। “আমার ভুল হইয়া গেছে।”

“হুম।” আবারো বাঁকাহাসি দেখা গেলো ওসির মুখে। এসআই আনোয়ারের দিকে তাকিয়ে বললো, “ইনফর্মেশনগুলা লেইখা নাও।”

ডেস্কের উপরে রাখা প্যাড আর কলমের দিকে হাত বাড়ালো আনোয়ার।

“এইবার বলো, ঐ লোকের নাম কি?”

ঢোক গিললো আতর। “নুরে…নুরে ছফা।”

“কি?” ওসি নামটা ধরতে পারলো না। “কি সফা?”

“নুরে ছফা।” আবারও বললো ইনফর্মার।

“নুরে…ছফা…?” আনোয়ারের দিকে তাকালে সে ঠোঁট উল্টালো। “নাম তো একখান..মাশাল্লা! নুরে ছফা! নুর মানে আলো..ছফা হইলো আসলে সফা…নোয়াখালি আর চট্টগ্রামের পাল্লায় পইড়া সফার দফারফা হইয়া গেছে। মনে হইতাছে।”

আনোয়ার মুচকি হেসে নামটা টুকে নিলো নোটপ্যাডে।

“তাইলে কী দাঁড়াইলো?” কারোর জবাবের অপেক্ষা না করেই ওসি বললো, “পরিস্কার আলো? ফকফকা আলো?” এরপরই হা-হা-হা করে হেসে উঠলো সে। “আন্দাজে কইলাম

আর কি, আমি আবার আরবিতে খুব কাঁচা ছিলাম।”

এসআইও সেই হাসির সাথে যোগ দিলো তবে নিঃশব্দে।

“সে কি করে?” হাসি থামিয়ে আচমকা কাজের কথায় চলে এলো ওসি।

“সাম্বাদিক”।

ভুরু কুচকে গেলো ভারপ্রাপ্ত কর্মকতার। “সাংবাদিক?”

“জি স্যার। বিরাট বড় পেপারের,সাম্বাদিক।”

“কোন পেপারের?”

“মহাকালের।”

ওসি আর এসআই দৃষ্টি বিনিময় করলো দ্রুত। মহাকাল দেশের অন্যতম প্রভাবশালী পত্রিকা। এই পত্রিকার কিছু সাংবাদিক নিজেদেরকে এমপি-মন্ত্রীও ভাবে। সব কটা বেয়াদপের হাড্ডি। এদেরই একজনের পোঙটামির কারণে আজ তাকে ঢাকা ছেড়ে সুন্দরপুরের মতো বদখত জায়গায় এসে ওসিগিরি করতে হচ্ছে।

হারামজাদা! মনে মনে বলে উঠলো ওসি। “সে এখানে কি করতে আসছে? ম্যাডামের পিছনে লাগছে ক্যান? তার মতলবটা কি?”

আতর একটু দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেলো। সবটা খুলে বললে তার পাছা উদাম হয়ে যাবে, আর সেই উদাম পাছা রক্ষা করা কঠিনই হবে তখন। “ঐ হোটেলের উপরে কী জানি লিখবো...” বললো সে, “...আমারে তো সব খুইলা কয় নাই, খালি কইলো হোটেলটার খাওন-দাওনের অনেক নামডাক শুনছে...এইসব নিয়া পেপারে লিখবো।”

মুচকি হেসে মাথা দোলালো ওসি। "তাইলে তোমারে নিয়া ঘুরঘুর না কইরা ম্যাডামের সাথে সরাসরি দেখা করতাছে না ক্যান?"

গাল চুলকালো ইনফর্মার। "হ, আমিও তো পরথমে হেইটাই কইছিলাম...সে কইলো ম্যাডামের লগে দেহা করন নাকি খুব কঠিন।"

"সেইজন্যে তোমার হেল্প নিলো?"

চুপ মেরে রইলো আতর।

ওসিও কিছুক্ষণ চুপ থেকে ইনফর্মারকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। অবশেষে বললো সে, "তুমি ওই সাংবাদিকরে নিয়া কই কই গেছো, ঠিক কইরা কও তো?"

একটু ঢোক গিলে নিলো আতর। অভিজ্ঞতা থেকে জানে, একবার মিথ্যে বলে ধরা পড়ে গেলে সত্যি না বললে লাভের ক্ষতিই হয় বেশি। তার এখন উচিত নিজের কথা ভাবা। সাংবাদিক লোকটা তাকে না জানিয়ে ঐ বাড়িতে ঢুকেছিলো। তাকে বললে সে অবশ্যই মানা করতো। লোকটার এই বাড়াবাড়ি করার কারণেই আজ তাকে বিপদে পড়তে হচ্ছে। এখন তাকে রক্ষা করতে গেলে সে নিজেই বিপদে পড়ে যাবে। দুয়েকদিনের পরিচয়ের মানুষের জন্য এতো বড় ঝুঁকি নেয়াটা ঠিক হবে না।

"কি হইলো?"

ওসির তাড়া খেয়ে মুখ তুলে তাকালো সে। "খালি মাস্টরের কাছে নিয়া গেছিলাম... আর কুনোখানে যাই নাই, স্যার।"

"মাস্টার মানে?"

"মনে হয় রমাকান্ত মাস্টারের কথা বলতাছে, স্যার," এই প্রথম এসআই আনোয়ার মুখ খুললো।

ওসি সপ্রশ্নদৃষ্টিতে আতরের দিকে তাকালে মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। “উনার কাছে কেন গেছিলা?”

“জমিদার বাড়ির হিস্টোরি জানবার লাইগা…ওই সাম্বাদিক কইলো জমিদার বাড়ির কথা জানবার চায়…আমি তো এইসব কাহিনী জানি না… তাই মাস্টরের কাছে লইয়া গেলাম।”

“ঐ বাড়ির হিস্টোরি জাইনা সাংবাদিক কি করবো, অ্যাঁ?”

“স্যার,” আনোয়ার আবারো মুখ খুললো, “মনে হইতাছে হোটেল আর ম্যাডামরে নিয়া সাংবাদিক বিরাট কোনো রিপোর্ট করবো…ডিটেইল কিছু।”

“হুম,” মাথা নেড়ে সায় দিলো সুন্দরপুরের ওসি।

“ঐ সাংবাদিক ইনফর্মেশনের জন্য আতরে ইউজ করছে,” এসআই আরো বললো। “আমার মনে হয় না ঐ লোকের আসল মতলব কি তা আতর জানে।”

সমর্থন পেয়ে ইনফর্মার যেনো হালে পানি পেলো। “হ, স্যার…আমি বেশি কিছু জানি না…খালি জানি পেপারে লিখবো।”

“বুঝলাম…তাইলে তুমি মিথ্যা বলো কেন? জমির কাহিনী বলার দরকার কি ছিলো? এইটা কি ওই লোক তোমারে শিখায়ে দিছে?”

কথাটা যেনো তার মুখে তুলে দিলো ওসি। “জি, স্যার। হে আমারে কইছে, হে যে সাম্বাদিক এইটা যে কাউরে না কই

“জমি দেখতে আসছে…এইটাও কি ওই সাংবাদিক শিখায়ে দিছে?” প্রশ্নটা করলো এসআই আনোয়ার। তার আচরণ শত্রুভাবাপন্ন নয়।

“হ। পরথমে জমির কথা বইলা আলাপ শুরু করছে তার বাদে কয়, সে নাকি সাম্বাদিক…ঐ বে…” একটু থেমে গেলো আতর। আরেকটুর জন্যে মুখ দিয়ে ‘বেটি’ শব্দটা বের হয়ে গেছিলো। “…হোটেলটার মালিকের খবর জানবার চায়।”

“আচ্ছা,” মুচকি হাসলো ওসি। “তাইলে তো ওই সাংবাদিক একেবারে ঠিক জায়গাতেই টোকা মারছে। আমাদের আতরের মতো বিবিসি থাকতে অন্য কারো কাছে কেন যাইবো সে, অ্যাঁ?”

টিটকারিটা গায়ে মাখলো না ইনফর্মার। তাকে যে লোকে আড়ালে আবডালে বিসিসি বলে ডাকে এ নিয়ে সে বরং গর্বই করে।

“কাল রাইতে তুমি কি ওই সাংবাদিকের সাথে ছিলা?” আতর ওসির দিকে স্থির চোখে তাকালো, বোঝার চেষ্টা করলো ঘটনা কি।

“আর কোনো ধানাই-পানাই কইরো না। যা ঘটছে সত্যি সত্যি বইলা দাও। আমরা জানি কাইল রাইতে ঐ সাংবাদিক কই গেছিলো।”

“আমি হের লগে আছিলাম না, স্যার। বিশ্বাস করেন। হে একলাই গেছিলো।”

“কই গেছিলো?”

ঢোক গিললো ইনফর্মার। “ইয়ে…মাইনে…”।

“তুমি কইলাম সব জানো, আতর।”

“স্যার, আমি জানলে তো হেরে এমন আকাম করতেই দিতাম না, পুরোপুরি মিথ্যে বলার চেয়ে আধা-সত্যি বলাই ভালো হবে বলে কথাটা বললো সে।

“তাই নাকি?” ওসির চোখেমুখে প্রচ্ছন্ন সন্দেহ।

“রহমান মিয়ারে জিগায়া দেইহেন…হের কাছ থিকাই আমি জানবার পারছি সাম্বাদিক জমিদার বাড়ির দিকে গেছে।” একটা মোক্ষম অ্যালিবাই ব্যবহার করলো।

“কোন রহমান মিয়ার কথা বলতাছো?”

“স্যার, ঐ রেস্টুরেন্টের উল্টা দিকে যে চায়ের দোকানটা আছে, সেই দোকানির কথা বলতাছে,” এসআই আনোয়ার আগ বাড়িয়ে বলে দিলো।

ওসি মাথা নেড়ে সায় দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলো আতরকে, “রহমান মিয়ার কাছ থেইকা শুইনা তুমি কি করলা?”

ইনফর্মার একটু ঢোক গিললো। মিথ্যে বলা তার জন্য সহজ কিন্তু সত্যি মিথ্যা মিলিয়ে বলাটা একটু কঠিনই মনে হচ্ছে। কতটুকু সত্যি বলবে আর কতোটুকু মিথ্যে সেটার হিসেব করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে সে।

“রহমান মিয়ার কাছ থিকা শুনার পরই দেখি সাম্বাদিক সাইকেল চালায় আইতাছে,” অবশেষে ভালোভাবেই সত্যি-মিথ্যাটা বলতে পারলো আতর। “আমি ওরে থামাইয়া জিগাইলাম কি হইছে…সে বললো পরে কমু নে…আগে সাইকেলে ওঠেন। আমি তো বেকুব হয়া গেলাম। ঘটনা কি কিছুই বুঝবার পারলাম না।”

“তারপর তুমি কি করলা?”

“কি আর করুম..মাথামুথা কিছুই কাম করতাছিলো না…উইঠা বসলাম হের সাইকেলে।”

“হুম, এসআই আনোয়ারের দিকে তাকালো ওসি। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আতরের কথায় সন্তুষ্ট। তাদের কাছে যে তথ্য আছে তা এই ইনফর্মারের কথার সাথে একেবারে মিলে গেছে। “ওই সাংবাদিক তো সুরুত আলীর হোটেলে উঠছে, না?”

“জি, স্যার।”

“সে আর কয়দিন থাকবো?”

মাথা চুলকে নিলো ইনফর্মার। “সেইটা তো আমারে কয় নাই।”

ওসি গালে হাত বুলালো। “তোমার কি মনে হইতাছে, আনোয়ার?”

“এখন তো ঘটনা একদম পরিস্কার, স্যার,” এসআই জবাব দিলো। “হুম,” মাথা নেড়ে সায় দিলো ওসি।

“ওই সাম্বাদিক যদি আমারে ডাকে তাইলে আমি কি করুম, দেহা করুম নাকি করুম না?” বেশ অনুগত সুরে জানতে চাইলো সে।

আতরের দিকে স্থিরচোখে চেয়ে রইলো ওসি। “এইটা নিয়া তোমারে আর চিন্তা করতে হইবো না। সে আর তোমারে ডাকবে না।”

কথাটা শুনে ফ্যাল ফ্যাল চোখে চেয়ে রইলো আতর আলী।

৫. গুড়ের চা

অধ্যায় ২১

রহমান মিয়া গুড়ের চা বানাতে লাগলেও তার দৃষ্টি বার বার চলে যাচ্ছে কাস্টমারের দিকে। শহর থেকে আসা এই কাস্টমারকে গতকাল রাতে সাইকেল চালিয়ে জোড়পুকুরে যেতে দেখেছে। লোকটার কাজকর্ম যথেষ্ট সন্দেহজনক। দু-তিনদিন ধরে এই এলাকায় ঘোরাফেরা করছে ঐ ভাদাইমা ইনফর্মার আতরের সাথে। কি উদ্দেশ্যে এই সুন্দরপুরে এসেছে সেটা মোটেও স্পষ্ট নয়। মুখে যদিও বলেছে ঐ হোটেলের খাবার তার ভালো লাগে নি, কিন্তু সকালের নাস্তা থেকে শুরু করে রাতের খাওয়া-দাওয়া সবই সে করে ওখানে। এই তো, তার দোকানে এসে চায়ের অর্ডার দেবার আগে ওই হোটেল থেকেই বের হতে দেখেছে।

"আজকে আতর আলীকে দেখেছেন?" সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললো ছফা।

রহমান মিয়া চায়ের কাপে গুড় মেশানো থামিয়ে বললো, "না। আইজ তো দেখি নাই।"

"ওকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে?"

"কুথায় আছে কে জানে...ওরে ফুন দেন...ওর নম্বর কি অপনের কাছে নাই?"

"ওর ফোন বন্ধ পাচ্ছি। সকাল থেকে কয়েক বার দিয়েছি...একই অবস্থা।"

চায়ের কাপটা কাস্টমারের দিকে বাড়িয়ে দিলো রহমান। "ফুনটা মনে অয় নষ্ট হইয়া গেছে।"

ছফারও তাই ধারণা। একটা সস্তা চায়নিজ ফোন ব্যবহার করে আতর। এমনিতেই ওটার অবস্থা কাহিল, ডিসপ্লে কাজ করে না, শুধু ইনকামিং কল রিসিভ করতে পারে। এখন হয়তো পুরোপুরিই অচল হয়ে গেছে।

চায়ে চুমুক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকালো। তিন-চারটা প্রাইভেটকার এসে থেমেছে। ভেতরের কাস্টমার বেশ ভালো। বলতে গেলে হাউজফুল। একটু আগে সেও ওখানে গিয়ে নাস্তা করে এসেছে। মুশকান জুবেরির রহস্য উন্মোচন করার জন্য এলেও তার সুস্বাদু খাবারে মজে গেছে সে। স্বীকার করতেই হলো, রন্ধনশিল্পী হিসেবে মহিলা অসাধারণ।

"আতরকে কোথায় গেলে পাবো, জানেন?"।

ছফার দিকে চেয়ে রইলো দোকানি। "হের তো কুনো ঠিক-ঠিকানা নাই...কই খুঁজবেন?" তারপর গুড়ের পিণ্ডের উপর থেকে মাছি তাড়িয়ে বললো, "থানায় গিয়া দেখবার পারেন। ওইখানেই তো বেশি যায়।"

সুন্দরপুর থানায় গিয়ে আতরের খোঁজ করার কোনো ইচ্ছে তার নেই, সে বরং দুপুর পর্যন্ত তার জন্য অপেক্ষা করবে। এই সময়ের মধ্যে নিশ্চয় ইনফর্মার চলে আসবে তার সাথে দেখা করার জন্য।

চায়ের বিল দিয়ে উঠে দাঁড়ালো ছফা। ঠিক করলো হোটেলেই আবার ফিরে যাবে। গোসল করে একটু বিশ্রাম নেয়া দরকার। আর যদি তাকে খুঁজতে আসে তাহলে তাকে ফোন করেই আসবে। দুপুরের খাবারটা। একসাথে খাবে দু-জনে তবে সেটা রবীন্দ্রনাথে নয়। টাউনে আরেকটা রেস্টুরেন্ট আছে, খাবারের মান অতো ভালো নয়, তবে রোজ রোজ সুস্বাদু খাবার খাওয়াটাও ঠিক হচ্ছে না।

রিক্সা-ভ্যানের জন্য সড়কের একপাশে দাঁড়িয়ে রইলো সে। দিনের এ সময়টাতে বেশ যানবাহন চলাচল করে এদিক দিয়ে, রিক্সাও চলে প্রচুর। একটা খালি রিক্সা দেখতে পেয়ে হাত নেড়ে থামালো। টাউনের কথা বলতেই রিক্সাওয়ালা রাজি হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। ছফা লক্ষ্য করেছে, এখানকার রিক্সাওয়ালারা যেকোনো গন্তব্যে যেতেই রাজি থাকে। তাদের মুখে না শব্দটি এখন পর্যন্ত শোনে নি।

রিক্সায় উঠে বসতেই দেখতে পেলো পুলিশের একটা জিপ এগিয়ে আসছে। জিপটা এসে থামলো ঠিক তার রিক্সার সামনে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো রিক্সাওয়ালা। একে তো পুলিশ, তার উপরে আগ্রাসী আচরণ। বেচারার চোখমুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো।

ছফা রিক্সার সিটে বসে স্থিরচোখে চেয়ে রইলো জিপটার দিকে। গাড়ি থেকে নেমে এলো এক পুলিশ, তার ইউনিফর্মের নেমপ্লেটে লেখা আনোয়ার হোসেন। র‍্যাঙ্ক দেখে বুঝতে পারলো এই লোক একজন এসআই।

“ওই, রিক্সা থেইকা নাম,” ছফার দিকে আঙুল তুলে বলে উঠলো আনোয়ার নামের এসআই।

তুই-তোকারি সম্বোধন করেছে বলে সে একটু অবাকই হলো। “আপনি আমাকে বলছেন?” অবিশ্বাসে বলে উঠলো ছফা।

“হ তরেই কইতাছি। রিক্সা থেইকা নাম।”

ছফা আর কোনো কথা না বলে রিক্সা নেমে গেলো। এসআই আনোয়ার তুড়ি বাজিয়ে রিক্সাওয়ালাকে কেটে পড়ার ইশারা করতেই বেচারা সটকে পড়লো।

“ঘটনা কি আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না?” ছফার চোখেমুখে বিস্ময়।

“তর নাম নুরে ছফা, না?”

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। “হ্যাঁ, কিন্তু-”

কথা শেষ করার আগেই এসআই তার কলারটা ধরে টান মারলো।

“আরে, আশ্চর্য! আপনি আমার সাথে এমন করছেন কেন? ঘটনা কি?”

“মাদারচোদ্দ, থানায় নিয়া গিয়া বুঝাইতাছি ঘটনা কি।”

ছফা আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারলো না, এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো। এসআই'র হাত থেকে ছুটতে পেরেই তার বুকে ধাক্কা মেরে বসলো সে। আচমকা এমন প্রতিরোধের মুখে পড়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো আনোয়ার। কয়েক মুহূর্ত বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকার পর ঝাঁপিয়ে পড়লো ছফার উপরে।

*

সুন্দরপুরের এসপি মনোয়ার হোসেন ঢাকার এক কলিগের সাথে টেলিফোনে কথা বলছিলো, ঠিক তখনই পর পর দু-বার আরেকটা কল ওয়েটিং-এ ঢুকে পড়ে। মৃদু শব্দের বিপ হলেও সে খেয়াল করতে পারে নি। কলটা শেষ করে যখন ডিসপ্লে দেখলো তখনই তড়িঘড়ি করে কলব্যাক করলো।

“সরি ম্যাডাম..জরুরি একটা বিষয়ে ডিআইজি সাহেবের সাথে কথা বলছিলাম,” বিনয়ের সাথে বললো মনোয়ার হোসেন। তবে অপ্রয়োজনে এই মিথ্যেটা কেন বললো সে জানে, আর এই জানাটাই তাকে ভেতরে ভেতরে ছোটো করে দিলো নিজের কাছে।

“না, না...সরির কী আছে...” ওপাশ থেকে সুস্পষ্ট বাচনভঙ্গি আর মাদকতাপূর্ণ কণ্ঠে বলে উঠলো মুশকান জুবেরি। “আপনি ব্যস্ত মানুষ...এটা তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।”

বিগলিত হাসি দিলো এসপি কিন্তু যে-ই না বুঝতে পারলো তার এই নিঃশব্দ হাসি ফোনের ওপাশে যে আছে সে দেখতে পাচ্ছে না তখন থামিয়ে দিলো।

"কিছু জানতে পেরেছেন লোকটা কে...কি চায়?"

"না, মানে..." ঢোক গিলে নিলো মনোয়ার হোসেন। "..ওসিকে ফোন দেই নি...মাত্র ধরে এনেছে...একটু টাইট দিতে হবে না...না দিলে তো মুখ খুলবে না, ম্যাডাম। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না...একটু পর আপনাকে ফোন দিয়ে জানাবো কি জানা গেলো।"

"আপনাকে দিতে হবে না, আমিই দেবো।"

"আরে, কী যে বলেন," আবারো বিগলিত হাসি এসপির মুখে এসে ভর করলো। "আপনি কেন দেবেন। একটু অপেক্ষা করেন, সব জানা যাবে। ওসি লোকটা খুব কাজের। পেট থেকে কথা বের না-করে ছাড়বে না।" মুশকান কিছু বললো না দেখে এসপি আবারো বলতে শুরু করলো, "শুধু একটু টাইম দিতে হবে। আমার মনে হচ্ছে পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যেই সব জানা যাবে।"

"ঠিক আছে," আস্তে করে বললো মুশকান। "থ্যাঙ্কস অ্যা লট।"

"আরে, এখন না...এখন না। কাজ হবার পর দিবেন। এখনও তো কিছুই জানাতে পারলাম না। আপনার জন্য কিছু করতে পারলে আমার ভালোই লাগে..."

মনোয়ার হোসেন হঠাৎ করে বুঝতে পারলো ফোনের ওপাশে কেউ নেই। শেষ কয়টা কথা খামোখাই বলেছে। নিজেকে তার খুব বোকা বোকা লাগলো। বিরসমুখে ফোনটা নামিয়ে রাখলো সে।

.

অধ্যায় ২২

সুন্দরপুর থানার ওসির রুমে বসে আছে ছফা। তার ভেতরে আগ্নেয়গিরির লাভা উদগীরণ হতে চাইছে যেনো, বহু কষ্টে দমিয়ে রেখেছে সেটা। ঘরে আরো আছে আতর আলী, সে কাচুমাচু হয়ে মাথা নীচু করে বসে আছে ওসির সামনে। তবে যে লোকটার উপস্থিতি সহ্য হচ্ছে না সে হলো এসআই আনোয়ার। যদিও ঘরের এককোণে চুপচাপ বসে আছে এখন।

বাম-ঠোঁটের কোণটা রুমাল দিয়ে আরেকবার মুছে নিলো ছফা। বাম চোখের নীচেও বেশ ব্যথা করছে। ভাগ্য ভালো, দু-জন কনস্টেবল দৌড়ে এসে জানোয়ারটাকে নিবৃত্ত করেছে, নইলে যে কী হতো!

"আমি জানি না আপনারা আমার সাথে কেন এমন করলেন...কেনই বা এখানে এভাবে ডেকে নিয়ে আসলেন..." বেশ শান্তকণ্ঠে বললো সে। "...আমাকে দ্রভাবে ডাকলেই আমি থানায় চলে আসতাম।"

ওসি স্থিরচোখে তার দিকে চেয়ে আছে, মুখে কিছু বলছে না।

"আমি তো কোনো চোর-বাটপার নই.কোনো অপরাধও করি নি..তারপরও.." ছফা আবারো ঠোঁট মুছলো।

"চোর-বাটপার না সেইটা কেমনে বুঝবো?" বেশ টেনে টেনে বললো ওসি।

ছফা অবিশ্বাসে চেয়ে রইলো লোকটার দিকে।

"রাইত-বিরাইতে প্রাইভেট পোপার্টির দেয়াল টপকাইয়া যে ঢুকে তারে তো চোর-বাটপার বলাই যায়, নাকি?"

বিস্ময়ে থ বনে গেলো ছফা, আতর আলীর দিকে ফিরে তাকালো। সে এখনও মাথা নীচু করে রেখেছে।

“ডাকাইত মনে করলেও তো সমস্যা দেখতাছি না,” হেসে বললো সুন্দরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

ছফা নিশ্চিত, ইনফর্মার আতর সব বলে দিয়েছে। বাঁকাহসি হাসলো সে। এসির কথায় কোনো জবাব না দিয়ে আবারো ঠোঁট মুছতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। “আপনি যা খুশি তাই ভাবতে পারেন,” একদম স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো ছফা।

“পলিশ যা খুশি তাই ভাবে না,” ওসিও চেয়ারে হেলান দিয়ে আয়েশ করে বললো, “যে যা পুলিশ তারে তা-ই ভাবে। চোরে চোর, ডাকাইতরে ডাকাইত!”

একটা হাই তুলে রুমালটা ডেস্কের উপর রাখলো সে। “এসব কথা বাদ দিয়ে এখন বলেন আমাকে কেন এভাবে তুলে আনা হয়েছে? কেউ কি আমার নামে ইলিগ্যাল ট্রেসপাসিংয়ের অভিযোগ করেছে? কোনো জিডি করা হয়েছে? করে থাকলে সেটা আমি দেখতে চাই।”

সাংবাদিকের এমন উদ্ধতভঙ্গি পছন্দ হলো না ওসির। “সময় হইলে সব দেখতে পাইবেন,” চিবিয়ে চিবিয়ে বললো কথাটা।

“তাহলে সময় এখনও হয় নি?” বাঁকাহাসি দিয়ে বললো ছফা।

ওসির চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে নিজেকে বহু কষ্টে নিয়ন্ত্রণ করছে। ঘরের এককোণে বসে থাকা এসআই আনোয়ার রাগে ফুঁসছে। জীবনে এরকম অনেক বেয়াদপ সাংবাদিক দেখেছে সে। এরা সব সময় চ্যাটাং চ্যাটাং করে কথা বলে, এমনকি প্যাদানি খাওয়ার পরও।

“মনে হইতাছে এখনও শিক্ষা হয় নাই,” ওসি রাগের মধ্যেও মুখে হাসি এঁটে বললো।

বাঁকাহাসি হেসে মাথা দোলালো ছফা। “শোনেন মি. তোফাজ্জল,” ওসির ইউনিফর্মে এই নামটাই লেখা আছে, “আপনারা কি ধরণের শিক্ষা দেবেন সেটা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি

না। আমি শুধু জানতে চাই...” চুপ মেরে গেলো অল্পক্ষণের জন্য, “আমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছেন।” শেষ কথাটা বললো বেশ সিরিয়াস ভঙ্গিতে।

সুন্দরপুরের ওসি তোফাজ্জল হোসেন স্থিরচোখে চেয়ে রইলো। পুলিশে কাজ করে বলে হরহামেশাই তাকে সাংবাদিকদের সামলাতে হয়, তাদের মধ্যে অনেকেই এই ছফা নামের লোকটার মতো আচরণ করে। নিজেদেরকে এরা ধরাছোঁয়ার বাইরে মনে করে সব সময়।

“আপনার নাম ছফা, তাই না?” যেনো কাজের কথায় ফিরে যাচ্ছে এমনভাবে প্রশ্নটা করলো ওসি।

“নুরে ছফা।”

বাঁকাহাসি হাসলো ভদ্রলোক। “মি. নুরে ছফা,” দু-হাত ডেস্কের উপর রাখলো সে, “এখন বলেন, আপনি কি করেন?

আতরের দিকে চকিতে তাকালো সে। “কেন, ও এ-ব্যাপারে আপনাদের কিছু বলে নি?”

“ও কি বলছে না বলছে ভুইলা, যান এখন আমি জিজ্ঞাসা করবো আপনে জবাব দিবেন।” কাটাকাটাভাবে বললো তোফাজ্জল হোসেন।

“সাংবাদিকতা।”।

“কোন পেপারের?”

“মহাকাল।”

“এইখানে কি জন্যে আসছেন?”

“বলা যাবে না। একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে এসেছি…এর বেশি কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি নিশ্চয় কোনো সাংবাদিককে বাধ্য করতে পারেন না তার অ্যাসাইনমেন্টটা কি সেটা জানার জন্য?”

“অবশ্যই পারি..যদি সে তার অ্যাসাইনমেন্টের নামে বে-আইনী কাজকর্ম কইরা বেড়ায়।”

“হুম, তা অবশ্য ঠিক বলেছেন,” সহমত পোষন করলো ছফা। দেখতে পেলো ওসি একটু অবাকই হয়েছে। সেক্ষেত্রে আমি জানতে চাইবো, “আমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি।”

“ঐ যে বললাম, ইলিগ্যাল ট্রেসপাসিং..রাইত-বিরাইতে ভদ্রলোকের বাড়িতে হানা দেয়া।”

“ভদ্রলোক নাকি ভদ্রমহিলা?”

ছফার এমন কথায় নিজের রাগ দমাতে বেগ পেলো ওসি। “আমার চায়া আপনেই তো ভালো কইরা জানেন। দেয়াল তো আমি টপকাই নাই।”

মুচকি হেসে বললো নুরে ছফা, “আমার মনে হয় আপনিও ভালো করে জানেন। এতোকিছু যখন জানেন…এটাও নিশ্চয় আপনার জানা আছে। কি বলেন?”

ভুরু কুচকে তাকালো ওসি। “ম্যাডাম মুশকান জুবেরির বাড়িতে কেন ঢুকছিলেন?”

“উনি কি কেস করেছেন, নাকি জিডি?”

“উনি কি করছেন সেইটা আপনের জানার দরকার নাই-”

“অবশ্যই আছে। আপনি আইনের লোক, আপনি ভালো করেই জানেন এটা জানার অধিকার আমার আছে।”

“ওই!” ঘরের এককোণ থেকে চিৎকার দিয়ে উঠলো এসআই আনোয়ার। “আমাগো আইন শিখাবি না! তোর পাছা দিয়া আইন ভইরা দিমু?”

ছফা পেছন ফিরে তাকালো এসআই’র দিকে, কিছু বলতে গিয়েও বললো না।

“এই যে সাংবাদিক সাহেব, আমার দিকে তাকান,” ওসি বললো।

ছফা মুচকি হেসে ওসির দিকে ফিরলো আবার।

“অন্য কোনো সময় হইলে আমি আমার এসআই’রে এমন রাফ বিহেইভ করতে দিতাম না, বিশেষ কইরা সাংবাদিকগো লগে তো না-ই। কিনতু আপনের ঘটনাটা একদমই আলাদা।”

“আলাদা কেন?”

যেনো খুব মজা পেয়েছে এমনভাবে হাসলো। “একটু আগে আমি মহাকাল-এ ফোন দিছিলাম…”

ছফার কপাল কুচকে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। “ওইখানে নুরে ছফা নামের কোনো সাংবাদিক কাজ করে না।”

কথাটা শুনে এসআই আনোয়ার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, আর আতর আলী ড্যাব ড্যাব চোখে চেয়ে রইলো ছফার দিকে। বিস্ময়ের চেয়েও বেশি কিছু আছে তার অভিব্যক্তিতে। যেনো তার সাথে বেঈমানি করা হয়েছে।

তথ্যটা দিয়ে সবাইকে অবাক করতে পেরেছে বলে সুন্দরপুর থানার ওসি ডেস্কের নীচে পা দোলাতে লাগলো। মুখে যথারীতি বাকাহাসি।

শালায় একটা ভুয়া সাংবাদিক!

·

অধ্যায় ২৩

ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে
অনেক হাসি অনেক অশরুজলে।

ফাগুন দিল বিদায়মন্ত্র আমার হিয়াতলে... গুন-গুন করতে করতে নীচে নেমে এলো মুশকান। একটু আগে গোসল করেছে। চুলগুলো এখনও শুকোয় নি। কখনও হেয়ার-ড্রাইয়ার ব্যবহার করে না সে, ফ্যানের নীচে দাঁড়িয়েও চুল শুকায় না। চুলগুলো খুলে রেখে দেয়, বড়জোর রোদে কিছুক্ষণ হাটাহাটি করে। আজ ঠিক তাই করছে। সচেতনভাবেই গতরাতের ঘটনাটা মন থেকে তাড়াতে চাইছে সে। তার নার্ভ এমন দুর্বল নয় যে, এই সামান্য ঘটনায় ভড়কে যাবে, ঘণ্টার পর ঘন্টা এ নিয়ে ভেবে অস্থির হবে। এরচেয়ে অনেক বড় দুর্বিপাকে পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে নিপতিত হয়েছে যা কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে সহ্য করে। টিকে থাকা অসম্ভব। কিন্তু সে পেরেছে। আর তারপর থেকে পুরো জীবনটাই বদলে গেছে চিরতরের জন্য।

এসব চিন্তা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য সামনের লনটার দিকে তাকালো। দুপুরের রোদে চকচক করছে এখন। নিয়মিত পানি দেবার পরও ঘাসগুলো জায়গায় জায়গায় হলদেটে হয়ে গেছে দেখে মন খারাপ হয়ে গেলো। কিছুই করার নেই। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। শীতকালে যতই যত্ন নেয়া হোক ঘাস শুকিয়ে যাবেই। এটা হলো পাতাঝরার ঋতু।

মেইনগেটের দিকে তাকালো। ওখানে এখন কেউ নেই। একটু আগে দারোয়ান ছেলেটা গোসল করার জন্য জোড়পুকুরে গেছে।

বাড়িটার চারপাশে তাকালো মুশকান। দেখে মনে হয় না ১৮৮৪ সালে এটা নির্মাণ করা হয়েছিলো। অবশ্য এরপর অনেকবার রেনোভেট করা হয়েছে। মেরামতের শেষ কাজটি সম্পন্ন করা হয় মাত্র পাঁচ বছর আগে। মূল নক্সাটাকে অক্ষত রেখে যতোটা সম্ভব আধুনিক উপকরণ যোগ করা হয়েছে কেবল। অ্যাটাচড বাথরুম আর কিচেন-ল্যাবটার কথা বাদ দিলে প্রায়। সবকিছুই আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে। কিন্তু মুশকান যখন বাড়িটা নিজের করে পেলো তখন একেবারে আস্তাবলের মতোই ছিলো জায়গাটা। দীর্ঘদিন বিভিন্ন মানুষের দখলে থাকা, তারপর আবার পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে থাকার পর এর সব সৌন্দর্য, গৌরব প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছিলো। যে লনে সে এখন হাটছে সেটা বড়বড় ঘাসেপূর্ণ খোলা জায়গা ছাড়া আর কিছু ছিলো না। লনের মাঝখানে যে ফোয়ারাটা আছে সেটার ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছিলো ঝোঁপ আর মাটির নীচে। বাড়িটা দীর্ঘদিন গুদামঘর হিসেবে ব্যবহার করেছিলো স্থানীয় এক টাউট-পলিটিশিয়ান। জোড়পুকুরটা বলতে গেলে কচুরিপানায় ভরে ভোবায় পরিণত হয়ে গেছিলো। পানি বলতে ছিলো। গাঢ়-কালচে আর ঘন ময়লা। বাড়ির তিনদিকে ঘিরে থাকা জলাশয়টির অবস্থা ছিলো আরো করুণ। কচুরিপানা আর আগাছায় ভরে গেছিলো পুরো জায়গাটি। বেঁচে যাওয়া পুরনো কিছু ছবি দেখে দেখে রেনোভেশনের কাজটি করা হয়েছে। তবে জোড়পুকুরের দক্ষিণে যে শিবমন্দিরটি আছে সেটার কোনো সংস্কার করা হয় নি। অবশ্য মন্দিরের কোনো কিছু ওখানে ছিলোই না। এখন যেটুকু ভগ্নাবশেষ আছে ঠিক সেরকমই ছিলো। মেরামতের অযোগ্য মন্দিরের পুরনো কোনো ছবিও তার কাছে নেই, থাকলেও যে ওটা রেনোভেট করতো তা নয়। মন্দির ব্যবহার করার মতো কেউ এখন এই বাড়িতে থাকে না। সত্যি বলতে, ওখানে গিয়ে পূজা করার মতো খুব বেশি সংখ্যক মানুষজন এই সুন্দরপুরে নেই।

রোদের প্রকোপে সাদা রঙের বাড়িটাকে আরো বেশি মোহনীয় লাগছে, তবে সে খেয়াল করলো পাঁচ বছরের পুরনো সাদা রঙ কিছুটা ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে একটু হলদেটে হয়ে গেছে। সে চেয়েছিলো তাজমহলের মতো সাদা। রঙা রোদ আর পূর্ণিমায় সাদা মুক্তার মতো চক চক করবে।

বাড়ি থেকে চোখ সরিয়ে নিলো। একটা দুঃখবোধে আক্রান্ত হলো সে। সব সময়ই এটা ঘটে তার সাথে। যখনই সে থিতু হয়ে আসে তখনই এটা ঘটে। একবার নয়, দু-বার নয়, বেশ কয়েকবার এরকম হয়েছে। সত্যি কথা হলো এই বাড়িটার মায়ায় পড়ে গেছে, আর সে জানে, মায়া বড় খারাপ জিনিস। এরসাথে অবিচ্ছেদ্যভাবেই জুড়ে থাকে সুতীব্র কষ্ট।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে দেখে নিলো কতোটা শুকিয়েছে। লনে কিছুক্ষণ থাকার পর বুঝতে পারলো শীতের নরম রোদ আর নরম নেই, গায়ে এসে লাগছে। বাড়ির দিকে পা বাড়ালো সে। সদর দরজার কাছে আসতেই ভেতর-বাড়ি থেকে সাফিনা দৌড়ে ছুটে এলো তার কাছে। মেয়েটার হাতে মোবাইলফোন।

"আপনের ফোন।" হাফিয়ে উঠেছে সে। সেটাই স্বাভাবিক। তার এই ফোনটা রাখা ছিলো দোতলার লিভিংরুমে, সেখান থেকে দৌড়ে নেমে এসেছে নীচে।

ফোনটা হাতে নিয়ে মেয়েটাকে চলে যাবার ইশারা করলো।

"হ্যালো..."।

ওপাশ থেকে একটা পুরুষকণ্ঠ আনন্দে বিগলিত হয়ে বললো, "ম্যাডাম, কেমন আছেন?"

"জি, ভালো। আপনি?"

"পুলিশের চাকরিতে খুব বেশি ভালো থাকার উপায় নেই, সব সময়ই ব্যস্ত থাকতে হয়। আপনাকে আর কী বলবো, আপনি তো সবই জানেন।"

মুশকান কিছুই বললো না। এসব আদিখ্যেতা কথা-বার্তা তার ভালো লাগছে না। দরকারের সময় অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা অসহ্য লাগে।

"ও, যার জন্য ফোন দিয়েছি..ওই লোকটার খবর জানা গেছে। সে একজন সাংবাদিক।"

কপালে একটু ভাঁজ পড়লো তার। "কোথায় কাজ করে?"

"মহাকাল-এ"

একটু ভেবে জিজ্ঞেস করলো সে, "তার ইন্টেনশনটা কি জানতে পেরেছেন?"।

"বলছে, সে নাকি আপনার ঐ রবীন্দ্রনাথের উপরে একটা ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্ট করতে চায়।" এসপি জানে মুশকান রেস্টুরেন্ট শব্দটি পছন্দ করে না। "এখনও ওসির রুমে আছে। আরেকটু টাইট দিলে আরো কিছু কথা হয়তো বের হবে।"

"উনি যে সাংবাদিক এটা কি আপনারা কনফার্ম করতে পেরেছেন?"

ফোনের ওপাশে কয়েক মুহূর্তের নীরবতা নেমে এলো। "না, মানে, আমি এটা ওসিকে বলি নি।"

আস্তে করে দীর্ঘশ্বাস ফেললো আক্ষেপে। "আমার মনে হয় মহাকাল এ ফোন করে খুব সহজেই এটা চেক করা সম্ভব।"

"তা তো ঠিকই। আপনি এ নিয়ে একদম চিন্তা করবেন না। তোফাজ্জল খুবই ধুরন্ধর লোক সে নিজেই এটা চেক করে দেখবে। ক্রিমিনালের মুখের কথা সে পটাপট বিশ্বাস করবে না। তারপরও, আমি এক্ষুণি বলে দিচ্ছি তাকে।"

"থ্যাঙ্ক ইউ, ভেরি মাচ।"

"আরে, এই সামান্য কাজের জন্য আবার থ্যাঙ্কস-ট্যাঙ্কসের কী দরকার।"

মুচকি হাসলো মুশকান। "কেন, থ্যাঙ্কসে কি মন ভরছে না?"

হালকা হাসির শব্দ শোনা গেলো ওপাশ থেকে। "মন তো ভরছে কিন্তু পেট ভরছে না। আই মিন, আপনার হাতের স্পেশাল কিছু খাই না অনেকদিন হলো।"

অসভ্য! মনে মনে বলে উঠলো মুশকান। আরেকটা পেট ফুলিয়ে খাওয়া গর্দভ!

"কী যে বলেন, আপনাদের মত মানুষজনের জন্যই তো রবীন্দ্রনাথ দিলাম এখানে... যতোদূর মনে পড়ে গতপরশু আপনি গেছিলেনও।"

"আরে ম্যাডাম, ওখানে গিয়ে খাওয়া আর আপনার সামনে বসে আপনার হাতের রান্না করা খাওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে না?"

নিঃশব্দে বাঁকাহাসি দিলো মুশকান। "সমস্যা কি..সামনের শুক্রবারে চলে আসুন না? একটা নতুন কুইজিন নিয়ে কাজ করছি। অরিজিনটা স্প্যানিশ হলেও ওটা এখন মেক্সিকান কুইজিন হিসেবেই বেশি পরিচিত। একটু ঝাল, তবে আশা করি আপনার ভালো লাগবে।"

"উফ! আমার তো শুনেই জিভে পানি এসে গেছে। কেন যে আজকে বললেন...জাস্ট একদিন আগে বললেই হতো। এখন তিনদিন কি করে অপেক্ষা করি, বলেন তো?"

আকাশের দিকে তাকালো মুশকান। পুরুষ মানুষের ন্যাকামি তার কাছে অসহ্য লাগে। মনে হয় চোখের সামনে অসভ্য এক বামন লাফাচ্ছে। সার্কাস!

"কি আর করবেন, বলেই যখন ফেলেছি কষ্ট করে একটু অপেক্ষা করুন, আশা করি প্রতীক্ষার ফল সুস্বাদুই হবে।"

"হা-হা-হা," অট্টহাসি শোনা গেলো ওপাশ থেকে। "এ-ব্যাপারে আমার মনে কোনো সন্দেহই নেই।

"ঠিক আছে তাহলে? শুক্রবার আমার বাসায় ডিনার করছেন।"

“অবশ্যই, অবশ্যই, ম্যাডাম।”

“থ্যাঙ্কস অ্যাগেইন।”।

ফোনটা কান থেকে নামিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। এইসব নিম্নরুচির মানুষজনদের সাথেও সম্পর্ক বজায় রাখতে হয় বলে নিজেকে একটুখানি করুণাই করলো সে।

.

অধ্যায় ২৪

ভুয়া সাংবাদিকের দিকে ঘৃণাভরে তাকিয়ে আছে আতর। এই লোকটার সাথে তিনদিন ধরে ওঠাবসা করেছে, সাহায্য করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, অথচ ঘুণাক্ষরেও টের পায় নি সে ভুয়া! তার ইচ্ছে করছে লোকটার মুখে থুতু মারতে। বিশেষ করে ধরা খাওয়ার পরও লোকটার মধ্যে কোনো লজ্জা শরমের বালাই নেই দেখে রাগে সারা গা রি রি করে উঠলো। উল্টো এমন ভাব করছে যেনো ভুয়া সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে সে তেমন কোনো অন্যায়ই করে নি।

“এখন তাইলে বইলা ফালান, আপনি আসলে কে?” ওসি তোফাজ্জল হোসেন অনেকক্ষণ ধরে ডেস্কের উপরে রাখা পেপার ওয়েটটা নিয়ে নাড়াচাড়া করার পর জানতে চাইলো।

এসআই আনোয়ার মারমুখি হয়ে উঠে দাঁড়ালেও এখন বসে আছে। তাকে শান্ত থাকার নির্দেশ দিয়েছে ওসি। নিজের চেয়ারে বসে পড়লেও আনোয়ারের চোখমুখ দিয়ে ক্রোধ উপচে পড়ছে যেনো।

ছফা নির্বিকার ভঙ্গিতে বসে আছে চেয়ারে। “আমি নুরে ছফা...এটা কিন্তু একদম সত্যি। এরমধ্যে কোনো ভেজাল নেই।”

ওসি মুচকি হেসে মাথা দোলালো। "এইজন্যেই মানুষ বলে চোরের মা'র বড় গলা।"

এবার মুচকি হাসলো ছফা। তার হাসিতে তাচ্ছিল্য করার ভঙ্গি আছে।

"আমি বলতাছি, তুই কইথেকা আইছোস? কি করোস, মাদারচোদ্দ?!" পেপারওয়েটটা ডানহাতের মুঠোয় ধরে ক্ষিপ্তভঙ্গিতে বললো ওসি।

ছফা স্থিরচোখে চেয়ে রইলো ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দিকে। "পেপারওয়েটটা হাত থেকে রেখে কথা বলেন, একদম শান্তকণ্ঠে বললো সে, "নইলে রাগের মাথায় কিছু করে ফেললে পরে কিন্তু খুব পস্তাতে হবে।"

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলো ওসি। নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে গেছে তার। কিছু বলতে যাবে তার আগেই ছফা আবার কথা বলে উঠলো।

"এবার কিন্তু সুন্দরপুরের চেয়েও খারাপ জায়গায় ট্রান্সফার হয়ে যাবেন। তিন-চার বছরে কোনো শহরের মুখ দেখবেন না।"

মনের অজান্তেই পেপারওয়েটটা নামিয়ে রাখলো ওসি। "তু-তুই কে?" তোতলালো সে।

"বললাম তো আমি নুরে ছফা। কোনো সাংবাদিক নই। ওটা আমি বলেছি অন্য কারণে।"

ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো তোফাজ্জল হোসেন। হঠাৎ হাত তুলে আনোয়ারকে থামিয়ে দিলো, সে চেয়ার ছেড়ে উঠে আসতে যাচ্ছিলো। এসআই থমকে দাঁড়ালেও চেয়ারে আর বসলো না। আতর আলী অবিশ্বাসের সাথে চেয়ে আছে ছফার দিকে। তার বিশ্বাসই হচ্ছে না ওসির সাথে কোনো ভুয়া সাংবাদিক এভাবে কথা বলতে পারে।

"আরেকটা কথা," ডানহাতের তর্জনি উঁচিয়ে বললো নুরে ছফা, "এই তুই-তোকারিটা বন্ধ করেন। আর আপনার ঐ এসআইকে বলেন এই ঘর থেকে চলে যেতে। আপনার সাথে

আমার অনেক জরুরি কথা আছে।”

ওসি যারপরনাই বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলো তার সামনে বসা ভুয়া সাংবাদিকের দিকে। কী বলবে বুঝতে পারছে না।

“আপনার ভালোর জন্যই বলছি,” আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বললো ছফা।

এসআই আনোয়ার বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে ওসির দিকে। আতর আলী একবার ছফা আরেকবার ওসিকে দেখছে। সে কিছুই বুঝতে পারছে না। তার কেবল মনে হচ্ছে এই লোক ভুয়া সাংবাদিক হতে পারে কিন্তু তার ভাব ভঙ্গি ভুয়া নয়।

“তোমরা দুইজনে...” আস্তে করে কথাটা বলেই ঢোক গিললো ওসি। “...একটু বাইরে যাও।”

এসআই আর আতর অবিশ্বাসে তাকালো একজন আরেকজনের দিকে। তারপর চুপচাপ কোনো কথা না বলে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো।

ওসি ঢোক গিলে তাকালো নুরে ছফার দিকে। “আ-আপনে...?” প্রশ্নটা শেষ করতে পারলো না।

“বলছি, তার আগে একগ্লাস পানি দিন,” বেশ আদেশের সুরে বললো। সে।

সুন্দরপুরের ওসি তার ডেস্কের উপরে রাখা মিনারেল ওয়াটারের বোতলটা বাড়িয়ে দিলো। “এ-এই যে, নিন।”

তুই থেকে আপনিতে চলে আসায় মজাই পেলো নুরে ছফা। বোতলটা হাতে নিয়ে ঢক ঢক করে পান করে নিলো।

*

থানার বারান্দায় নিরুপ দাঁড়িয়ে আছে আতর আর এসআই আনোয়ার। তারা ভালো করেই জানে, কোনো ভুয়া সাংবাদিকের কথায় ওসি তাদের ঘর থেকে চলে যেতে বলে নি। নিশ্চয় এরমধ্যে কোনো ব্যাপার আছে।

"ঘটনা কি?" মুখ খুললো ইনফর্মার।

"বুঝতাছি না," আস্তে করে বললো এসআই। পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালো সে। বোঝাই যাচ্ছে খুব টেনশনে পড়ে গেছে। সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে আতরের দিকে তাকালো। এখনও সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে। "এই লোকটা আসলে কে?"

কাঁধ তুললো ইনফর্মার। "আমি কেমনে কমু? এতোদিন তো মনে করছি সাম্বাদিক... এখন দেহি ভুয়া।"

জোরে জোরে সিগারেটে টান দিলো এসআই। তার চোখেমুখে স্পষ্ট আতঙ্ক। নুরে ছফা নামের ভুয়া সাংবাদিককে বেশ কয়েকটা কিল-ঘুষি দিয়েছে, খুব খারাপ ব্যবহারও করেছে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে লোকটা সাধারণ কেউ নয়। তার ক্ষমতার দৌড় কতোটুকু হতে পারে সেটাও ধারণা করতে পারছে না।

এসআই আনোয়ারের চিন্তিত ভাবভঙ্গি দেখে আতর চুপ মেরে গেলো। আর কোনো প্রশ্ন না করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো বারান্দার একটা পিলারে হেলান দিয়ে।

দশ-পনেরো মিনিট পর ওসির ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ছফা। আতর আর এসআই আনোয়ার ঘুরে দাঁড়াতেই তাকে দেখতে পেলো। দু-জনের চেহারা হতবুদ্ধিকর। আনোয়ারের ঠোঁটে সিগারেটের শেষ অংশটুকু যেনো বেখেয়ালে আটকে আছে।

ছফা ধীরপায়ে এসে দাঁড়ালো দু-জনের সামনে। এসআই'র ঠোঁট থেকে সিগারেটটা নিজের হাতে নিয়ে মাটিতে ফেলে পা দিয়ে পিষে ফেললো। "থানা কম্পাউন্ডে ধুমপান

নিষেধ?” কাছের দেয়ালে লাগানো সাইনটার দিকে ইঙ্গিত করলো সে। “অন্যদের চেয়ে আইনের লোকদের একটু বেশিই আইন মানতে হয়...বুঝেছো?”

ছফার এমন ব্যবহারে আনোয়ার রীতিমতো হতভম্ব হয়ে ফ্যালফ্যাল চোখে চেয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারলো না। আর একটু ধন্দে পড়ে গেলেও দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে তাকালো এসআই'র দিকে, সে এখনও ধাতস্থ হতে পারে নি।

এসআইর গালে আলতো করে চাপড় মেরে বললো ছফা, “তোমার হিসেব পরে করবো। এইসব ফালতু ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো সময় আমার হাতে নেই এখন।” এবার ইনফর্মারের দিকে ফিরলো সে, “আতর?”

“জি, স্যার?” আতর আলী জানে না সে কেন স্যার বললো, কিন্তু লোকটার ভাবভঙ্গিই এমন, স্যার না-বলে পারে নি।

“এদিকে আসো,” বলেই সে হাটা ধরলো। ভয়ে জড়োসরো হয়ে তার পেছন পেছন চলতে লাগলো ইনফর্মার।

থানার মেইনগেটের বাইরে এসে দাঁড়ালো ছফা। “শোনো আতর, আমি কোনো সাংবাদিক নই। আমি ডিবিতে আছি।”

সম্ভ্রম এবং বিস্ময় মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলো ইনফর্মারের চোখেমুখে।

“তুমি আর আমি কিনতু আগের মতোই কাজ করবো, ঠিক আছে?” মাথা নেড়ে সায় দিলো আতর আলী। তার মুখের জবান বন্ধ হয়ে গেছে।

প্রসন্নভাবে হাসলো ছফা। সুন্দরপুরে আসার আগেই এখানকার থানায় কাজ করে গেছে এমন একজনের কাছ থেকে আতর আলী বিবিসির খোঁজ পেয়েছিলো।

“তোমার মোবাইলফোনটা ঠিক আছে তো?”

“জি-জি, স্যার…তয় ডিচপ্লে-”

হাত তুলে থামিয়ে দিলো তাকে। “জানি। এখন মন দিয়ে আমার কথা শোনো।” আতরের কাঁধে হাত রাখলো নুরে ছফা। “ফোনটা চালু রেখো, যেকোনো সময় আমি তোমাকে ফোন দেবে। এখানে তুমি ছাড়া আর কারোর উপরে নির্ভর করতে পারছি না।”

ইনফর্মারের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

.

অধ্যায় ২৫

সুন্দরপুরের এসপি মনোয়ার হোসেন ভয়ার্ত চোখেমুখে নিজের ডেস্কে বসে আছে, তার সামনে বসে আছে নুরে ছফা। একটু আগে থানার ওসির সাথে কথা বলে ফোনটা যেই না রাখতে যাবে অমনি ভুতের মতো হাজির হয় এই লোক। কাকতালীয় ব্যাপার হলো, লোকটার পরিচয় ওসির কাছ থেকে পেতে পেতেই সশরীরে হাজির হয়েছে সে।

প্রথমে তাকে ঢুকতে দেখে অবাক হয়েছিলো এসপি। “আপনি?” হুট করে তার অফিসে একজন অপরিচিত লোককে ঢুকতে দেখে চমকে উঠে বলেছিলো সে।

“নুরে ছফা” কথাটা বলেই এসপির সামনে বসে পড়ে।

মনোয়ার হোসেন বিস্ময়ে চেয়ে থাকে তার দিকে।

“আশা করি চিনতে পেরেছেন।”

আলগোছে ঢোক গিলে চেয়ে থাকে সে। এইমাত্র সুন্দরপুর থানার ওসির কাছ থেকে নুরে ছফা নামের একজনের পরিচয় জানতে পেরেছে, আর সেটা মোটেও সুখকর কিছু নয়। ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দেবার পর পরই তাকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক ক্ষমতাধর

ব্যক্তির সাথে কথা বলিয়ে দিয়েছে। ক্ষমতাধর ব্যক্তির আদেশটি খুব পরিস্কার-নুরে ছফা নামের ডিবির যে অফিসার সুন্দরপুরে অবস্থান করছে, তাকে সব ধরণের সহযোগীতা করতে হবে, এক্ষেত্রে কোনোরকম গাফিলতি সহ্য করা হবে না।

"পরিচয় গোপন রাখার কোনো দরকারই ছিলো না..আপনি আরো আগে আমার সঙ্গে দেখা করলে ভালো হতো," টেলিফোনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সেই লোকের সাথে কথা শেষ করার পর কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বলে উঠলো মনোয়ার হোসেন।

"আমি যদি এখানে আসার পরপরই জানতে না পারতাম ঐ মুশকান জুবেরির সাথে আপনাদের এতো ভালো খাতির তাহলে অবশ্যই পরিচয় গোপন রাখতাম না।"

ছফার কথা শুনে এসপি কোনো জবাব দিলো না।

"প্রাইমারি ইনভেস্টিগেশনটা শেষ হবার পর অবশ্যই আপনাদের সাথে যোগাযোগ করতাম; সব খুলে বলতাম, কিন্তু তার আগেই " রুমাল দিয়ে বামঠোঁটের কোণ মুছে নিলো সে।

সেদিকে তাকিয়ে কাচুমাচু খেলো এসপি। বেশ ফুলে আছে। বোঝাই যাচ্ছে কেটে গিয়ে রক্তও ঝরেছে। বাম চোখের নীচেও আঘাতের চিহ্ন সুস্পষ্ট, আর এসবই করা হয়েছে তার সরাসরি নির্দেশে।

"আমি খুবই সরি..." লজ্জিত ভঙ্গিতে বললো মনোয়ার হোসেন। "মানে, আমরা তো ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারি নি আপনি ডিবি থেকে এসেছেন। ভেবেছিলাম আবারো কেউ ম্যাডামের পেছনে লেগেছে।"

ছফার ভুরু কুচকে গেলো। "আবারো কেউ পেছনে লেগেছে মানে?"

“না, মানে ঐ যে…উনার রেস্টুরেন্টের তো অনেক রেপুটেশন…উনার খাবারগুলোও অসাধারণ…এইসব নিয়ে জেলাস হবার লোক তো কম নেই। অনেকেই আবার উনার সিক্রেট রেসিপিগুলো সম্পর্কে জানতে চায়…” একটু থেমে বললো এসপি, “গত বছর এরকম এক ফেউ উনার পেছনে লেগেছিলো।”

“সিক্রেট রেসিপি?” বাঁকাহাসি দিয়ে বললো ছফা।

“উনার অসাধারণ খাবারগুলোর রেসিপি কিন্তু কেউ জানে না। ওগুলো একদম সিক্রেট।”

“রেসিপি আবার সিক্রেট হয় নাকি, আজব কথা,” একটু বিরতি দিয়ে বললো সে, “আজকাল তো টিভি খুললেই রান্না-বান্নার অনুষ্ঠান দেখা যায়। ওখানে সবাই আগ বাড়িয়ে নিজেদের রেসিপি বলে। একদম ডিটেইল। এমনকি দেখিয়েও দেয়। এই যুগে রেসিপি সিক্রেট রাখার মানে কি? সিক্রেট রেসিপি বলে কিছু আছে বলেও তো মনে হয় না।”

“কি বলেন?” এসপিকে খুব আশাহত মনে হলো। “এখনও সারা দুনিয়া জানে না কোকাকোলার রেসিপি.. আই মিন, ওটার ফর্মুলাটা কি। কোকাকোলা কোম্পানি এই ফর্মুলাটি একশ’ বছরেরও বেশি সময় ধরে সিক্রেট রেখেছে।

ছফা কিছু বললো না। কথাটা সত্যি।

“পৃথিবীতে এরকম অনেক খাবারের রেসিপিই সিক্রেট।” একটু থেমে আবার বললো, “বিদেশের কথা বাদ দেন, আমাদের দেশেও কিন্তু এরকম সিক্রেট রেসিপি আছে।”

ছফা জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো কেবল।

“ধরুণ ঢাকার হাজির বিরিয়ানি…সত্তর বছর ধরে চলছে…কিন্তু ওটার রান্না করার ধরণ আর একজ্যাক্ট রেসিপিটা এখনও অজানা।”

"ঐ মহিলা নিজে কিন্তু সব রান্না করে না...ওগুলো করে তার বেতনভুক্ত বাবুর্চিরা " বললো ছফা। "চাইলেও সে রেসিপিগুলো সিক্রেট রাখতে পারবে না। নাকি অন্য কোনো উপায়ে এটা করা হয়?"

মনোয়ার হোসেন স্থিরচোখে চেয়ে রইলো। কী বলবে বুঝতে পারলো না। একদিক থেকে কথাটাতে যুক্তি আছে। কিন্তু এটাও সত্যি, মুশকান। জুবেরির অপার্থিব খাবারগুলো তার বাবুর্চিরা নকল করতে গিয়েও ব্যর্থ হয়েছে কয়েকবার। দুয়েকজন রবীন্দ্রনাথে কাজ করার পর নিজেরাই রেসিপিগুলো নকল করার চেষ্টা করেছিলো কিন্তু কাজ হয় নি। সেই স্বাদ আর সেই গন্ধ তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা। এর কারণটাও এসপি জানে। মুশকান জুবেরি একজন অসাধারণ মহিলা। তিনি এতোটা বোকা নন যে, রেসিপির সিক্রেটগুলো অরক্ষিত রাখবেন। সত্যি বলতে প্রতিটি রেসিপি তিনি বাবুর্চিদের কাছে উনমুক্ত করে দিয়েছেন, কেবল একটা জিনিস বাদে ঐ একটা জিনিসই তার সমস্ত রেসিপিগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছে। প্রতিটি রেসিপির জন্য ভদ্রমহিলা একটি বিশেষ ধরণের সিরাপ আবিষ্কার করেছেন। ঐ সিরাপের ফর্মুলা তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না। গতবছর তার এই সিক্রেটটা জানার জন্য যখন এক ফেউ উঠেপড়ে লাগলো তখন মিসেস জুবেরি নিজের মুখে এ-কথা স্বীকার করেছেন তার কাছে।

"যাহোক, মুশকান জুবেরির সিক্রেট রেসিপি নিয়ে আমার কোনো আগ্রহ নেই," এসপিকে চুপ থাকতে দেখে বললো ছফা। "যদি না আমার ইনভেস্টিগেশনের সাথে সেটা কোনোভাবে কানেক্টেড থাকে।"

মনোয়ার হোসেন কয়েক মুহূর্ত ভেবে বললো, "আপনি যে কেসটা ইনভেস্টিগেট করছেন সেটা কি জানতে পারি?"

"অবশ্যই। আপনাকে তো এখন সবই জানাতে হবে, নইলে আপনার কাছ থেকে হেল্প নেবো কিভাবে।"

“আমার পক্ষে যতোদূর সম্ভব আমি সাহায্য করবে। এ নিয়ে কোনো চিন্তাই করবেন না।”

“থ্যাঙ্কস।”

“আসলে আমার বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে…”

নুরে ছফা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো এসপির দিকে। “কোটার কথা বলছেন?”

“এই যে..মুশকান জুবেরির মতো একজন রুচিশীল, সংস্কৃতবান মহিলাও ক্রাইমের সাথে জড়িত থাকতে পারে?”

“সংস্কৃতবান মহিলা?” একটু ব্যঙ্গ করে বললো ছফা।

“হুম। উনাকে যারা চেনে তারা সবাই এটা জানে। উনি রবীন্দ্রনাথের বিরাট বড় ভক্ত।”।

“রবীন্দ্রনাথের বিরাট বড় ভক্ত এটা কিভাবে বুঝলেন?” মুচকি হেসে জানতে চাইলো ডিবির ইনভেস্টিগেটর।

“এটা তো খুবই সোজা। ভক্ত না হলে কি কেউ নিজের রেসটুরেন্টের নাম রবীন্দ্রনাথের নামে রাখবে?”

“আপনি ভুল করছেন। উনি রবীন্দ্রনাথের নামে রেস্টুরেন্টের নাম রাখেন নি…উনি রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসেন নি। এর পেছনে অন্য কারণ থাকতে পারে…কিংবা নিছক ব্যবসায়িক বুদ্ধি। অদ্ভুত নাম…সহজেই মানুষকে আকর্ষিত করে, বুঝলেন?”

এসপি কিছু বললো না। এর মানে এই না যে উনি বিরাট বড় রবীন্দ্রভূক্ত”

“উনি কিন্তু আমাকে অন্য কথা বলেছেন,” আস্তে করে বললো মনোয়ার হোসেন।

“কি বলেছে?”

“আমি একবার উনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এরকম নাম কেন রেখেছেন…জবাবে আমাকে বলেছেন, সেই ছোটোবেলা থেকেই নাকি উনি। রবীন্দ্রনাথের ভক্ত। দিনের শুরু আর শেষ করেন রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনা তার একাধিকবার পড়া।” একটু থেমে আবার বললো এসপি, “তো এই রেস্টুরেন্টটা যখন দিলেন তখন নাম খুঁজে পাচ্ছিলেন না। একদিন হঠাৎ করেই উনার মনে হলো, এই যে তার জাদুকরী রান্না কতো শত লোক পরখ করে দেখবে, প্রশংসা করবে কিনতু তার প্রিয় ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ কখনও এসব খেতে আসবেন না এখানে, এই আক্ষেপ থেকেই এমন অদ্ভুত আর সুন্দর নাম রেখেছেন।”

ভুরু কপালে তুলে বাঁকাহাসি দিলো ছফা। নাম রাখার আসল কারণটা সে জানে। মহিলা এসব ফালতু কথা বলে বেশ ভালো রহস্যই সৃষ্টি করতে পেরেছে। তার সামনে বসে থাকা পুলিশের উচ্চপদস্থ এক কর্মকর্তা এসব গল্প বিশ্বাস করে বসে আছে।

“যাহোক, একটা কথা আমি বলে দিচ্ছি, এখন থেকে ঐ মহিলার সাথে কোনো রকম যোগাযোগ রাখবেন না। আমি যে তার ব্যাপারে ইনভেস্টিগেট করছি সেটা যেনো ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে।”

এসপি আলতো করে ঢোক গিলে মাথা নেড়ে সায় দিলো। “ঠিক আছে।”

“ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস কিন্তু।

“বুঝতে পেরেছি।”

“গুড।”

একটু চুপ থেকে বলে উঠলো এসপি, “আশা করি যা হয়েছে তা ভুলে যাবেন…আই মিন, আমি ওসবের জন্য সরি।”

হাত তুলে ভদ্রলোককে থামিয়ে দিলো নুরে ছফা। "আপনি আইনের লোক, যতক্ষণ পর্যন্ত আইনের মধ্যে থেকে কাজ করবেন ততোক্ষণ পর্যন্ত সরি বলার দরকার পড়বে না। কিন্তু আইনের বাইরে গেলে সরি বলেও সব মিটমাট করা যাবে না। কথাটা মনে রাখবেন।"

এসপি দীর্ঘশ্বাস ফেললো কেবল। ভালো করেই বুঝতে পারছে আরেকটা বাজে বদলির শিকার হতে যাচ্ছে।

"কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, আপনারা শুধু আইনের বাইরে গিয়েই কাজ করেন নি.. রীতিমতো একজন সন্দেহভাজন অপরাধীর পক্ষ নিয়ে পেটোয়া বাহিনীর মতো আচরণ করেছেন।"

"এসব জানলে তো আমরা

আবারো তাকে থামিয়ে দিলো। "এখন থেকে মনে রাখবেন, আমি যে কেসটা নিয়ে কাজ করছি সেটার প্রাইম সাসপেক্ট হলো ঐ মুশকান জুবেরি।"

ডেস্কের উপর রাখা পানির গ্লাসটা তুলে নিলো মনোয়ার হোসেন। ঢকঢক করে পান করলো সে। "কিন্তু কেসটা কি সেটা তো এখনও বললেন না?"

"বলছি...তার আগে এক কাপ কড়া লিকারের চায়ের ব্যবস্থা করুন।"

৬. নুরে ছফার আপাত অমীমাংসিত কেস

অধ্যায় ২৬

নুরে ছফার আপাত অমীমাংসিত কেস

ডিবির জাঁদরেল ইনভেস্টিগেটর নুরে ছফার দশ বছরের চাকরি জীবনে কোনো অমীমাংসিত কেস নেই। এ নিয়ে তার গর্ব ছিলো কিন্তু অনন্য এই রেকর্ডটি মারাত্মকভাবে হুমকির শিকার হয় গত বছরের একটি মিসিং কেস' তদন্ত করতে গিয়ে। পুলিশ থেকে সিআইডি ঘুরে ডিবিতে দেয়া হয়েছিলো সেটা। বড়কর্তাদের আশা ছিলো ডিবির চৌকষ ইনভেস্টিগেটর নুরে ছফা নিশ্চয়ই এটার সুরাহা করে নিজের রেকর্ডটা অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে। সবাই যখন ব্যর্থ তখন একজনই কেবল সমাধা করতে পারে, আর সেটি নুরে ছফা ছাড়া আর কেউ নয়-এমন বদ্ধমূল ধারণা ডিপার্টমেন্টে এরইমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তার সক্ষমতার কথা উপরমহলে এতোটাই প্রচারিত যে, অনেক সময় এক ধরণের ভীতিও কাজ করে তাকে নিয়ে। এটি এমন এক ভীতি যা ছফাকে অন্যভাবে গর্বিত করে।

দু-বছর আগে আলোচিত এক সাংবাদিক-দম্পতির হত্যার তদন্ত সাংবাদিক মহলের প্রবল চাপ থাকা সত্ত্বেও তার কাছে অর্পণ করা হয় নি শুধুমাত্র কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের হয়ে যাবে বলে। কর্তারা চায় নি সাপটা বেরিয়ে পড়ুক। কেসটা একে-ওকে দিয়ে সময়ক্ষেপন করা হয়। ফলে দীর্ঘ দুই বছরেও ওটার কোনো সুরাহা হয় নি।

যাইহোক, মিসিং-কেসটা হাতে পেয়ে চ্যালেঞ্জ অনুভব করেছিলো ছফা। সে জানতো খুনের ঘটনার চেয়ে নিখোঁজ আর গুমের ঘটনা একটু বেশি কঠিন হয়। তবে এতোটা কঠিন নয় যে, সমাধানই করা যাবে না। দু দুটো সরকারী প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ হবার পর তার হাতে কেসটা অর্পণ করার একটাই মানে-শেষ পর্যন্ত তার উপরেই আস্থা রাখা হয়েছে। যদিও ঈর্ষান্বিত কলিগদের কেউ কেউ মুখ ফুটে একটি আশংকার কথা বলতেও ভুলে যায় নি সমাধানের অযোগ্য একটি কেস দেয়া হয়েছে তার ক্যারিয়ারে ব্যর্থতার কলঙ্ক এঁটে দেয়ার জন্য। নিশ্চয়ই ঈর্ষাকাতর কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার কুমতলব এটি।

ছফা অবশ্য এরকম কিছু ভাবে নি। সে ভালো করেই জানতো কেন তাকে এই কেসটির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ছেলেটা সাধারণ কোনো পরিবারের নয়, যারা পুলিশের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াবে আর কাকুতি মিনতি জানিয়ে নিজের সন্তানের হদিশ করবে। কেসটা দেবার আগে ডিবির কমিশনার তাকে ডেকে গোপন একটি কথা বলেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর অফিসের এক শীর্ষকর্মকর্তার ইচ্ছেয় এই কেসটা তাকে দেয়া হয়েছে। ভিক্টিম সেই কর্মকতার আপন বড়বোনের ছেলে। সঙ্গত কারণেই ভাগ্নের জন্য মামা বেশ উদ্বিগ্ন। ভাগ্নের পরিণতি কি হয়েছে, আর কে এর জন্যে দায়ি সেটা জানতে বদ্ধপরিকর ভদ্রলোক। লোকেমুখে ছফার সাফল্যের কথা শুনেই তিনি কেসটা ডিবিতে ট্রান্সফার করিয়েছেন আর ব্যক্তিগতভাবে কমিশনারকে অনুরোধ করেছেন, তদন্তের দায়িত্বটি যেনো অবশ্যই তাকে দেয়া হয়।

কেসটা যখন ছফার হাতে এলো সে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারে নি এটা তাকে কতোটা ভোগাবে। ত্রিশ বছরের এক স্মার্ট আর কর্পোরেট এক্সিকিউটিভ নিখোঁজ। কথা নেই বার্তা নেই লোকটা দুনিয়া থেকে উধাও হয়ে গেছে। অফিসের কলিগের জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার পাঁচটার পর কাজশেষে যথারীতি অফিস থেকে বেরিয়ে যাবার পর তার আর কোনো খবর নেই। ছফা বেশ তিক্ততার সাথেই দেখতে পেলো, কেসটার সামান্য অগ্রগতিও করতে পারে নি আগের তদন্তকারীরা। ফলে একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে হয় তাকে।

পুলিশ আর সিআইডির একগাদা ফাইল পড়ার পর ফিল্ডে নেমে পড়ে সে। ছেলেটা অবিবাহিত, থাকতে একদম একা, অভিজাত এলাকার নির্জন এক ফ্ল্যাটে। আশেপাশের কারো সাথে কোনো রকম যোগাযোগ রাখতো না। বাবা-মা, ভাই-বোন সবাই থাকে কানাডায়। অভিজ্ঞতা থেকে ছফা জানতো, এরকম অসামাজিক, পরিবারহীন লোকজনের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়াটা খুব কঠিন হয়।

ছেলেটার অফিসের কলিগদের সাথে দেখা করেও সুবিধা করতে পারলো সে। নিখোঁজ ছেলেটি মিশুক প্রকৃতির ছিলো না। অফিসের যে দু চারজনের সাথে তার বেশি খাতির তারা গুরুত্বপূর্ণ কিছুই জানাতে পারলো না। ওদের কাছ থেকে সামান্যতম ইঙ্গিতও বের করতে পারলো না সে। সবাই একই গল্প শোনালো নিখোঁজ হবার আগে হাসিব অন্যসব দিনের মতোই। অফিসের কাজে ডুবে ছিলো। তারপর কাজশেষে অফিস থেকে বেরিয়ে যায়। একজন কলিগ তাকে জিজ্ঞেস করেছিলো উইকেন্ডে সে কি করবে মাল্টিপ্লেক্সে হলিউডের একটা নতুন ছবি এসেছে, দেখবে নাকি? সে তাকে জানিয়েছিলো, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ছবিটা দেখতে পারছে না কারণ শুক্রবার তার একটা দাওয়াত আছে।

কিসের দাওয়াত?

আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবদের সাথে কথা বলেও তার কোনো হদিশ বের করতে পারে নি ছফা। ঐদিন ছেলেটার কোনো আত্মীয়, এমনকি পরিচিত কারোর কোনো অনুষ্ঠান ছিলো না। এটা খোঁজ করতে গিয়ে বরং সে জানতে পেরেছে, হাসিব একেবারেই অসামাজিক একটি ছেলে। নিকটাত্মীয়ের বিয়েতেও সচরাচর যায় না। অফিস থেকে বাসা, বড়জোর মাঝেমধ্যে সিনেমা দেখা। অফিসের বাইরে তার বন্ধুমহলটিও খুব ছোটো। ওদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগও রক্ষা করে না। বিদেশে থাকা বাবা-মা বিয়ের জন্য বেশ তাড়া দিলেও বিয়ে করতে রাজি হয় নি। ছফা ধরে নিয়েছিলো হাসিবের সাথে হয়তো কোনো মেয়ের সম্পর্ক আছে। কিন্তু এখানেও আশাহত হতে হয় তাকে।

নিখোঁজের পর পুলিশ এবং পরবর্তীকালে সিআইডি তদন্ত করেছে, অনেক লোকের সাক্ষাৎকার নিয়েছে। অনেককে সন্দেহ করে জিজ্ঞাসবাদও করেছে কিন্তু কোনো লাভ হয় নি। ছফা যখন তৃতীয়বারের মতো ঐসব লোকজনের সাথে কথা বলতে গেলো তখন স্বাভাবিক কারণেই সবাই বিরক্তি প্রকাশ করলো। একটা কেস নিয়ে পুলিশ বার বার তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, এটা কেমন কথা? ফলে ছফাকে একটু বেকায়দায় পড়তে হয়।

কেসটা হাতে পাবার এক মাস পরেও সে কিছুই করতে পারে নি। ব্যাপারটা তার জন্য রীতিমতো হতাশার ছিলো। এরকম সাদামাটা কেস নিয়ে যে বিপাকে পড়বে সেটা একদমই ধারণা করতে পারে নি। সারাদিন অফিস করে রাতে বাড়িতে গিয়েও প্রচুর কাগজপত্র, তথ্য ঘাঁটাঘাটি করতে শুরু করে। প্রায় কয়েক শ পৃষ্ঠার কাগজে লোকজনের ইন্টারভিউয়ের কপি, হাসিবের বিভিন্ন সময়ের ছবি, ক্রেডিট কার্ডের মানি ট্রানজাকশান, ব্যাঙ্কের কাগজ, তার ঘর থেকে পাওয়া নানান ধরণের দলিল-দস্তাবেজ, রিসিট, এরকম কাগজের স্তূপে ডুবে গিয়েও সামান্যতম কলু বের করা যায় নি।

দেড় মাসের মাথায় তার বস, ডিটেক্টিভ ব্রাঞ্চের কমিশনার নিজের হতাশা প্রকাশ করে ছফাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, শুধু তিনি নিজে নন, ছেলেটার মামা, প্রধানমন্ত্রীর অফিসের ঐ ক্ষমতাবান কর্মকর্তাও তদন্তের এমন বেহাল দশা দেখে অসন্তুষ্ট। ছফা তার চাকরি জীবনে প্রথমবারে মতো বসের রুম থেকে মাথা নীচু করে বের হয়ে আসে। নিরস্ত্র সৈনিকের চেয়েও বেশি অসহায় কলু আর এভিডেন্স ছাড়া একজন ইনভেস্টিগেটর। অবশ্য তার বস দয়া করে, সম্ভবত ছফার অনন্য কীর্তি অক্ষুণ্ন রাখার সুযোগ দেবার জন্য তাকে আরো এক মাসের সময় বাড়িয়ে দেয়।

ঐদিন রাতে বাসায় ফিরে গেলেও সারারাত তার ঘুম আসে নি। হাসিবের মতো একজন যুবক হঠাৎ করে কোথায় হারিয়ে যাবে? সে তো কোনো দুর্ঘটনায় পড়ে মারা যায় নি। পুলিশ

বহু আগেই এটা খতিয়ে দেখেছে। খারাপ কোনো লোকের পাল্লায় পড়ে কিডন্যাপও হয় নি। তাকে জিম্মি করে টাকা দাবি করার মতো ঘটনাও ঘটে নি।

তার ফিলোসফার অ্যান্ড গাইড কেএস খান ঢাকার বাইরে অন্য একটা কেস নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। বলা নেই কওয়া নেই এক সজ্জন ব্যক্তির ফ্ল্যাটে কোত্থেকে যেনো লাশ এসে হাজির! অজ্ঞাত মৃতলোকটি ফ্ল্যাটে কিভাবে ঢুকলো, কিভাবে খুন হলো সে-ব্যাপারে সামান্যতম কুলুও খুঁজে পায় নি পুলিশ। ফলে যা হবার তাই হয়েছে, তদন্তকারী কর্মকর্তা হালে পানি না পেয়ে কেএস খানের দ্বারস্থ হয়। পুলিশ আর ডিবির প্রায় সবাই কোনো কেসে সুবিধা করতে না। পারলে মি. খানের শরণাপন্ন হয়। ভদ্রলোকও কাউকে না করতে পারেন না।

অবশেষে ছফাও তাই করে কিনতু বেচারা কক্সবাজারে গিয়ে জ্বরে। পড়ে গেছিলো। জ্বরের ঘোরেই তার কাছ থেকে কেসটার ব্যাপারে সংক্ষেপে সব শুনে বলেন, আগের তদন্তকারীরা নিশ্চয়ই কোনো ভুল করেছে, আর সেই ভুলটা তাদের কাজের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। চলভাষায় স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে তিনি আরো বললেন, “নুরে ছফা, একটা কথা মনে রাখবেন, যে মাটিতে আছাড় খাইবেন সেই মাটি থেইকাই আপনেরে উঠতে হইবো।”

কেএস খান তাকে আশ্বস্ত করে বলেছেন, কক্সবাজার থেকে ঢাকায় ফিরে তিনি কেসটা দেখবেন। এই ফাঁকে ছফা যেনো আগের তদন্তের কিছু ভুল-ত্রুটি খুঁজে বের করে।

পরদিনই ছুটি নিয়ে নেয় সে, সারাদিন পড়ে থাকে নিজের ঘরে। কেসের যতো কাগজপত্র আছে সবকিছুতে আবার চোখ বুলাতে শুরু করে। লোকজনের ইন্টারভিউ, ভাষ্য, সব আরেকবার পড়তে শুরু করলো গভীর মনোযোগের সাথে। আগের ফাইলে থাকা হাসিবের কিছু ছবি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে গেলো, আর এটা করতে গিয়েই একটা বিষয় তার মাথায় এলো। আগের তদন্তকারীরা কি হাসিবের ঘনিষ্ঠ কারোর সাক্ষাৎকার বাদ দিয়েছে?

হাসিবের সাথে তার কলিগ আর বনধুবান্ধবদের কিছু ছবিতে চোখ বুলাতে গিয়ে সে চেক করে দেখলো এদের মধ্যে কার কার সাথে আগের তদন্তকারী অফিসাররা কথা বলেছে।

কাগজপত্র ঘেঁটে সে নিশ্চিত হলো পুলিশ আর সিআইডি একটি ছেলের ইন্টারভিউ নেয় নি। কিন্তু হাসিবের সাথে বেশ কিছু ছবিতে ঐ কলিগকে অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখা গেছে, অথচ তার কোনো ভাষ্য পলিশ কিংবা সিআইডি নেয় নি কেন?

পরদিন সকালে নিজের মোটরসাইকেলে করে ঐ কলিগের সাথে কথা বলার জন্য হাসিবের অফিসে চলে যায় ছফা। ঐ কলিগের সাথে কথা বলার সময় সে জানতে চায়, হাসিবের কি কোথাও যাবার প্ল্যান ছিলো? এরকম কিছু কি সে ঐদিন বলেছিলো?

না। এরকম কোনো কথা হাসিব তাকে বলে নি। কথাটা শুনে ছফা হতাশ হয়েছিলো, কিন্তু পরক্ষণেই ছেলেটা জানায়, তবে নিখোঁজ হবার দিন। হাসিব ওর কাছে জানতে চেয়েছিলো ভালো কোনো ট্যাক্সিক্যাব কোম্পানির নাম্বার দিতে পারবে কিনা।

ট্যাক্সিক্যাব?

হ্যাঁ। হাসিবকে সে গ্রিনল্যান্ড-ক্যাব কোম্পানির নাম্বারটা দিয়ে জানতে চেয়েছিলো, ক্যাব দিয়ে ও কি করবে। জবাবে ভিক্টিম বলেছে, সন্ধ্যার পর এক আত্মীয়কে এয়ারপোর্ট থেকে রিসিভ করতে হবে।

ছফা উত্তেজনায় টগবগ করতে শুরু করে। হাসিব তার ঘনিষ্ঠ কলিগকে বলেছে এক আত্মীয়কে এয়ারপোর্ট থেকে রিসিভ করতে হবে। অথচ অন্য এক কলিগকে সে বলেছিলো শুক্রবারে একটা বিয়ের দাওয়াত আছে।

অসঙ্গতি!

হাসিব কেন এরকম মিথ্যে বললো? তার নিকটজনেরা জানিয়েছে কোনো আত্মীয়কে এয়ারপোর্ট থেকে রিসিভ করার মতো ঘটনার কথা কারোর জানা নেই।

হুট করে এরকম কলু পেয়ে নড়েচড়ে বসলো সে। হাসিব মিথ্যে বলেছে। কেন বলেছে? কিছু একটা লুকানোর জন্য? অবশ্যই। সেটা কি? ছফা জানতো জবাবটা পাওয়া যাবে ঐ ট্যাক্সিক্যাব কোম্পানির কাছ থেকেই।

সঙ্গে সঙ্গে সে চলে যায় ট্যাক্সিক্যাব কোম্পানিতে। এক মুহূর্ত দেরি করার মতো মানসিক অবস্থায় ছিলো না। হাসিব ঠিক কোন দিন কতো তারিখে, আনুমানিক কয়টার দিকে ফোন করেছিলো সেটা জেনে নিয়েছিলো। ঐ ঘনিষ্ঠ কলিগের কাছ থেকে। ট্যাক্সিক্যাব কোম্পানি প্রথমে গাইগুই করলেও ছফার চাপাচাপিতে বাধ্য হয়েই পুরনো রেকর্ড ঘেঁটে দেখে, কিন্তু কয়েক মাসের পুরনো বলে ঐদিনের কোনো রেকর্ড সংরক্ষিত করা ছিলো না। ছফা এতে হতাশ না হয়ে অন্যভাবে চেষ্টা করে। ঐদিন গ্রিনল্যান্ড ক্যাব কোম্পানিতে কয়টি ক্যাব পথে ছিলো-সেগুলোর ড্রাইভার ছিলো কারা? কোম্পানি থেকে জানতে পারে, ঐদিন ক্যাবের সংখ্যা ছিলো একত্রিশটি। তার মধ্যে সাতাশজন ড্রাইভার বর্তমানে কর্মরত আছে, বাকিরা চাকরি ছেড়ে চলে গেছে, কোথায় গেছে সে সম্পর্কে তারা কিছু জানে না।

ছফা এরপর তিনদিন ধরে ঐ সাতাশজন ড্রাইভারকে ইন্টারভিউ করে যায়, হাসিবের একটি সাম্প্রতিক ছবি দেখিয়ে জানতে চায় এই লোককে তাদের মধ্যে কেউ প্যাসেঞ্জার হিসেবে পেয়েছিলো কিনা। তৃতীয় দিনে এক তরুণ ড্রাইভার হাসিবের ছবি দেখে জানায়, সম্ভবত লোকটাকে সে চিনতে পেরেছে। আগ্রহী হয়ে ওঠে ছফা। ড্রাইভার বলে, ঢাকার গুলশানের একটি অফিস থেকে প্যাসেঞ্জারকে তুলেছিলো। টেলিফোন করে ক্যাবটা বুকিং দেয়া হয়। ঠিক তখনই নুরে ছফা বুঝে গেছিলো এটাই সেই ড্রাইভার যে হাসিবকে তার গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েছিলো।

কিনতু গন্তব্যটা কোথায় ছিলো সেটা কি ড্রাইভারের মনে আছে? প্রশ্নটা করার আগে ছফা আশংকা করেছিলো, সম্ভবত অনেক দিন আগের ঘটনা বলে ড্রাইভারের পক্ষে গন্তব্যের কথাটা মনে না-ও থাকতে পারে। এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু তাকে চমকে দিয়ে ঐ ক্যাবচালক জানায় তার স্পষ্ট মনে আছে ঐ প্যাসেঞ্জারকে কোথায় নামিয়ে দিয়েছিলো।

কথাটা শুনে ছফা যারপরনাই বিস্মিত হয়। কিন্তু সে নিশ্চিত হতে পারছিলো না ক্যাবচালক কিভাবে এটা মনে রাখতে পারলো। ঠিক তখনই চালক তাকে ভড়কে দিয়ে আরেকটি তথ্য দেয়-হাসিবকে ওখানে পৌঁছে দেবার মাস দুয়েক আগে আরেকজন প্যাসেঞ্জারকে একই জায়গায়, একই রেস্টুরেন্টে নামিয়ে দিয়েছিলো সে। রেস্টুরেন্টটির অদ্ভুত নাম আর দু জন প্যাসেঞ্জারকে একই গন্তব্যে পৌঁছে দেয়ার কারণেই এতোদিন পরও ওই জায়গাটা ক্যাবচালকের মনে আছে।

সুন্দরপুরে? ওখানকার সড়কের পাশে একটি রেসটুরেন্টে?

রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসে নি??

.

অধ্যায় ২৭

এসপি মনোয়ার হোসেন অনেকক্ষণ চুপ মেরে সব শোনার পর গাল চুলকালো।

এরইমধ্যে চা দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়েছে ছফাকে। চায়ের কাপে পর পর কয়েক চুমুক দিয়ে শেষ করে রেখে দিলো সে। এসপি আরো আগেই নিজের কাপ খালি করেছে। ছফা এতোক্ষণ একনাগারে কথা বলছিলো বলে চায়ে খুব কমই চুমুক দিতে পেরেছে।

"বুঝলাম ঐ দু-জন নিখোঁজ ব্যক্তি ঢাকা থেকে রবীন্দ্রনাথে এসেছিলো," সুন্দরপুরের এসপি যথেষ্ট নরমকণ্ঠে বললো, "কিন্তু তার মানে তো এই নয়, ওদের নিখোঁজের সাথে মিসেস জুবেরি জড়িত?"

"দু-জন মানুষ একই গন্তব্যে আসার পর নিখোঁজ হয়ে যাওয়াটা কি খুব বেশি কাকতালীয় হয়ে যায় না?" ছফা পাল্টা জানতে চাইলো।

"তা ঠিক," এসপি থুতনি চুলকালো। "আমি কিন্তু তা বলছি না, আমি বলতে চাচ্ছি... এমনও তো হতে পারে, অন্য কেউ বা কোনো গ্রুপ এসবের সাথে জড়িত...তারা হয়তো রবীন্দ্রনাথকে সেফ-প্লেস হিসেবে ব্যবহার করেছে?"

ছফা মুচকি হাসলো কথাটা শুনে। "দুই-দু-জন লোক রবীন্দ্রনাথে এসে নিখোঁজ হয়ে গেছে-এটা জানার পর আমি ঢাকার থানাগুলোতে চেক করে দেখেছি একই রকম নিখোঁজ হবার আনসলভ কেস তাদের কাছে আছে কিনা। সব রেকর্ড চেক করার পর এরকম আরো তিনটি কেস পাওয়া গেছে। হুট করে তারা কাউকে কিছু না বলে একদিন উধাও হয়ে গেছে। তাদের সবার বয়স ত্রিশ থেকে পয়ত্রিশের মধ্যে। সবাই ভালো চাকরি করতো। সিঙ্গেল ছিলো।"

এসপি হা করে চেয়ে থেকে অবশেষে বললো, "ওই তিনজনও কি এখানে এসেছিলো?"

"না। সেটা এখনও জানা যায় নি। তবে আমার মনে হয় ওই তিনটি ঘটনাও এই কেসের সাথে সম্পর্কিত। সম্ভবত তারাও একইরকম ভাগ্য বরণ করেছে এখানে এসে।"

"কি রকম?"

"আশা করি সেটা খুব জলতি জানতে পারবো।"

"এমন কি হতে পারে না," নরম কণ্ঠে বললো এসপি, "সংঘবদ্ধ একটি গ্রুপ এসবের সাথে জড়িত। ওরা হয়তো এখানেই, এই সুন্দরপুরে অপারেট করে?"

"যুক্তির খাতিরে যদি বলেন, তাহলে এটা অবশ্যই হতে পারে।"

এসপি নিজের হাইপোথিসিস বলতে উৎসাহী হয়ে উঠলো। "অনেকটা ছিনতাইকারীদের মতো আর কি..তারা একটা জায়গা বেছে নেয় নিরাপদে ছিনতাইয়ের জন্য। তার মানে তো

এই নয়, ঐ জায়গার মালিক কিংবা আশেপাশে যারা থাকে তারা ছিনতাইর সাথে জড়িত?”

“আমি কিন্তু এটা জানার পরই ঐ মহিলাকে সাসপেক্ট করি নি,” আস্তে করে বললো ছফা। “এখানে আসার আগে আমি আসলে জানতামই না রেস্টুরেন্টটির অসাধারণ খাবারের কথা আর তার মালিক একজন মহিলা।”

এসপি চুপ মেরে গেলো।

“তার চেয়েও বড় কথা রেস্টুরেন্টটা যে মিটিংপ্লেস হতে পারে সেটাও ধরে নিয়েছিলাম কিন্তু এর অদ্ভুত নাম আর রহস্যময়ী মালিক আমার মনোযোগ আর্কষণ করলো, কারণ এই কেসটার সাথে রবীন্দ্রনাথের একটা কানেকশান আছে।”

“মানে?” এসপিকে খুবই বিস্মিত দেখালো।

“আমি যে ভিক্টিমের মিসিং-কেসটা নিয়ে কাজ করছি তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে চারুলতা নামের রহস্যময় একটি আইডি আছে। ঐ আইডিটা এখন ডি-অ্যাক্টিভ।”

“চারুলতার সাথে রবীন্দ্রনাথের কী সম্পর্ক?” বোকার মতো বলে ফেললো এসপি।

গাল চুলকালো ছফা। রবীন্দ্রনাথ যার ভালোমতো পড়া নেই তাকে এটা। বোঝাতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে। “লম্বা গল্প…বাদ দেন। আসল কথা হলো, গত তিন-চারদিনে আমি আরো অনেক কিছুই জানতে পেরেছি। এখানে আসার আগে নিখোঁজ ঘটনাগুলোর সাথে রেসটুরেন্টটার কি কানেকশান থাকতে পারে সেটা নিয়ে আগে থেকে কিছুই ভাবি নি। ঐ মহিলার কথা তো বহু দূরের ব্যাপার।” একটু থেমে আবার বললো, “যাইহোক, আমি যে অনেক কিছু জেনে গেছি সেটা ঐ মুশকান জুবেরিও বুঝে ফেলেছে খুব দ্রুত, সে-কারণেই আমার পেছনে আপনাদের লেলিয়ে দিয়েছে।”

কথাটা শুনে এসপি মনোয়ার হোসেন কাচুমাচু খেলো।

“মনে রাখবেন, আমাদের ভিক্টিম যাত্রাপথে গাড়ি থামিয়ে রবীন্দ্রনাথে খাওয়াদাওয়া করে নি। সে ঢাকা থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে এখানে এসেছিলো। ওয়ান-ওয়ে রেন্ট ছিলো ওটা। এজন্যে ক্যাব-চালককে ভালো টাকাও দেয়া হয়।”

এসপি ভদ্রলোক কপাল ঘষলো হাত দিয়ে। “ম্যাডামের ব্যাপারে কি এমন কিছু জানতে পেরেছেন যার কারণে উনাকেই প্রাইম সাসপেক্ট মনে করছেন?”

এসপির দিকে তাকিয়ে আবারো মুচকি হাসলো ছফা। “আমি যা জানতে পেরেছি সেটা যদি শোনেন তাহলে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবে।”।

সুন্দরপুরের এসপি ঢোক গিলে গোল গোল চোখে চেয়ে রইলো। কিছু একটা বলতে যাবে অমনি বেজে উঠলো তার মোবাইলফোনটা। বেচারার কপাল আজ সত্যি খারাপ। ফোনটা রাখা আছে ডেস্কের উপরে। ডিসপ্লেতে কলার আইডি দেখে ছফার অভিব্যক্তি কী রকম দুবোধ ঠেকলো তার কাছে।

“কলটা ধরবেন না?” বাঁকাহাসি দিয়ে বললো নুরে ছফা।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো মনোয়ার হোসেন। “ধরে বলবোটা কী?”

“জানি না। তবে না ধরলে তো মহিলা অন্য কিছু ভাববে।”

এসপি চুপ মেরে রইলো।

“আমার মনে হয় ফোনটা রিসিভ করাই ভালো। উনাকে বলে দিন, আপনি অন্য একটা কাজে খুব ব্যস্ত আছেন। ওসির সাথে আর কথা হয় নি। সন্ধ্যার দিকে ফোন করে জানাবেন। আশা করি তখন আর ফোন করার দরকার হবে না।”

ফোনের রিং বন্ধ হয়ে গেলো।

"আরেকবার যদি করে তাহলে বলবো...এখন কলব্যাক করে এটা বলা ঠিক হবে না। আমি তো খুব বিজি আছি, তাই না?"

"আপনি একটু পরই উনাকে কলব্যাক করে এ কথাগুলো বলবেন।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো এসপি মনোয়ার হোসেন। তার সামনে যে লোক বসে আছে তার সাথে দ্বিমত প্রকাশ করলে বিপদ বাড়বে বৈ কমবে না। এরইমধ্যে যথেষ্ট বিপাকে পড়ে গেছে। এই নুরে ছফা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ক্ষমতাবলে এখন ছড়ি ঘোরাচ্ছে তার উপরে। এর সাথে তাল মিলিয়ে না চললে বিপদ। একে চটানো হবে ক্যারিয়ার সুইসাইড করার শামিল। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ক্ষমতাধর ব্যক্তি স্বয়ং আইজিসাহেবকে দিয়ে ফোন। করিয়েছেন। কপাল ভালো থাকলে হয়তো সুন্দরপুর থেকে ভুরুঙ্গামারি কিংবা খাগড়াছড়িতে বদলি না-ও হতে পারে।

"আমাদের এমপি সাহেব কিনতু ইন্টারফেয়ার করতে পারেন...আই মিন, মিসেস জুবেরির সাথে উনার বেশ ভালো সম্পর্ক...উনি যদি ব্যাপারটা এমপিকে-"

হাত তুলে এসপিকে থামিয়ে দিলো ছফা। "এমপি আসাদুল্লাহকে নিয়ে চিন্তা করবেন না। উপযুক্ত জায়গা থেকে উনার লাগাম টেনে ধরা হবে।"

এসপি চুপ মেরে গেলো। কথাটার মানে বুঝতে আর বাকি নেই।

"আপনার সাথে যে মিসেস জুবেরির দারুণ খাতির...এটা আমার কাজে ভালোই সাহায্য করবে," মনোয়ার হোসেনকে চুপ থাকতে দেখে বললো ছফা।

"না, আসলে তেমন খাতির নেই..." কাচুমাচু খেলো ভদ্রলোক। "ঐ আমাদের এমপির কারণে একটু যোগাযোগ রাখতাম আর কি।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। “এখন বলুন, ঢাকা থেকে কেউ কি ঐ মহিলার সাথে দেখা করতে আসে এখানে?”

এসপি বুঝতে পারলো না কী বলবে। তবে ছফাকে সহযোগীতা না করার কথা এ মুহূর্তে চিন্তাও করতে পারছেনা।

“ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদ নামের কেউ কি এখানে আসে?”

মনোয়ার হোসেন বুঝতে পারলো এই লোকের কাছে সত্যিটা না বলে এখন আর উপায় নেই। “আমার জানামতে কেবল উনিই আসেন...আর কারোর কথা আমার জানা নেই।”

মুচকি হাসলো ডিবির ইনভেস্টিগেটর। তার সহকারী ঠিকই বলেছে। অরিয়েন্ট হাসপাতালের অনেকের সাথে কথা বলে জানা গেছে, হাসপাতালের একাংশের মালিক এবং স্বনামখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদের সঙ্গে মুশকান সোহেলির বেশ সু-সম্পর্ক ছিলো। আর এখন এসপি বলছে, ঐ ডাক্তারই কেবলমাত্র সুন্দরপুরে আসে। তার মানে ডাক্তারসাহেব আরেকটা সোর্স অব ইনফর্মেশন হতে পারে।

.

অধ্যায় ২৮

কোনো জটিল আর কঠিন কেস সমাধান করার পরই কিছুদিন বই নিয়ে ডুবে থাকে সে। অদভুত আর রহস্যময় একটি লাশ নিয়ে যে জটিলতার মধ্যে নিপতিত হয়েছিলো বিগত কয়েকটা দিন, অবশেষে সেটার মীমাংসা করা গেছে। কিন্তু বইয়ের মধ্যে ডুবে না গিয়ে অন্য একটি কেস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে কেএস খান। এটা খুবই ব্যতিক্রমী ঘটনা। তবে যে কারণে সে এখন মাথা ঘামাচ্ছে সেটা আরো বেশি ব্যতিক্রধর্মী।

দীর্ঘদিন পর তদন্তের সুবাদে ঢাকার বাইরে কক্সবাজারে গেছিলো। তদন্ত কী আর করবে, ওখানে পা রাখতে না রাখতেই সারা শরীর কাঁপিয়ে জ্বর চলে আসে। পর পর তিনদিন হোটেল-রুমে বন্দী হয়ে থাকে সে। বেলকনি থেকে সমুদ্র দেখা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে নি। তার ছাত্র। আমিরুল অবশ্য যথাসাধ্য সেবা করেছে তার। কক্সবাজারের সবচেয়ে বড় ডাক্তারকে ডেকে এনেছিলো হোটেলে। যদিও এর কোনো দরকারই ছিলো না। নিজের শরীরকে সে ভালোমলোই চেনে। তিন-চারদিন ভুগিয়ে এক সকালে ঘুট করেই জ্বর তাকে ছেড়ে পালাবে-এ ব্যাপারে একদম নিশ্চিত ছিলো। অসুখ-বিসুখ হলো তার ইয়ার-দোস্তের মতো। নিত্যদিন আসবে, আবাজি করবে তারপর চলেও যাবে, স্ত্রী-সন্তানের মতো জীবনের সাথে পুরোপুরি জড়িয়ে থাকবে না।

তো, তিনদিন পর জ্বরটা ঠিকই উধাও হয়ে গেলো। সেও দেরি না করে নেমে পড়লো কাজে। কারণ জ্বরের ঘোরেই তার মাথায় কুলু-বিহীন কেসগুলোর সমাধান চলে আসে চট করে। এই অদ্ভুত কাণ্ডটি বার বার ঘটে তার সাথে। সেদিক থেকে দেখলে, কোনো কেসের জটিলতম সময়ে তার জ্বর চলে এলে মনে মনে আশান্বিত হয়ে ওঠে সে।

হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেতেই দেখতে পেলো তার সামনের টেবিলে এক কাপ চা ধোঁয়া ছাড়ছে। একটু আগে আইনস্টাইনকে চা দিতে বলেছিলো। কাপটা তুলে নিয়ে লম্বা করে চুমুক দিলো।

তার প্রিয়পাত্র নুরে ছফা একটা কেস নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। একজন মানুষের নিখোঁজ হবার ঘটনা তদন্ত করতে গিয়ে সে আবিষ্কার করেছে সত্যিকারের নিখোঁজের সংখ্যা পাঁচজনের নীচে হবে না। এই পাঁচজনের মধ্যে কমপক্ষে দু-জনের শেষ গন্তব্য কোথায় ছিলো সেটা বের করতে সক্ষম হয়েছে সে। উত্তরবঙ্গের একটি মফস্বল শহর সুন্দরপুরে ‘রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসেন নি’র মতো অদ্ভুত নামের একটি রেস্টুরেন্টের সন্ধান পাওয়া গেছে। রেস্টুরেন্টটির মালিক মুশকান জুবেরি সম্পর্কে এ পর্যন্ত যেসব তথ্য ছফা জানতে পেরেছে তাতে মনে হচ্ছে নিখোঁজ ঘটনাটির মতো ঐ মহিলাও কম রহস্যময়ী নয়। কিন্তু

তার নিজের কৌতূহল হচ্ছে অন্য একজনকে নিয়ে। ছফা এখন যেখানে আছে সেই সুন্দরপুরে নাকি এমন এক গোরখোদক রয়েছে, যে মানুষ মারা যাবার আগেই টের পেয়ে যায়। অনেক সময়ই দেখা যায় নিজ উদ্যোগে সে কবর খুড়ছে, আর তার পর পরই শোনা যায় ঐ গ্রামে একজন মারা গেছে!

নুরে ছফা তাকে অল্পবিস্তর যেটুকু বলেছে তাতে দেখা যাচ্ছে রহস্যময় গোরখোদক বয়সে তরুণ, বিয়ে-শাদী করে নি এখন পর্যন্ত, কবরস্তানের ভেতরেই ছোট্ট একটা কুড়েঘরে থাকে। ওখানকার অনেকেই মনে করে এই গোরখোদক ছেলেটি কামেল কেউ হবে। তার অবশ্য তেমন কিছু মনে হচ্ছে না। সে হলো যুক্তির মানুষ। গালগল্প আর অতিপ্রাকৃত কিছুতে কোনো কালেই তার বিশ্বাস ছিলো না। সবকিছুই যুক্তি দিয়ে বিচার করে। সে নিশ্চিত, গোরখোদকের অমন অদ্ভুত আচরণের পেছনে বাস্তবসম্মত কারণ রয়েছে। আর সেই কারণটা যতক্ষণ না বের করতে পারছে ততোক্ষণ তার স্বস্তি নেই।

ছফা তাকে আরো বলেছে, এই ছেলেটাকে মুশকান জবেরির বাড়ির নির্জন জায়গায় কবর খুরে কিছু মাটিচাপা দিতেও দেখেছে সে। ঐ সময় রহস্যময়ী মহিলাও উপস্থিত ছিলো তখন। সব মিলিয়ে কৌতূহলোদ্দীপক একটি ঘটনা। আর এটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে ছুট করেই তার মাথায় একটা সম্ভাবনা উঁকি দিয়েছে। এটা হতে পারে অ্যাডভান্স কবর খোরার সম্ভাব্য যৌক্তিক ব্যাখ্যা। তবে তার জন্য কিছু জরুরি তথ্য জানা দরকার। এজন্যে নুরে ছফাকে ফোন করে বলে দিতে হবে।

“আপনে রাইতে কি খাইবেন?”

আইনস্টাইনের কথায় ফিরে তাকালো কেএসকে। “রুটি। চায়ে চুমুক দিয়ে সংক্ষেপে জানালো সে।

“আরে, রুটির লগে কি খাইবেন ওইটা জিগাইছি।”

"ও," একটু ভাবলো কেএস খান। "তর যেইটা ভালা লাগে নিয়া আয়।"

"কলিজার ভূনা নিয়া আসুম?"

ছেলেটার দিকে তাকালো। তার চোখমুখে কেমন হাসিহাসি ভাব। বুঝতে পারলো, আজরাতে কলিজার ভুনাই খেতে হবে নইলে এই আইনস্টাইন সুগভীর এক আক্ষেপ নিয়ে ঘুমাতে যাবে।

"ঠিক আছে, কলিজার ভুনাই নিয়া আয়।"

হাসিমুখে ঘর থেকে চলে গেলো ছেলেটা।

নুরে ছফা কিছুটা বিরক্ত হলেও সেটা প্রকাশ করতে পারলো না, কারণ ফোনের ওপাশে যে মনুষটার সাথে এখন কথা বলছে তাকে সে কেবল শ্রদ্ধাই করে না, বরং অভিভাবকও মনে করে। এই মানুষটির সাথে তার বেশ মিল। তাদের দুজনের একটাই সমস্যা-নিজেদের নাম! উভয়ের প্যাশন। ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন। কেএসকের মতো ছফাও এখন পর্যন্ত কোনো কেসে ব্যর্থ হয় নি। আর তারা দু-জন নিছক চাকরি করার জন্য ডিবিতে যোগ দেয়। নি। এটা তাদের ধ্যান-জ্ঞান।

"নুরে ছফা, আপনে দেখবেন, ঐ আন্ডারটেকার পোলাটা যেসব অ্যাডভান্স কবর খুদছে ওইগুলার আশেপাশে কি আছে বুঝতে পারছেন। আমার কথা?"

"জি, স্যার," নুরে ছফা জবাব দিলো। একটু আগে কেএস খানকে সে ফোন করেছিলো জরুরি একটা প্রয়োজনে, অথচ মি. খান মুশকান জুবেরির ব্যাপারে আগ্রহ না দেখিয়ে উৎসুক হয়ে পড়েছে গোরখোদক ফালুর ব্যাপারে!

"অ্যাডভান্স কবরগুলার পাশে যদি অন্য কোনো কবর থাকে তাইলে। দেখবেন ওইগুলা কতোদিনের পুরানা...আর ডিসটেন্সটাও কিন্তু খুব ভাইটাল...বুঝবার পারছেন তো আমার

কথা?”

“জি, স্যার,” আবারো একই কথা বললো বটে আসলে সে কিছুই বুঝতে পারছে না। “ডিসটেন্স মানে?...কিসের ডিসটেন্স, স্যার?”

“ঐ যে অ্যাডভান্স কবরের পাশে পুরাতন কবর যদি থাকে সেইটার কথা বলতাছি।”

আলতো করে দীর্ঘশ্বাস ফেললো ছফা। এসব তথ্য জানতে কেন উদগ্রীব হয়ে উঠেছে তার প্রিয় এই মানুষটি সে বুঝতে পারছে না। “ঠিক আছে, স্যার।”

“এইটা কইলাম খুব জরুরি..আপনে যত জলদি পারেন এই ইনফর্মেশনগুলা আমারে দেন।”

এইসব ইনফর্মেশন জরুরি! হতাশ হলেও মুখে বললো, “আচ্ছা, স্যার।”

“মনে হইতাছে ঐ আন্ডারটেকারের মিস্ট্রিটা প্রায় সলভ কইরা ফালাইছি।”

নুরে ছফার বিরক্তি আরো বেড়ে গেলো কথাটা শুনে, তবে যথারীতি সেটা প্রকাশ করতে পারলো না। “তাই নাকি, স্যার?”

“হুম। একটা হাইপো দাঁড় করাইছি...এখন ওইটার সাপোর্টে কিছু ইনফর্মেশন লাগবো।”

“স্যার?” ছফা নিজের দরকারটার কথা না বলে আর থাকতে পারলো না।

“বলেন, শুনতাছি তো...”

“আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। কাজটা আমার এই কেসের জন্য খুবই জরুরি।”

“এই নিয়া চিন্তা কইরেন না, আমি তো বলছিই, আপনেরে এই কেসে যতোটুকু হেল্প করনের দরকার আমি করুম। আপনে আগে ঐ আন্ডারটেকারের-”।

"স্যার," কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলতে বাধ্য হলো নুরে ছফা। "আপনার জন্য ঐ ইনফর্মেশনগুলো কালেক্ট করার ব্যবস্থা করছি কিন্তু আমি যে কাজটার কথা বলছি সেটা অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে অনেক বেশি ইম্পোর্টেন্ট।"

"ও।" ওপাশ থেকে কেবল এটাই বললো ডিবির সাবেক ইনভেস্টিগেটর।

"আপনি ছাড়া এটা অন্য কেউ ভালোভাবে করতে পারবো না।" "কাজটা কি, নুরে ছফা?"

.

অধ্যায় ২৯

আতর আলীর সিনা যতোটা চওড়া ছিলো তারচেয়েও বেশি চওড়া হয়ে গেছে। সেই চওড়া সিটা টানটান করে আয়েশি ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছে সে। স্বয়ং নুরে ছফা, যে কিনা এখন আর সামান্য সাংবাদিক নয়, ডিবির বিরাট বড় অফিসার, তাকে একটু আগে ফোন করে একটা কাজ দিয়েছে। থানার পুলিশকে বাদ দিয়ে ছফাস্যার তাকে বলেছে ফালু ছেলেটার অ্যাডভান্স কবর খোরার ব্যাপারে একটু খোঁজ-খবর নিতে হবে। কথাটা শুনে আতর একটু অবাকই হয়। গতকাল সে যখন অ্যাডভান্স কবর খোরার কথা বলছিলো তখন ছফা কোনো আগ্রহই দেখায় নি। আজ হঠাৎ করেই আগ্রহ দেখানোর কারণ কি?

যাহোক, অতো শত ভেবে কাজ নেই। সময় হলে এই প্রশ্নের জবাব সে ঠিকই পেয়ে যাবে।

আতর বুঝতে পারছে তার এখন সুদিন। অনেকেই তাকে তোয়াজ করতে শুরু করে দিয়েছে। নুরে ছফা থানা থেকে চলে যাবার পরই এসআই আনোয়ার একান্তে ডেকে নেয় তাকে, নিজের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে দিয়ে নরম আর ভালো ব্যবহার করে তার

সাথে। শেষে বেজার মুখ করে। বুঝিয়ে দিয়েছে, তার দিকটা যেনো আতর একটু দেখে। সে কি ওসিসাহেবের সামনে তার পক্ষ নিয়ে কথা বলে নি?

শুধু অনোয়ারই নয়, ওসি নিজেও তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে অনুরোধের সুরে বলেছে, সে যেনো তার হয়ে নুরে ছফাকে বুঝিয়ে বলে যা হয়েছে তার জন্য তারা লজ্জিত। সবটাই না-জেনে হয়েছে। অল্প কদিনের মধ্যে আরেকটা বাজে বদলির শিকার হতে চাইছে না বেচারা।

ব্যাপারটা এখন পরিস্কার, আতর আর সামান্য ইনফর্মারের অবস্থানে নেই। ঢাকা থেকে আসা মহাক্ষমতাধর নুরে ছফার সবচাইতে ঘনিষ্ঠ আর বিশ্বস্ত লোক সে।

এসআই আনোয়ার শুধু সিগারেট দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, আতরকে সঙ্গে নিয়ে চলে যায় সুন্দরপুরের দক্ষিণ দিকে কালিন্দী বিলের কাছে। জায়গাটা নিরিবিলি। আয়েশ করে গাঁজা টানতে টানতে সুখ-দুঃখের কথা বলেছে এসআই। সে আরো কথা বলতে চেয়েছিলো কিন্তু আতর তাকে বলেছে জরুরি একটা কাজে তাকে এখন এক জায়গায় যেতে হবে। এসআই চলে যাবার পরই সে জমিদার বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

গেটের সামনে এসে জোরে জোরে দুটো টান দিয়ে গাঁজার স্টিকটা ফেলে দিলো আতর। বন্ধ গেটের ওপাশে যে বোবা দারোয়ান ফুটো দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সে জানে। কানে শোনে না বলে বোবা ছেলেটা বেশিরভাগ সময়ই এটা করে থাকে। তুড়ি বাজিয়ে গেট খোলার ইশারা করতেই সঙ্গে সঙ্গে বড় গেটটার মধ্যে যে ছোটো গেটটা আছে সেটা খুলে মাথা বের করে ভুরু কুচকে তাকালো বোবা ইয়াকুব। ইনফর্মারকে দেখে সে খুবই অবাক হয়েছে।

আতর হাত দিয়ে ইশারা করে দেয়াশলাই কাঠি জ্বালানোর ভঙ্গি করলো। "আছে?"

ইয়াকুব মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিলো। নাই।

মুচকি হাসলো ইনফর্মার। "মাঙ্গেরপুত...পকেটে তো ফোকা রাখোস ঠিকই, দ্যাশলাই রাখোস না ক্যান?"

বোবা তার কথাটা শুনতে না পারলেও বুঝতে পারলো খারাপ কিছুই বলা হয়েছে। আতর শব্দ করে একদলা থুতু ফেলে অন্যদিকে পা বাড়ালে রেগেমেগে ছোটো গেটটা বন্ধ করে দিলো দারোয়ান।

আতর আরো জোরে হাঁটতে শুরু করলো। জমিদার বাড়িটার পর জোড়পুকুরে আর কোনো বসত-বাড়ি নেই। কয়েকটা আবাদি-অনাবাদি জমির পর আবার ভিটের দেখা পাওয়া যায়। ক্ষেতের আইল ধরে এগোতেই দেখতে পেলো রমাকান্ত মাস্টার ধীরপায়ে আইল ধরে এগিয়ে আসছে। চোখে চশমা নেই বলে বুড়ো মানুষটা নীচের দিকে চোখ পিটপিট করে চেয়ে চেয়ে পা ফেলছে।

"মাস্টরসাব, কই যান?"

আতরের কথায় অনেকটা চমকে উঠলেন মাস্টার। পিটপিট করে তাকালেন। "তুমি?"

"এটটু পুবপাড়ায় যাইতাছিলাম....কিন্তু এই ভরদুপুরে আপনে কই যাইতাছেন?"

মাস্টার যেনো একটু বিব্রত হলেন। কিছুটা দ্বিধাও দেখা গেলো তার মধ্যে। "এই তো... সামনেই..."

ক্ষেতের আইল থেকে নেমে দাঁড়ালো আতর, তার চোখেমুখে সন্দেহ। সামনে মাইনে? মনে মনে বললো সে। সামনে তো পুরা দুনিয়া পইড়া আছে।

রমাকান্তমাস্টার আর কোনো কথা না বলে হাটার গতি বাড়িয়ে দিলেন, যাবার সময় আতরের দিকে ফিরেও তাকালেন না।

আইলের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে মাস্টারের গন্তব্য বোঝার চেষ্টা করলো ইনফর্মার। একবারের জন্যেও না থেমে, পেছন ফিরে না তাকিয়ে রমাকান্তকামার চলে যাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর আতর আলী অবাক হয়ে দেখতে পেলো মাস্টারের গন্তব্য আর কোথাও নয়, ঐ জমিদার বাড়ি! ধপ-ধপ করে যে ভোতা শব্দ হচ্ছে সেটা তার ভালোই লাগে। ছোটোবেলায় মা যখন ঘুম পাড়াতো তখন তার পিঠের উপরে মায়ের নরম হাত চাপড় মারলে এমনটি হতো। শব্দটার মধ্যে থাকতো সম্মোহনী শক্তি। ধীরে ধীরে গভীর ঘুমে তলিয়ে যেতো সে।

ধপ ধপ! ধপ!

একটু বিরতি দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো ফালু। কবরটা এখনও খোরা শেষ হয় নি কিন্তু সারা শরীর ঘেমে একাকার। তার বলিষ্ঠ পেশীগুলো আরো ফুলেফেঁপে উঠেছে। দেখে মনে হচ্ছে তেলমাখানো শরীরের কোনো মল্লবীর। শীত হোক আর গ্রীষ্ম, মাথার উপরে সূর্য থাকলে একটু গরম লাগবেই। আর সেই সূর্যের নীচে দাঁড়িয়ে কেউ যদি মাটি কাটার মতো পরিশ্রমের কাজ করে তাহলে ঘেমে ওঠাটা খুব স্বাভাবিক। সাধারণ মাটি কাটার কাজের চেয়ে গোর খুরতে আরো বেশি পরিশ্রমের দরকার পড়ে। আজকের এই পরিশ্রমটা তার করতেই হতো না যদি গতরাতে ওরা চলে না আসতো।

যাহোক, সদ্য খোরা কবরের দিকে তাকালো সে। সাড়ে-তিনহাত গভীর করে মাটি খুরতে হবে। একটুও বেশ-কম করার উপায় নেই। এরইমধ্যে তিনহাত খোরা হয়ে গেছে, আর অল্প একটু খুরলেই কাজ শেষ হয়ে যাবে। কপালের ঘামগুলো ডানহাতের আঙুল দিয়ে কেচে ফেলে দিলো। তাকে একটু দ্রুত করতে হবে। জরের আজান দিয়ে দিয়েছে। নামায শেষ হলেই জানাযা আর জানাযা শেষ হলে গোর।

উপুড় হয়ে আবারো কাজে নেমে পড়লো সে। বেতের টুকরিটা কবরের জমিনে রেখে দিয়েছে। কোদাল দিয়ে মাটি তুলে ওটা ভরাট করে কবরের বাইরে ফেলছে। সদ্য কবরটার একপাশে জমে আছে আলগা মাটির স্তূপ। ফালু কাজে ডুবে যেতেই আবারও সেই শব্দটা ফিরে এলো :

ধপ-ধপ-ধপ।

শব্দটার সম্মোহনী শক্তি সব সময়ের মতোই আবারো তাকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিলো।

"কার কব্বর খুদতাছোস?"

কবরের নীচ থেকে মুখ তুলে তাকালো ফালু। আতরকে দেখে অবিশ্বাসে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। দু-হাত পেছনে রেখে দাঁড়িয়ে আছে। ইতরটার ভাব দেখে মনে হচ্ছে গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান সে।

"আবার ক্যাঠায় মরছে?"

"কেউ না," তিক্তমুখে জবাব দিলো ফালু।

কথাটা শুনে রেগেমেগে তাকালো ইনফর্মার। "আবারও তুই ফাইজলামি শুরু করছোস? পাইছোস কি? নিজেরে কী মনে করোস? তুই কব্বর খুদলেই মানুষ মরবো?"

ফালু মুখ তুলে স্থিরচোখে চেয়ে রইলো কবরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার দিকে।

"এতোই যহন জানোস, তয় ক না...আইজ ক্যাঠায় মরবো?"

গোরখোদক কিছুই বললো না। গতরাতে এই বদমাশটা অন্য একজনকে সাথে নিয়ে তার কাজে বাগড়া দিয়েছিলো। হুট করে চলে এসেছিলো ওরা। সে ভাবেও নি এতো রাতে কবরস্তানে কেউ চলে আসতে পারে। রাগে ফালুর গা জ্বলে যাচ্ছে। অবশেষে রাগ দমাতে না পেরে বলে উঠলো, "তুই মরবি! আর আমি নিজ হাতে তোরে এইহানে গোর দিমু!"

কথাটা শুনে আতরের বুক ধরফর করে উঠলো। হারামজাদা এসব কী বলছে? ওর সাহস তো কম নয়। আবার তুই-তোকারিও করছে! রাগে কাঁপতে শুরু করলো সে। চেঁচিয়ে বললো, "ওই, হারামির বাচ্চা! মুখ সামলায়া কথা কইবি। তুই আমারে চিনোস না?"

“তোরে চিনুম না ক্যান...তুই হইলি বিবিসি...সব খবর থাকে তোর কাছে।”

“ঠিক কইছোস!” চেঁচিয়ে উঠলো আতর। “আমার কাছে সব খবর থাকে.. তুই তর ঘরের চৌকির নীচে কি রাখোস না রাখোস তাও আমি জানি।”

কথাটা শুনে ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো গোরখোদক। সে দেখতে পেলো পেছন থেকে একটা হাত বের করে আনলো আতর, তার সেই হাতে মানুষের পায়ের সবচেয়ে বড় একটি হাঁড়!

“তর ঘরের খাটের নীচে এইসব জিনিস রাইখা দিছস ক্যান? কাহিনী কি?”

ফালু রাগে ফুঁসতে লাগলো। এই বদমাশটা তার ঘরে ঢুকে কাপড়ে মুড়িয়ে রাখা কঙ্কাল দেখে ফেলেছে! প্রমাণ হিসেবে সঙ্গে করে আবার একটা হাঁড়ও নিয়ে এসেছে!

“কী..জবান বন্ধ হইয়া গেলো নাকি? মনে করছোস, মুখ বন্ধ রাখলে। আমি কিছু বুঝবার পারুম না? দেখ না...তর কি হয়...সব বন্ধ হইয়া যাইবো। হোগার কাপড় মাথায় তুইলা দৌড়াইবি তুই

রাগে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলো ফালু। কোদাল আর টুকরিটা নিয়ে কবর থেকে উঠে এলো, দাঁড়ালো আতরের মুখোমুখি। “তুই কি কইবার চাস?”

“তর অ্যাডভান্স কব্বর খুদার গোমড় ফাঁস হইয়া যাইবো রে, ফালু...খাটের নীচে কি রাখছোস সব এহন জাইনা গেছি! ঐ বেটির লগে তর কি কাম তাও গুপন থাকবো না।”

চোখমুখ কুচকে চেয়ে রইলো গোরখোদক।

“কাইল রাইতে ঐ ডাইনির বাড়িতে ক্যান গেছিলি? ওইহানে তর কি কাম, অ্যাঁ? ওই ছেদার মইদ্যে তুই কি করতে যাস?”

ফালু এবার বুঝতে পারলো কালরাতে যে লোকটাকে ধাওয়া দিয়েছিলো সে আর কেউ না, তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই বদমাশ! “ওইহানে কি করতে যাই, জানতে চাস?” নাটকীয় ভঙ্গিতে বললো সে।

অভিজ্ঞ ইনফর্মার খুব দ্রুত বুঝে গেলো গোরখোদকের আগ্রাসি মনোভাব ছেলেটা কিছু করার আগেই সে হাঁড়টা দিয়ে বাড়ি মারার চেষ্টা করলো কিন্তু তাকে একদম অপ্রসতুত করে দিয়ে হাঁড়টা ধরে ফেললো ফালু। অন্যহাতে খামচে ধরলো তার শার্টের কলার। একটা মোচড় মেরে হাঁড়টা তার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আতরের বাম-কানে আঘাত করে বসলো। টলে গেলো ইনফর্মার। তারপর দু-হাতে কলারটা ধরে এক হ্যাঁচকা টানে সদ্য খোরা কবরে ফেলে দিলো তাকে।

একটা আর্ত চিৎকার দিলো আতর। ঘটনার আকস্মিকতায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে সে। কবরের গর্তের মধ্যে পড়ে ব্যথায় ঝাঁকিয়ে উঠলো। মাথাটা ভো ভো করে ঘুরছে বলে ধাতস্থ হতে পারলো না। যে-ই না উঠে দাঁড়াবে অমনি ফালু তার মাথায় আরেকটা আঘাত করে বসলো। আতরের মনে হলো তার মাথায় যেনো আকাশ ভেঙে পড়েছে। ঝাঁকিয়ে উঠলো সে। ঝাপসা হয়ে এলো দৃষ্টি। তারপরই টের পেলো তার উপরে চাক চাক মাটি এসে পড়ছে।

আমারে মাটিচাপা দিতাছে!

আতঙ্কের সাথেই ভাবনাটা পেয়ে বসলো তাকে। দুঃস্বপ্নের কথাটা মনে পড়ে যেতেই বুকে হাতুড়িপেটা শুরু হয়ে গেলো। “বাঁচাও বাঁচাও!” সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলো সে। তার চোখেমুখে মাটির চাক এসে পড়াতে ঠিকমতো তাকাতে পারছে না। দু-হাতে চোখ ডলতে লাগলো। চোখের মধ্যে মাটির গুড়ো ঢুকে গেছে বলে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। “শুয়ারেরবাচ্চা!”

এতো দ্রুত মাটি এসে পড়ছে যে আতর আর কথা বলতে পারলো না। চোখে দেখতে না পেলেও উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই আবারো শক্ত কিছু দিয়ে আঘাত করা হলো মাথায়। চিৎ হয়ে পড়ে গেলো সে। মরার উপরে খাড়ার ঘায়ের মতো আরো কিছু বড় বড় মাটির চাকা এসে পড়তে লাগলো। তার উপরে। চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, দু-হাত দিয়ে মাথাটা শক্ত করে ধরে রাখলো। প্রচণ্ড ব্যথায় মরে যাচ্ছে সে। মাটির চাকাগুলো উপর থেকে দ্রুত গতিতে পড়ছে। আলগা মাটির স্তূপের নীচে তলিয়ে যাচ্ছে সে। ঠিক তখনই দূর থেকে একটা শব্দ তার কানে যেতেই হাত-পা অসাড় হয়ে এলো।

সমবেত কণ্ঠে একদল লোক কোনো সুরা পড়ছে।

তার জানাযা পড়ছে ওরা?!

সে নিশ্চিত হতে পারলো না। বহুকাল আগেই নামায-কালাম ছেড়েছে। কোন্ সুরা কখন পড়া হয় সে জানে না। পরক্ষণেই মনে হলো, মুরদার আত্মার মাগফেরাত কামনা করার জন্য লাশের চারপাশে থাকা লোকজন এরকম সুরা পড়ে!

আতর টের পেলো তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। জ্ঞান হারানোর আগে শুধু একটা কথাই বলতে পারলো :

“বাঁচাও! বাঁচাও!”

কিন্তু সে নিশ্চিত হতে পারলো না, শব্দটা আদৌ তার মুখ দিয়ে বের হয়েছে কিনা! আর কোনো শব্দ বের হবার আগেই সে তলিয়ে গেলো গভীর অন্ধকারে।

.

এ ধরনের আরও বই পান ▸▸ @bongboi।

অধ্যায় ৩০

উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াচ্ছে ফালু।

তার কাঁধে বড় একটা ব্যাগ। পুরনো জিন্সপ্যান্ট আর রঙচটা টি-শার্ট পরে আছে এখন। প্যান্টটা হাটু পর্যন্ত গোটানো। অবশ্য এই বেশটা তার জন্য মোটেও নতুন নয়। এই তো গতসপ্তাহেই রাতের বেলায় এই পোশাকে গঞ্জে গেছিলো। ঢাকা শহরে গেলেও এই পোশাকে যায় সে। তবে ঐ মুশকান জুবেরি ছাড়া সুন্দরপুরে খুব কম লোকেই তাকে এই বেশে দেখেছে। ম্যাডাম আবার লুঙ্গি পরলে ভীষণ বিরক্ত হয়। তার বাড়িতে কাজ করতে গেলে লুঙ্গি পরে যায় না সে।

বদমাশ আতরকে মেরে কবরে ফেলে মাটিচাপা দেবার সময় দেখতে পায় বহু দূরে, কবরস্তানে আসা-যাওয়ার একমাত্র মেঠোপথটি দিয়ে লোকজন মুর্দা নিয়ে চলে আসছে। দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে যায় তার ঝুপড়ি ঘরে, ঝটপট জামা পাল্টে দরকারি কিছু জিনিসপত্র, কাপড়চোপড় আর খাটের নীচ থেকে ঐ কঙ্কালটা ব্যাগে ভরে কবরস্তানের উত্তর দিক দিয়ে পালিয়ে যায় সে। ওইদিকটা মানুষজন চলাচলের অনুপযোগী, ঝোপঝাঁড় আর জায়গায় জায়গায় ডোবা-নালায়পূর্ণ বিস্তীর্ণ একটি প্রান্তর।

অনেকটা পথ দৌড়ে থমকে দাঁড়ালো সে। ফিরে তাকালো পেছনে। তাকে কেউ দেখে নি। একটা বড় গাছের নীচে বসে পড়লো। কোথায় যাবে। বুঝতে পারছে না। গঞ্জে যে তার একজন রক্ষিতা আছে, সেই সোমারাণীর কাছে যাওয়া যাবে না। ঐ মেয়ে যখন জানতে পারবে সে খুন করে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে তখন তাকে দুর-দুর করে তাড়িয়ে দিতে একমুহূর্তও দেরি করবে না। ঐ নষ্টা মেয়েমানুষ মুখে যতো কথাই বলুক, যত আদর-সোহাগই করুক, নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছুই বোঝে না। প্রথমদিকে না বুঝলেও ফালু এখন বেশ বুঝতে পারে এটা। অথচ কতো বোকাই না ছিলো সে। মেয়েটাতে এমন মজে গেলো যে, তাকে ছাড়া আর কিছুই বুঝতো না। দু-বছরেরও বেশি সময় পর্যন্ত মেয়েটার ঘোরে আটকে ছিলো, তারপরই বুঝতে পারে, গঞ্জের মেয়েমানুষের প্রেম শুধু টাকার কাছেই বিক্রি হয়।

এই মেয়েটার জন্য কী-ই না করেছে সে! লুকিয়ে লুকিয়ে গঞ্জে গিয়ে মেয়েটার সাথে ওসব করাটা যখন নেশা হয়ে গেলো তখন বাস্তবিক কারণেই টাকায় টান পড়লো। একজন গোরখোদকের আর কতই বা আয়রোজগার, তার পক্ষে তো গঞ্জের মেয়েমানুষের নানান ধরণের বায়না মেটানো সহজ কথা নয়। প্রথম প্রথম সে টাকার টান পড়লেই মাটিকাটার কাজ করে বাড়তি আয় করার চেষ্টা করতো। এভাবেই তার সৎবোনের মাধ্যমে মুশকান ম্যাডামের জন্য কাজ করতে শুরু করে সে। কিন্তু তাতেও কুলাতে পারতো না। ঐ সোমারাণী তার ঘামের সব অর্জন এক লহমায় লুটে নিতো। এরপর শুরু করে সবচাইতে অভিনব আর ভয়ঙ্কর একটি কাজ। যেমন বিপজ্জনক তেমনি দুঃসাহসী। এই কাজটা করার বুদ্ধি তার মাথায় এসেছিলো অনেকটা হুট করেই। প্রকৃতিতে যেমন অনাবৃষ্টি তেমনি গোরখোদকের কাজেও মন্দাকাল রয়েছে। একসময় সেই মন্দা শুরু হলে ফালু বিপাকে পড়ে গেলো। সপ্তাহের পর সপ্তাহ পার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সুন্দরপুরে কেউ মরার নাম নিচ্ছে না! আজরাইল যেনো ভুলে গেছে সুন্দরপুরেও তার পদধুলি দেয়া উচিত।

এরকম মন্দার সময়ে একরাতে গঞ্জে গিয়ে সোমরানীকে না পেয়ে ব্যর্থ মনোরথে ফিরে আসছিলো ফালু। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছিলো তখন। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য বড় বড় পা ফেলে মোক্তার বাড়ির ভিটার পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ একটা আর্তনাদ শুনে এগিয়ে যায়, দেখতে পায় বাড়ি থেকে একটু দূরে পায়খানার সামনে আশি বছরের বুড়ো সুবহান মোক্তার পা পিছলে পড়ে আছে। মাঝরাতে পেট খারাপ হলে বুড়ো বাধ্য হয়ে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেছিলো, বৃষ্টির কারণে পা পিছলে যায়। কোমর ভেঙে বুড়ো অসফুটস্বরে গোঙানি দিলেও বাড়ির ঘুমন্ত মানুষজনের ঘুম ভাঙনের পক্ষে যথেষ্ট ছিলো না সেটা। ফালু প্রথমে ধরাশায়ি বুড়োকে মাটি থেকে তুলতেই গেছিলো কিন্তু মুহূর্তেই তার সিদ্ধান্ত বদলে যায়। একটা লোক আশি বছর ধরে বেঁচে আছে পরিবার-পরিজনের কাছে বোঝা হয়ে, প্রায়ই অসুখে-বিসুখে পড়ে, সে নিজেও মৃত্যুর অপেক্ষায় প্রহর গুণছে কিন্তু সেইক্ষণ আর আসছে না। এরকম বুড়োরা মরে না বলেই তো ফালুর মতো গোরখোদকদের অনটনও ঘোচে না!

সুবহান মোক্তার অবিশ্বাসের সাথেই দেখতে পায় তাকে উদ্ধার করতে আসা ফেরেস্তাতুল্য যুবক নিমেষে আজরাইল বনে গেছে!

আশি বছরের বুড়োর টুটি চেপে ধরেই এক ঝটকায় ঘাড়টা ভেঙে ফেলে সে। তারপর ডানে-বামে কোথাও না তাকিয়ে সোজা হাটা দেয়। কবরস্তানের দিকে।

যথারীতি পরদিন সকালে নতুন গোর খোরার কাজ পেয়ে যায় ফালু, সেইসাথে কয়েক দিনের জন্য দূর হয়ে যায় তার অভাব। কিন্তু এরকম কাজ তো হরহোজ করা যায় না। রাতের পর রাত গ্রামের পথে ঘুরেও সুবহান মোক্তারের মতো শিকার আর খুঁজে পায় না। অচিরেই সোমারাণী বুঝতে পারলো ফালুর টাকা-পয়সায় টান পড়েছে আবার। একরাতে মুখে পান নিয়ে তার বুকে আঙুল চালাতে চালাতে আহ্লাদিসুরে জানতে চেয়েছিলো তার এমন হালত কেন। ওই সময় ফালুর পক্ষে কোনো কিছু লুকানো সম্ভব হয় নি। সে। যে সামান্য একজন গোরখোদক সেটা জানিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে এটাও জানায়, সুন্দরপুরের মতো এলাকায় ক-জনই বা মানুষ মরে, আর কতোই বা আয়রোজগার হতে পারে।

সব শুনে মুখের পান চিবোতে চিবোতে সোমারাণী বলেছিলো, সে কেন বাড়তি কামাইর চিন্তা করছে না। কথাটা শুনে অবাক হয়েছিলো ফালু। একজন গেড়ারখোদক কী করে বাড়তি কামাই করবে? সে কি সরকারী অফিসের কেরাণী যে, ফাইল আটকে ঘুষ নেবে?

সোমারাণী মুখ বেঁকিয়ে পানের পিক ফেলে বলেছিলো, তা কেন হবে। সে যে কাজ করে তাতেই বাড়তি কামাই করার রাস্তা বের করে নিতে পারে। ফালু কথাটা শুনে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারে নি। ভেবেছিলো সোমারাণী যেরকম হেয়ালি কথাবার্তা বলে সবসময়, এটাও ওরকম কিছু। কিন্তু তাকে ভড়কে দিয়ে মেয়েটা বলে, সে কেন কবর থেকে কঙ্কাল তুলে বিক্রি করছে না? ওসবে তো বেশ আয়রোজগার হয় আজকাল।

কথাটা শুনে ফালুর বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছিলো। মানুষের হাড্ডি গুড্ডিও বিক্রি করার জিনিস?! কোন পাগলে এসব কিনবে?

হাসতে হাসতে সোমারাণী তাকে জানায়, দিন-দুনিয়ার কোনো খবরই সে রাখে না। এক একটা কঙ্কাল পাঁচ-ছয়হাজার টাকায় বেচা যায়। সুন্দরপুরের বড় কবরস্তানের একচ্ছত্র মালিক হয়ে মাটির নীচে লাখ-লাখ টাকা রেখে সে ফকিরি হালতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ঠিক আছে, কঙ্কাল না-হয় তুললো কবর থেকে কিন্তু বিক্রি করবে কার কাছে?

পানখাওয়া লালচে ঠোঁট বেঁকিয়ে এই সমস্যার সমাধানও দিয়ে দেয়। সোমারাণী। তার কাছে কতো লোকই তো আসে। নানান পেশার মানুষ তারা। এদের মধ্যে এমন একজনও আছে যে বড়-বড় মেডিকেল কলেজগুলোতে নরকঙ্কাল বিক্রি করে ভালোই টু-পাইস কামাচ্ছে।

শুরু হলো ফালুর কঙ্কাল ব্যবসা। টাকায় টান পড়লেই পুরনো কবর থেকে কঙ্কাল বের করে বিক্রি করে দিতে শুরু করলো। কিন্তু এমন নিরাপদ কাজেও ঝামেলা দেখা দিলে অচিরেই। এক পুরনো কবর থেকে হাড়ি-গুড়ি সরানোর পর পরই কাকতালীয়ভাবে কঙ্কালের বড়ছেলে এসে হাজির কবরস্থানে! ঐদিনটি নাকি তার মরহুম পিতার মৃত্যুবার্ষিকী! দীর্ঘ দশবছর পর বিদেশ থেকে দেশে ফিরে পিতৃশোকে উতলা হয়ে ছুটে এসেছে। এখন মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাবার কবরে আগরবাতি জ্বালাবে, ফাতেহা পাঠ করবে। কিন্তু একি অবস্থা তার পিতার কবরের?! এ তো মাটির গর্ত! ভেতরে কিছুই নেই!

ফালুর পক্ষে ঐ সময় যুতসই জবাব দেয়া সম্ভব ছিলো না, কিন্তু মরহুমের বড়ছেলের সঙ্গে আসা এক বয়স্ক আত্মীয় বাঁচিয়ে দেয় তাকে। পুরনো কবর, নিশ্চয় শেয়াল-খাটাশ গর্ত করে ঢুকে হাড়ি-গুড়ি নিয়ে সটকে পড়েছে।

এমন ব্যাখ্যায় প্রবাসী সন্তুষ্ট হয়েছিলো। হাডিড-গুডিডবিহীন মাটির গর্তের সামনে বসেই ফাতেহা পাঠ করে চুপচাপ বিদায় নেয় বেচারি। হাফ ছেড়ে বাঁচে ফালু। এই ঘটনার পর সে আর ঝুঁকি নেয় নি, আবার কঙ্কাল সরানোর মতো লাভজনক কাজ থেকেও বিরত রাখতে পারে নি নিজেকে। অনেক ভেবেচিন্তে চমৎকার একটি কৌশল বের করে। সরাসরি পুরনো

কবর উন্মুক্ত করে কঙ্কাল সরানো বাদ দিয়ে দেয়, তার বদলে পাশে আরেকটি নতুন কবর খুরে সেই কবরের নীচ দিয়ে মাটি কেটে কঙ্কাল বের করে আনাটাই বরং নিরাপদ। এর ফলে কেউ বুঝতেই পারবে না পুরনো কবরের নীচে আদৌ কোনো হাড্ডিউ-গুড্ডিড অবশিষ্ট আছে কি নেই। কেউ তো আর কবর খুলে দেখে না, ভেতরে কঙ্কাল আছে কিনা।

কিন্তু এমন নিরাপদ কৌশল বিপদ ডেকে না আনলেও আপদ ঠিকই ডেকে আনলো তার জন্য। একদিন কঙ্কাল সরানোর জন্য পুরনো এক কবরের পাশে নতুন একটি কবর খুরছিলো সে, ঠিক সেই সময় নির্জন। গোরস্তানে এসে হাজির হয় গ্রামের এক লোক। তার ছোটোভাইটি অকালে মারা গেছে গত বছর। সেই ভায়ের কবর জিয়ারত করতে এসে দেখে ফালু নতুন কবর খুরছে। সঙ্গত কারণেই সে জানতে চায় তাদের গ্রামে কে মারা গেছে-কার জন্য কবর খুরছে?

মাটি কেটে পরিশ্রান্ত ফালু এমনিতেই ভড়কে গেছিলো লোকটার আগমনে, তার উপরে এমন বেমক্কা প্রশ্ন শুনে ঘাবড়ে যায়। জোর করে নিজের ভড়কে যাওয়াটা লুকাতে গিয়ে ঠাট্টাচ্ছলে বলে ফেলে, কেউ মারা যায় নি, তবে তার মন বলছে কেউ মরবে, তাই আগেভাগে একটা কবর খুরে রাখছে!

কথাটা শুনে ঐ লোক ভুরু কুচকে চোখমুখ বিকৃত করে চলে গেছিলো, ভেবেছিলো গোরখোদকের মাথা নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু ঐদিন সন্ধ্যার পরই যখন তাদের গ্রামের এক বুড়ি সত্যি সত্যি মারা গেলো তখন লোকটা রটাতে শুরু করলো, ফালু এই মৃত্যুর খবর আগেভাগেই জেনে গেছিলো, সেজন্যে আগাম একটা কবর খুঁড়ে রেখেছিলো সে। পোলাটা নিশ্চয় কামেল কেউই হবে। কার ভেতরে কি আছে কে জানে? তাকে হেলাফেলা করা ঠিক হবে না।

কুসংস্কারগ্রস্ত গ্রামের সহজ-সরল মানুষ এটা লুফে নিলো। তারা তো এরকম কামেল লোকজনের আর্বিভাবের অপেক্ষায় মুখিয়েই থাকে সব সময়।

এরকম ঘটনা কাকতালীয়ভাবে আরো একবার হয়ে গেলে ব্যাপারটা প্রতিষ্ঠিতই হয়ে গেলো সুন্দরপুরে। আর অবাক হয়ে ফালু আবিষ্কার করলো, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ তাকে সমীহ করতে শুরু করেছে। কারো বাড়িতে কেউ অসুখে পড়লে তাকে দাওয়াত করে নিয়ে গিয়ে ভালোমন্দ খাওয়ায়। হাতে কিছু টাকা-পয়সাও খুঁজে দেয়-যেনো আজরাইলকে আপাতত তাদের বাড়ির দিকে যাত্রা করা থেকে বিরত রাখে সে!

খুব দ্রুতই সুন্দরপুরে চাউর হয়ে গেলো ফালুর অ্যাডভান্স কবর খোরার কাহিনীটি।

এখন গাছের নীচে বসে দূর থেকে সে দেখতে পাচ্ছে বড় কবরস্তানে মানুষজনের ছোটাছুটি। তার আর বুঝতে বাকি নেই সবাই এতোক্ষণে জেনে গেছে আতরকে খুন করে মাটিচাপা দেয়া হয়েছে।

তার চেহারা এতোটাই পরিচিত যে ইচ্ছে করলেও এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারবে না। গভীর রাত না নামলে পালানোটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু এই গাছের নীচে বসে থেকে তো রাতের জন্য অপেক্ষা করতে পারবে না।

কারো না কারোর চোখে ঠিকই পড়ে যাবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে নিরাপদ কোনো আশ্রয়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু সে-রকম জায়গা কোথায়?

ফালু চারপাশে তাকাতে শুরু করলো নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য।

৭. নুরে ছফা বুঝতে পারছে না

অধ্যায় ৩১

নুরে ছফা বুঝতে পারছে না আতর আলী গেলো কোথায়।

চিন্তিত মুখে রবীন্দ্রনাথের উল্টোদিকে রহমান মিয়ার দোকানে এসে বসলো সে। একটু আগে কেএস খানের সাথে কথা বলেই সে আতরকে ফোন দিয়ে বলেছিলো সে যেনো ফালুর অ্যাডভান্স কবর খোরার ব্যাপারে কিছু তথ্য জোগাড় করে দেয়। কিন্তু এখন তার ফোনটা বন্ধ পাচ্ছে। অথচ থানা থেকে এসপির অফিসে যাবার আগে সে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিলো আতর যেনো তার ফোনটা চালু রাখে।

"চা খাইবেন?"

দোকানির প্রশ্নে মাথা নেড়ে সায় দিলো। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে দেখলো কোনো সিগারেট নেই। "একটা সিগারেটও দিয়েন।"

"একটা দিমু? নাকি এক প্যাকেট?"

উদাস হয়ে দোকানির দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বললো, "এক প্যাকেটই দেন তাহলে।"

রহমান মিয়ার মুখে খুশির ঝলক দেখা গেলো। মাথার মধ্যে লাভের হিসেবটা আপনা-আপনি শুরু হয়ে গেলো আবার। ঝটপট সিগারেটের প্যাকেটটা কাস্টমারকে দিয়েই গুড়ের চা বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো সে।

"আচ্ছা, আতর আলীকে দেখেছেন?"

চায়ের কাপটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো লোকটি, "হেরে তো এটু আগে জোড়পুকুরের দিকে যাইতে দেখলাম।"

চায়ের কাপটা না ধরেই অবাক চোখে তাকালো সে।

"কখন?"

"এই তো, এটটু আগেই।"

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো ছফা। আতর জোড়পুকুরে গেছে! অতিরিক্ত কৌতূহল দেখাতে গিয়ে আবার জমিদার বাড়িতে গেলে না তো? অজানা। আশংকা জেঁকে বসলো তার মধ্যে।

"আমার কতো হয়েছে?" তাড়াহূড়া করে জানতে চাইলো।

"চা খাইবেন না?"

"চা-সহ কতো হয়েছে, বলুন?"

"একশ ষাইট ট্যাকা..." অঙ্কটা তার একদম হিসেব করাই ছিলো।

ঝটপট টাকাটা দিয়ে দ্রুত রাস্তা পার হয়ে গেলো নুরে ছফা, রিক্সার জন্য অপেক্ষা করলো না। এই কাঁচা রাস্তায় রিক্সা যতো দ্রুত যাবে তারচেয়ে পায়ে হেঁটে আরো বেশি গতিতে ছোটা

সম্ভব।

মাটির রাস্তা দিয়ে দ্রুতপায়ে ছুটতে লাগলো সে। বুঝতে পারছে না, আতর কেন হুট করে জমিদার বাড়ির দিকে গেলো। তার মোবাইলফোনটাও বন্ধ! ইনফর্মারের কি খারাপ কিছু হয়েছে? মাথা ঝাঁকিয়ে এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলো। এসব ভাবতে ভাবতে জমিদার বাড়ির একেবারে কাছে চলে এলো সে। মেইনগেটের সামনে দিয়ে চলে যাবার সময় থমকে দাঁড়ালো।

শ্বেতশুভ্র চুলের এক বৃদ্ধ মেইনগেটের মধ্যে মানুষজনের ব্যবহারের জন্য যে ছোটো গেটটা আছে সেটা দিয়ে বের হয়ে আসছে।

রমাকান্তকামার!? বিস্মিত ছফা চেয়ে রইলো ভদ্রলোকের দিকে। মাস্টার এই বাড়ি থেকে বের হচ্ছে। তার ধারণা ছিলো মুশকান জুবেরির সাথে মাস্টারের কোনো যোগাযোগ নেই।

বৃদ্ধমাস্টার ধীরপায়ে এগিয়ে আসতেই দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ছফাকে দেখতে পেয়ে কেমন বিব্রত হলেন।

"আপনি?" মাস্টার কাছে আসতেই বলে উঠলো ছফা।

মুখ তুলে তাকালেন বৃদ্ধ। "ঐদিন রাতে আপনিই তো আমার বাড়িতে গিয়েছিলেন, তাই না?"

"হ্যাঁ," কাটাকাটাভাবে জবাব দিলো সে।

"তো এখন কি পাত্রির বাড়িতে যাচ্ছেন?"

মাস্টারের কথার খোঁচায় মুচকি হাসলো ছফা। "আমি কোথায় যাচ্ছি। সেটা সময় হলেই জানতে পারবেন, কিন্তু আপনি কেন এখানে এসেছেন। সেটাই বুঝতে পারছি না।"

– "ও..তাহলে আমার উপরেও নজর রাখছিলেন?" মাস্টারের চেহারা কঠিন হয়ে গেলো, "ওই টাউটটাকে দিয়ে?"

"কার কথা বলছেন?" ভুরু কুচকে ফেললো ছফা।

এবার মুচকি হাসলেন রমাকান্তকামার। "আতর..." দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। "একটু আগে ও আমাকে দেখেছে এখানে ঢুকতে চাইলে আমি ওকে ধোঁকা দিতে পারতাম কিন্তু আমি সেটা কেন করবো? এ জীবনে আমি কখনও কাউকে ধোঁকা দেইনি।"

নড়েচড়ে উঠলো সে। "আতরকে দেখেছে? কখন? কোথায়?"

এবার মাস্টার অবাক হলেন। "এই যে, একটু আগে...আমি যখন বোসবাবুর বাড়িতে আসছিলাম।"

"আতর তাহলে কোথায় যাচ্ছিলো?"

ভুরু কোচকালেন রমাকান্তমাস্টার। "ঐ যে ওখানে," একটু দূরে পুবদিকের বিস্তৃর্ণ ক্ষেতের দিকে আঙুল তুলে দেখালেন।

"ওখানে?" চট করে সেদিকে তাকিয়ে বৃদ্ধের দিকে ফিরলো। "ওখানে কোথায়?"

"আমি কি জানি," কথাটা বলেই আবার হাঁটতে শুরু করলেন।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলো ছফা। ওই দিক দিয়ে আতর কোথায় গেছে? ভাবনাটা তার মাথায় আসতেই চমকে উঠলো।

কবরস্তান! গোরখোদক! ফালু!

সঙ্গে সঙ্গে বিসতৃর্ণ ক্ষেতের উপর দিয়ে দৌড়ে গেলো ছফা। রমাকান্ত মাস্টার ভড়কে গিয়ে চেয়ে রইলেন তার দিকে। ভদ্রলোকের চোখে রাজ্যের বিস্ময়। কিন্তু সেই অভিব্যক্তি দেখার ফুরসত নেই নুরে ছফার। প্রাণপণে দৌড়াতে দৌড়াতে একটা প্রার্থনাই করলো মনে মনে : আতরের যেনো খারাপ কিছু না-হয়।

চারপাশের ক্ষেতি জমি থেকে বেশ উঁচু কবরস্তানটির কাছে আসতেই ছফা দেখতে পেলো একগুচ্ছ সাদা-পিপড়ার মতো মানুষ জড়ো হয়ে আছে! ক্ষণিকের জন্যে থমকে দাঁড়ালো সে। চোখ কুচকে দেখার চেষ্টা করলো, তারপর আবারো পা বাড়ালো কবরস্তানের দিকে। এবার না দৌড়ে, জোরে জোরে হেঁটে।

একটা লাশ ঘিরে আছে জনাবিশেক মানুষ। বেশিরভাগেরই পরনে সাদা পাঞ্জাবি, পায়জামা নয়তো লুঙ্গি। সবার মাথায় টুপি। তাদেরই একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো তার। মাঝবয়সি লোকটা অচেনা একজনকে কবরস্তানে ঢুকতে দেখে ভুরু কুচকালো। এরকম সময় প্যান্ট শার্ট, জ্যাকেট আর জুতো পরা কাউকে দেখে অবাক মনে হলো তাকে।

"আপনে?" ছফাকে দেখে বললো সেই লোক। "কারে খুঁজতে আইছেন?"

ছফা প্রথমে ভাবলো আতরের কথা বলবে, কিনতু সেটা বাতিল করে দিলো। "ফালুকে।" অবশেষে গোরখোদকের নামটাই বললো সে।

"ফালুরে খুঁজতাছেন?" অবাক হলো মাঝবয়সি লোকটা। "ওরে তো আমরাও খুঁজতাছি, কই যে গেছে কে জানে! কাইল রাইতে খুঁজতে আইলাম দেখি ফালু ঘরে নাই... আইজ সকালে আইসা যহন কইলাম, কয় সে নাকি ঘরেই আছিলো...এহন আবার লাপাত্তা। পোলাটার কী হইছে কে জানে।"

ছফা ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো লোকটার দিকে।

“জানাযা পড়ন শ্যাষ.. মুরদা লইয়া বইসা আছি.ফালুর কুনো খবর নাই..কব্বরটা খুইদা আবার মাটি দিয়া ভইরা রাখছে…ক তো দেহি কী কারবার।”

কবর! সতর্ক হয়ে উঠলো ছফা। মাটি দিয়ে ভরাট করে রেখেছে। নড়েচড়ে উঠলো সে। “আতরকে দেখেছেন? আতর আলী..ইনফর্মার?”

লোকটা বেশ অবাক হলো। “আতর এইহানে কেন আইবো? আজব কথা কইলেন।”

“ও এখানে নেই?”

এবার বিরক্তই হলো মাঝবয়সি লোকটি। “পুরো! আমরা খুঁইজা মরতাছি। ফালুরে আর আপনে আইছেন…” বিরক্ত হয়ে লোকটা পা বাড়ালো একটু দুরে লাশকে ঘিরে থাকা লোকজনের দিকে। “কইথেকা এইসব মানুষ আইছে আল্লায়ই জানে…” বিড়বিড় করে বলতে বলতে চলে গেলো সে।

ছফার মাথা দ্রুত হিসেব করে চললো। আর এখানে এসেছে অথচ সে নেই। ফালুও নেই। কি হতে পারে? “ভাই, শোনেন?” চট করে পেছন থেকে ডেকে উঠলো সে।

লোকটা দ্বিগুন বিরক্তি নিয়ে ফিরে তাকালো। “আবার কি হইছে?”

“যে কবরটা ভরাট করে ফেলেছে সেটা কোথায়?”

লোকটা একটু রুষ্টই হলো প্রশ্নটা শুনে। “ঐ-দিকে।” আঙুল তুলে কবরস্তানের একটি জায়গা দেখিয়ে দিলো সে।

ছফা কিছু না বলে পা বাড়ালো সেদিকে। কবরটার পাশে এখনও বেশ কিছু আলগা মাটির স্তূপ রয়ে গেছে। একটা কোদাল আর বেতের টুকরি পড়ে আছে সেই স্তূপের কাছে। কবরের সামনে এসে ভালো করে দেখলো। অর্ধেকেরও বেশি ভরাট করে ফেলা হয়েছে আলগা মাটি দিয়ে। কাজটা যে খুব তাড়াহুড়া করে করা হয়েছে সেটা বোঝা যাচ্ছে। কবরের

উপরে আলগা মাটির স্তূপের দিকে তাকালো। অনেকগুলো নগ্ন পায়ের ছাপ রয়েছে। নিশ্চয়ই গোরখোদকেরই হবে। কিন্তু এখানে এটাই একমাত্র পদচিহ্ন নয়। আরেকটা ছাপ চোখে পড়লো তার। স্যান্ডেলের ছাপ। তারপরই একটা জিনিস চোখে পড়লো।

কবরের ঠিক পাশেই আলগা মাটির মধ্যে সস্তা একটি মোবাইলফোন নরম মাটিতে দেবে আছে। দেখামাত্রই চিনতে পারলো সে।

আতর!

সঙ্গে সঙ্গে কবরে নেমে পড়লো সে। তাকে এটা করতে দেখে লাশের সঙ্গে আসা ক্ষুব্ধ মানুষগুলো বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলো কয়েক মুহূর্তের জন্য। উদভ্রান্তের মতো আলগা মাটিগুলো হাত দিয়ে সরাতে শুরু করলো ছফা।

"কি হইছে, ভাই?" লাশের সঙ্গে আসা এক লোক জিজ্ঞেস করলো, বিস্ফারিত চোখে ছফার কাজ দেখছে সে। তার পেছনে জড়ো হয়ে গেলো আরো পাঁচ-ছয়জন।

ছফা জবা দেবার আগেই আতরের একটা হাত বেরিয়ে এলো মাটি সরাতে। "ভাই! আমাকে একটু হেল্প করেন! জলদি!" চিৎকার করে বললো

এরইমধ্যে কবরের পাশে যে জটলা তৈরি হয়েছে সেখান থেকে দু-জন তরুণ নেমে পড়লো কবরে। তিনজনের প্রচেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যেই আতর আলীর নিথর দেহটা মাটির নীচ থেকে টেনে বের করতে পারলো।

লাশের খাটোলা ঘিরে যে জটলা ছিলো সেটা মুহূর্তে সরে গেলো কবরের দিকে। একাকী হয়ে গেলো গোর দিতে আনা শবটি! কবর থেকে আতরের নিথর দেহটা উপরে তুলে আনা হলো। ইনফর্মারের সারা গায়ে মাটি লেগে একাকার, তারপরও থেতলে যাওয়া মাথাটা যে রক্তে একাকার বোঝা গেলো। প্রথমেই আতরের পালস দেখতে চাইলে ছফা। ঘাড়ে, হাতে আঙুল রেখে বোঝার চেষ্টা করলো সে এখনও বেঁচে আছে কিনা। পালস খুঁজে পেতে

একটু বেগ পেতে হলো। তার কাছে মনে হচ্ছে বড় দেরি হয়ে গেছে। হাল ছেড়ে দিয়ে অসহায়ের মতো আশেপাশে তাকালো সে। লোকটার এমন পরিণতির জন্য নিজেকেই দায়ি করলো।

"বাইচা আছে!" হঠাৎ চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো একজন। "এহনও বাঁইচা আছে!"

.

অধ্যায় ৩২

বিকেলের মধ্যেই সুন্দরপুরে একটা কথা চাউড় হয়ে গেলো : গোরখোদক ফালু আতরকে খুন করে পালিয়েছে, তবে কেউ তাকে পালাতে দেখে নি! খুনোখুনির চেয়েও বেশি আলোচনা হচ্ছে কেন এবং কি কারণে এমনটা ঘটলো। এ প্রশ্নের জবাব কারো কাছে নেই। সবাই যার যার মতো করে ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করছে।

স্বস্তির ব্যাপার হলো আতর এখনও মরে নি। সদরের সরকারী হাসপাতালে আছে সে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছে তার মাথার আঘাত গুরুতর হলেও ভাগ্যক্রমে বিপদমুক্ত হয়ে গেছে। জ্ঞান ফিরে এসেছে ইনফর্মারের। তবে আবোল-তাবোল বকছে বলে ডাক্তার কড়া ডোজের প্যাথেড্রিন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে।

সন্ধ্যা পর্যন্ত ছফা হাসপাতালেই ছিলো, তারপর সোজা চলে আসে এসপির বাংলোতে। মনোয়ার হোসেন এতে খুশিই হয়েছে। ছফাকে কাছে। পেয়ে সম্পর্কটা একটু গাঢ় করা যাবে। যা হয়েছে তা ভুলিয়ে দেয়া যাবে। বাংলোতে এসপি সপরিবারে থাকে না, তার পরিবার থাকে ঢাকায়। ছফাও ভেবে দেখেছে, তার পরিচয় জানাজানি হবার পর হোটেলে থাকার কোনো মানেই হয় না। তাছাড়া সে আর বেশি দিন থাকছে না এখানে। এ কয়টা দিন সানমুনের মতো নিম্নমানের হোটেলে থাকাই যেতো, ওটার বাথরুমগুলোর দুর্গন্ধ নাক চেপে সহ্য করাও সমস্যা হতো না কিন্তু অন্য একটা কারণে সে এসপির বাংলোতে উঠেছে-

ঢাকার সাথে অনায়াসে যোগাযোগ করা যাবে এখান থেকে। ফ্যাক্স মেশিন আর ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা আছে এসপির বাংলোতে।

হাসপাতালে যখন ছিলো তখন তার সহকারী ফোন করে জানিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পেরেছে সে। ছফা তাকে বলেছে মেইল না করে কিছুক্ষণ পর সুন্দরপুরের এসপির ফ্যাক্স-এ রিপোর্টটা পাঠিয়ে দিতে। তার সহকারী তাকে কিছুটা ধারণাও দিয়েছে তবে সেটা এসপির সাথে শেয়ার করে নি। আগাম সতর্কতা হিসেবে এসপিকে দিয়ে একটা কাজ করিয়েছে। মুশকান জুবেরির বাড়ির বাইরে সাদা পোশাকের দু-জন পুলিশ নিয়োজিত করা হয়েছে বিকেলের পর থেকে। ঐ মহিলা যেনো কোনোভাবেই বাড়ির বাইরে যেতে না পারে। সেই সাথে ঐ দু-জনকে এটাও বলে দিয়েছে, কাজটা করতে হবে সতর্কতার সাথে, মহিলা যেনো কোনো কিছু আঁচ করতে না পারে। ছফা জানে এসপি মনোয়ার অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাজটা করেছে। এ মুহূর্তে তাকে সহযোগীতা করা ছাড়া ভদ্রলোকের আর কোনো উপায় নেই।

এসপির বাংলোয় এসেই গোসল করে নিয়েছে। সারাদিনে এ কাজটি করার সুযোগ পায় নি। গোসল করার পর এক কাপ চা নিয়ে বসলো বাংলোর ড্রইংরুমে। এসপি মনোয়ার হোসেনও আছে তার সাথে, তবে ভদ্রলোক আগ বাড়িয়ে কিছু বলছে না।

ড্রইংরুমে রাখা ফ্যাক্স মেশিনটা বিপ্ করে উঠলে ছফা চেক করে দেখলো। এসপি মনোয়ার কিছু বলতে গিয়েও বললো না।

চায়ের কাপে দ্রুত কয়েকবার চুমুক দিয়ে চেয়ারে বসে পড়লো ছফা। তার সহকারী রিপোর্ট পাঠাতে শুরু করেছে। এরপর পাঁচ মিনিট ধরে ফ্যাক্স থেকে বের হয়ে এলে পুরো রিপোর্টটি। কাগজগুলো নিয়ে তার জন্য বরাদ্দকৃত রুমে ঢুকে পড়লে এসপি কোনো প্রশ্ন না করে চুপচাপ চা খেতে লাগলো। বুঝতে পারছে ঢাকা থেকে মূল্যবান কিছু তথ্য এসেছে। মনে মনে সে এখনও মুশকান জুবেরির ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছে না। তার ধারণা তদন্তে আসল সত্য বের হয়ে এলে হয়তো দেখা যাবে মুশকান নয়, অন্য কোনো চক্র এসবের সাথে

জড়িত, তাদের কারণেই মুশকানকে সন্দেহ করছে ছফা। তদন্তকাজে এরকম ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক নয়।

এমন সময় এসপি মনোয়ারের মোবাইলফোনটা বেজে উঠলো। পকেট থেকে ফোনটা বের করে ডিসপ্লে দেখে কপাল কুচকালো সে। এটা আগেই আন্দাজ করেছিলো। লোকাল এমপি আসাদুল্লাহ ফোন দিয়েছে, সম্ভবত মুশকান জুবেরির ব্যাপারে কথা বলার জন্য। একটু ভেবে ফোনটার রিংটোন বন্ধ করে রেখে দিলো পাশের টেবিলে। এ মুহূর্তে কি না কি বলে ঐ নুরে ছফার রোষানলে পড়তে চাইছে না সে।

*

চারপাশে অন্ধকার নেমে এসেছে, যদিও রাত নামে নি এখনও। সময়ের হিসেবে সন্ধ্যা তবে ঘড়িতে এখনও ছয়টা বাজে নি। শীতকাল বলে দ্রুত সূর্য ডুবে গেছে।

জমিদার বাড়ির মেইনগেট থেকে একটু দূরে, বড় একটা গাছের নীচে দু-জন মানুষ দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুকে যাচ্ছে। বোবা দারোয়ান তাদের দেখতে পায় নি। বেশ সতর্কভাবেই দারোয়ানের দৃষ্টি এড়িয়ে চলছে তারা।

অলোকনাথ বসুর বিশাল বাড়িটি আর সব দিনের মতোই সুনসান। কোনো মানুষ বের হয় নি, ভেতরেও যায় নি কেউ। যে দু-জন লোক নজর রাখছে তারা নিজেদের মধ্যে খোশগল্প করেই সময় পার করে দিচ্ছে। মুশকান জুবেরির মতো একজন মহিলাকে কেন এভাবে নজরদারি করা হচ্ছে তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে রসালো আলাপ করছে তারা।

দেড়ঘণ্টা ধরে ডিউটিতে আছে, এখন পর্যন্ত কাউকে আসা-যাওয়া করতে দেখে নি। এই সময়ের মধ্যে একটা টু শব্দও শোনে নি তারা। যেনো মৃতপুরীর মতো বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। নীচুস্বরে নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় হঠাৎ দূর থেকে একটা চিৎকার ভেসে এলে দু-জনেই শুনতে পেলো সেটা।

একটা নারীকণ্ঠ!

একে অপরের দিকে তাকালো। এটা কি রিপোর্ট করার মতো কিছু? তারা একমত হতে পারলো না। তাদেরকে শুধু বলা হয়েছে ওই বাড়ি থেকে যেনো কেউ বাইরে বের হতে না পারে সেটা দেখতে। বাড়ির ভেতরে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা তাদের দেখার বিষয় নয়। তাছাড়া চিৎকারটা মাত্র দু-বার হতেই থেমে গেছে। আর কোনো সাড়াশব্দ হলো না বলে দু-জনে আবার ফিরে গেলো নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায়।

*

বোবা ইয়াকুব মেইনগেটের পেছনে বসে থাকলেও তার কোনো ধারণাই নেই বাইরে দু দু-জন লোক এই বাড়ির দিকে নজর রাখছে। বোবা বলে দোতলা থেকে যে নারীকণ্ঠের চিৎকার ভেসে এসেছে সেটা শুনতে পায় নি। ছোট্ট একটা টুলের উপর বসে আসন্ন অভিসারের চিন্তায় মশগুল সে। বিকেলের আগে একটা কাজে রবীন্দ্রনাথে গেছিলো, ফেরার পথে এক প্যাকেট নিয়ে এসেছে। সাফিনা তাকে ইশারা দিয়েছে, আজ হবে। সেই হবে'র আশায়। ভেতরটা ছটফট করছে। তবে সে জানে, বেশি ছটফট করে লাভ নেই। রাত নামুক, গাঢ় হোক, সবাই ঘুমিয়ে পড়ুক, তারপর...

বাড়িটার দিকে তাকালো। দোতলার একটি রুমে আলো জ্বলছে। নীচতলার একটি রুমেও এইমাত্র আলো জ্বলে উঠলো। এখন জানালার সামনে এসে ইচ্ছে করে বার বার বুকের আঁচল ফেলে ঠিক করছে না, তাকে ক্ষেপিয়ে তুলছে না। মেয়েটা এভাবেই তাকে পাগল করে তোলে সব সময়। জংলি বানিয়ে দেয় তাকে। কিন্তু বোবা অবাক হয়ে দেখতে পেলো সাফিনা আজ জানালার সামনে আসছে না। অধীর আগ্রহে সে চেয়ে রইলো।

*

ওদিকে সাফিনা এখন দোতলায় ওঠার সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে। একটু আগে উপর থেকে অদভুত এক চিৎকার শুনতে পেয়েছে সে। নিজের ঘরের খাটে

একটু চোখ বন্ধ করে আধোঘুমে চলে গেছিলো। হঠাৎ এই চিৎকারটাই তার কাঁচা ঘুম ভেঙে দিয়েছে। ঘরের বাতি জ্বালিয়ে কিছু বোঝার চেষ্টা করলেও আর কোনো আওয়াজ শুনতে পায় নি।

তবে এটা নিশ্চিত, উপরতলা থেকে চিৎকারটা এসেছে। আর সেটা কে দিয়েছে সে ভালো করেই জানে। সঙ্গে সঙ্গে দোতলায় ছুটে যাবার জন্য সিঁড়ির দিয়ে উঠতে লাগে, ল্যান্ডিংয়ে পোঁছাতেই মনে পড়ে যায়, পনেরো বিশ মিনিট আগে মুশকান ম্যাডাম তাকে বলেছিলো, খুব জরুরি কিছু কাজ করবে আজ, সে যেন উপরতলায় না আসে। যা-ই ঘটুক না কেন, উনি না। ডাকলে উপরতলায় যাওয়া যাবে না। সে-কারনে সাফিনা ল্যান্ডিংয়েই জমে গেলো। তার পা আর চললো না। ম্যাডামের কথার অবাধ্য হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি যখন বলেছেন, যা-ই ঘটুক না কেন তখন আর কোনো যুক্তিই খাটে না। দোতলায় যদি বোমাও ফাঁটে তাতেও কিছু করার নেই। বড়জোর সে ম্যাডামের কাছ থেকে ডাকের অপেক্ষায় থাকতে পারে। তাছাড়া এই ব্যাপারটা তো আর নতুন নয় যে সে উতলা হয়ে উঠবে। এর আগেও কয়েকবার দোতলা থেকে অদ্ভুত গোঙানি শুনতে পেয়েছিলো। খুব বেশি নয়। মৃদু। চাপা। এবং অল্প সময়ের জন্য। ওইসব ঘটনার আগেও ম্যাডাম তাকে বলতো, যা-ই ঘটুক না কেন। তখন অবশ্য ওর ঘর থেকেও বের হতে নিষেধ করতো। দরকার পড়লে উনি নিজেই ডাকবেন।

আজ দুপুরের পর থেকে ম্যাডামের আচরণ কেমনজানি মনে হচ্ছে তার কাছে। একটু অস্থিরতাও দেখেছে। ব্যাপারটা খুবই বিরল। এখানে আসার পর কোনোদিনই এক মুহূর্তের জন্যেও ম্যাডামকে অস্থির দেখে নি। যেনো অস্থির হবার দোষটা নিয়ে জন্মায়ই নি এই মহিলা। যা-ই ঘটুক, তিনি অটল, অবিচল। কোনো কিছুই তাকে ঘাবড়ে দিতে পারে না। দু-বছর আগে। একরাতে রবীন্দ্রনাথে আগুন লাগলো। ম্যানেজার আর ওখানে যারা থাকে তারা সবাই ছুটে এলো ম্যাডামের কাছে, উনি আগুনের কথা শুনে একটুও বিচলিত হলেন না। ঠাণ্ডা মাথায় বললেন, ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে অনেক সময় লাগবে। দূরের জেলাসদর থেকে আসতে আসতে রবীন্দ্রনাথ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে ততোক্ষণে। তারচেয়ে

ভালো নিজেরাই আগুন নেভানোর চেষ্টা করা ভালো। গরু আর মুরগির খামার থেকে কিছু কর্মচারিকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে পাঠিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথে। ওরা সবাই মিলে আগুন নেভাতে পারলেও বেশ ক্ষতি হয়ে গেছিলো, সেই ক্ষতির হিসেব যখন দিলো। ম্যানেজার, ম্যাডামের চোখে-মুখে কোনো বিকার ছিলো না। যেনো কিছুই হয় নি। সেই মুশকান ম্যাডাম আজ শুধু বিচলিতই নয়, একটু বিষণ্ণও বটে। বিকেলের পর থেকে তার মধ্যে একটু অস্থিরতা আর রাগও দেখেছে। এটাও বিরল ব্যাপার। এখন পর্যন্ত এই মহিলাকে কখনও রাগতে দেখে নি। এমনকি, ইয়াকুবের সাথে তার গোপন কাজ-কারবার দেখে ফেলার পরও রেগে যায়। নি। শুধুমাত্র সাবধান করে দিয়েছিলো কোনোভাবেই যেনো দুর্ঘটনা না ঘটে। এরপর থেকে সাফিনা সত্যি সত্যি সাবধানী হয়ে ওঠে। বোবাকে বাধ্য করে ওষুধের দোকানে যেতে। ওসব জিনিস ছাড়া কোনোভাবেই সে রাজি হয় না।

সাফিনা নেমে এলো সিঁড়ি দিয়ে। তার দৃষ্টি বেশ ঝাপসা হয়ে আসছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে, আর সেটাকে ছাপিয়ে গেলো অন্য একটি আশংকা। কেনজানি মনে হচ্ছে, আজকের রাতে তাদের অভিসারটি পণ্ড হয়ে যাবে।

.

অধ্যায় ৩৩

এসপি মনোয়ারের বাংলোয় নির্জন একটি ঘরে দরজা বন্ধ করে একঘণ্টা ধরে ফ্যাক্স করা রিপোর্টটি পড়ে গেলো ছফা। তার সহকারী জাওয়াদ নবীন হলেও দারুণ কাজ করেছে। ছেলেটার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে সে। এই ছেলে হাতেগোণা স্বল্প কিছু মানুষের মধ্যে পড়ে যাদেরকে যা বলা হবে। শুধু তা-ই করবে না, বরং যা বলতে ভুলে যাওয়া হয়েছে কিংবা যা বলা দরকার ছিলো তাও করবে। ছফাও কিছু কিছু বিষয় বলে নি, কিছু তার মনেও ছিলো না কিন্তু ছেলেটা সবই জোগাড় করেছে। তার রিপোর্টটাও বেশ গোছানো।

ভাষা খুব সহজ আর স্পষ্ট। অনিশ্চয়তা তৈরি করে এমন কোনো শব্দ-বাক্য ব্যবহার করে নি।

রিপোর্টটা একবার নয় দুবার নয়, বেশ কয়েকবার পড়েছে সে। আর প্রতিবারই পড়েছে ধীরে ধীরে, সব কিছু বোধগম্য করার জন্য। পড়া শেষে কাগজগুলো বিছানার তোষকের নীচে রেখে দিলো। এই ঘরে কোনো ড্রয়ার নেই, ওয়াড্রবে যে ড্রয়ার আছে ওগুলোতে কোনো লক নেই।

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখতে পেলো এসপি মনোয়ার ড্রইংরুমে বসে টিভি দেখছে বিরসমুখে। ইফাঁকে দেখে মুখ তুলে তাকালো। ভদ্রলোক।

"এমপিসাহেব ফোন দিয়েছিলেন।"

"কখন?"

"আপনি ঘরে ঢোকার পর পরই।"

"কি বললেন?"

"আমি কলটা রিসিভ করি নি।"

"ও," একটু থেমে আবার বললো, "মাত্র একবারই কল করেছিলেন?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো এসপি।

"মনে হয় আর কল করবেন না।"

মনোয়ার হোসেন স্থিরচোখে চেয়ে রইলো।

ছফা ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন অনুভব করলো না। ঘরে ঢুকে রিপোর্টটা পড়ার আগেই সে ঢাকায় ফোন দিয়েছিলো এখানকার এমপিকে নিরস্ত করার অনুরোধ জানিয়ে। সম্ভবত সেটা করা হয়েছে। ওসি আর এসপি'কে যেভাবে মুখ বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে ঠিক সেইমতো এমপিকেও মুখ বন্ধ রাখার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

"এরপর যদি আবার করে?" মনোয়ারসাহেব একটু ভেবে অবশেষে জানতে চাইলেন।

কাঁধ তুললো ছফা। "তাহলে আর কি, ধরবেন না। জাস্ট ইগনোর হিম ফর অ্যা হোয়াইল।" কথাটা বলেই পা বাড়ালো দরজার দিকে।

"আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

"হোটেলের রুম ছেড়ে দিয়ে লাগেজটা নিয়ে আসি।" মনোয়ার সাহেব আর কিছু বললো না।

এসপির বাংলো থেকে বের হতেই তার ফোনটা বেজে উঠলো। পকেট থেকে মোবাইলফোনটা বের করে দেখলো একটা অপরিচিত নাম্বার। হাঁটতে হাঁটতেই কলটা রিসিভ করলো।

"হ্যালো, কে বলছেন?"

ওপাশ থেকে মৃদু নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা গেলো। তারপরই ভেসে এলো একটা নারীকণ্ঠ।

"আমি কি নুরে ছফার সাথে কথা বলছি?"

ডিবির জাঁদরেল ইনভেস্টিগেটরের গায়ে কাটা দিয়ে উঠলো। কে

"হ্যা..আপনি কে বলছেন?"

“মুশকান জুবেরি।”

হাটা থামিয়ে দিলো সে। এই মহিলা তার নাম্বার পেলো কোত্থেকে? ওসি দিয়েছে? নাকি এসপি? যদি দিয়েও থাকে নিশ্চয় তার পরিচয় ফাঁস হবার আগে হবে সেটা।

“আশা করি চিনতে পেরেছেন।”

মুচকি হাসলো সে। “মুশকান জুবেরি নামের কারোর সাথে আমার কখনও কথা হয় নি.. পরিচয়ও হয় নি। সুতরাং ফোনে কণ্ঠ শুনে কিভাবে বুঝবো আপনি মিসেস জুবেরি?”

“সেজন্যেই ফোন দিয়েছি। আমি বুঝতে পেরেছি আপনি আমার ব্যাপারে আগ্রহী। জানি না কেন…তবে বেশ আগ্রহী সেটা বোঝা যাচ্ছে। আমি চাই, কেউ যদি আমার ব্যাপারে জানতে চায়..কারোর যদি আমার ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে সরাসরি আমাকেই সেটা বলুক। এতে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকবে না।” এক নাগারে বলে গেলো মিসেস জুবেরি।

ছফা কী বলবে বুঝতে পারলো না।

“আপনি চাইলে আরো অনেক আগেই আমার সাথে দেখা করতে পারতেন। ওভাবে চোরের মতো আমার বাড়িতে ঢোকার কোনো দরকারই ছিলো না।”

ছফা এবারও কিছু বললো না। সে খুব অবাক হয়েছে মহিলা তাকে ফোন করেছে বলে। এরকমটি ঘুণাক্ষরেও আশা করে নি।

“বুঝতে পেরেছি, আমাকে নিয়ে আপনার মনে অনেক প্রশ্ন জমে আছে…সেগুলোর উত্তর দিতে আমি প্রস্তুত

“আপনি কি বুঝতে পেরেছেন, আমি কেন আপনার ব্যাপারে আগ্রহী?” অবশেষে মুখ খুললো ছফা।

“না। আর সেটা বুঝতে চাই বলেই ফোন দিয়েছি। আপনি আমার বাসায় এসে এককাপ কফি খেয়ে যেতে পারেন। আমি চেষ্টা করবো আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে।”

আমাকে কফির নেমন্ত্রণ দিচ্ছে! নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারলো নয়া সে।

“আমার বিরুদ্ধে যদি আপনার কোনো অভিযোগ থেকে থাকে তাহলে নিশ্চয় সেটা জানার অধিকার আমার আছে?”

“আপনি কি এখনই আমার সাথে দেখা করতে চাইছেন?”

“হ্যাঁ। আমি এখন ফ্রি আছি। চাইলে আসতে পারেন।”

ছফা একটু দ্বিধায় পড়ে গেলো।

“আমি দারোয়ানকে বলে দিচ্ছি…ঠিক আছে?”

ছফার জবাবের অপেক্ষা না করেই কলটা কেটে দিলো মুশকান জুবেরি। কিছু বুঝতে না পেরে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো সে।

“এনিথিং রং?”

সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখতে পেলো বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। এসপি। তার চোখেমুখে চিন্তার ছাপ।

“একটা ফোনকল এসেছিলো। তারপর একটু ভেবে আবার বললো সে, “আপনি কি আমার ফোন নাম্বারটা জানেন?”

“না,” মনোয়ারসাহেব বললো।

“থানার ওসিকে ফোর্স রেডি রাখতে বলবেন। আমি বলামাত্রই যেনো মুভ করতে পারে।” আর কিছু না বলে ছফা পা বাড়ালো মেইনগেটের দিকে।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে চুপচাপ বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলো সুন্দরপুরের এসপি।

.

অধ্যায় ৩৪

দুর থেকে একজন মানুষকে আসতে দেখে নড়েচড়ে উঠলো সাদা পোশাকের দু-জন পুলিশ। জমিদার বাড়ির মেইনগেট থেকে একটু দূরে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে তারা।

এই বাড়ির ভেতরে যে-ইঢুকুক না কেন তাকে কোনো রকম বাঁধা দেবে নয়া, তবে বের হলেই চেক করা হবে-এমনটাই বলা হয়েছে ওদেরকে। ফলে দু-জন পুলিশ আস্তে করে গাছটার আড়ালে চলে গেলো। কেউ ওদের দেখে ফেলুক সেটা যেনো না-হয়। খুবই সতর্কতার সাথে কাজটা করতে বলেছে। ওদের। নজর রাখা হচ্ছে কিন্তু কারোর নজরে পড়া চলবে না। এক জায়গায় এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে কারোর নজরে না পড়াটা অসম্ভব। কিন্তু ডিউটিতে আসার পর বাড়ি থেকে কেউ বের হয় নি, ঢোকেও নি। সে-কারণে কাজটা খুব সহজেই করা গেছে এতোক্ষণ ধরে।

আবছায়া অবয়বটি কাছে আসতেই বড় গাছটার দিকে তাকিয়ে কিছু খুঁজতে লাগলো। আড়ালে থাকা দু-জন ভড়কে গেলো একটু। তারা যে এখানে আছে এটা ঐ আগন্তুক কিভাবে টের পেলো?

“তোমরা কি আছো?” আস্তে করে বললো আবছায়া অবয়বটি।

গাছের আড়ালে থাকা দু-জন পুলিশ বুঝতে পারলো না কী করবে। তাদের মধ্যে একজন নীচু কণ্ঠে বললো তার সঙ্গিকে, “আমাগো ঐ স্যার মনে হইতাছে!”

প্রথমে সে-ই বেরিয়ে এলো গাছের আড়াল থেকে, তাকে অনুসরণ করলো তার সঙ্গি।

“স্লামালেকুম, স্যার,” প্রথমজন এগিয়ে এসে বললো। দ্বিতীয়জনও একই কায়দায় সালাম ঠুকলো।

“কি অবস্থা?” একটু সামনে এগিয়ে এলো অবয়বটি।

এ হলো সেই নুরে ছফা। ঢাকা থেকে এসেছে। ওসিসাহেব যার ভয়ে তটস্থ হয়ে আছে এখন।

“কেউ বার হয় নাই,” প্রথমজন জবাব দিলো। “ঢুকেও নাই।”

“গুড

“তয় সন্ধ্যার দিকে একটা চিৎকারের আওয়াজ পাইছিলাম, স্যার।”

ভুরু কচকে ফেললো ছফা। “চিৎকার?”

“হ। একটা মহিলার চিৎকার।”

“কি বলো? তারপর?”

“তারপর আর কুনো আওয়াজ পাই নাই। বাড়ি থেইকাও কেউ বাইর হয় নাই।”

নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো ছফা। একটু ভেবে দু-জনের উদ্দেশে বললো, “আমি ঐ বাড়িতে যাচ্ছি। তোমরা নজর রেখো। আমি ভেতরে ঢোকার পর কাউকে ঐ বাড়িতে ঢুকতে দেবে না। আর তোমাদেরও লুকিয়ে থাকার দরকার নেই। গেটের সামনেই থেকো।”

“ঠিক আছে, স্যার,” প্রথমজন বললো।

“তোমাদের সাথে আমস আছে তো?”

“জি, স্যার।” দুজনে একসাথে জবাব দিলো।

“গুড।” কথাটা বলেই মেইনগেটের দিকে পা বাড়ালো সে।

বন্ধ গেটটার সামনে আসতেই ছোটো গেটটা খুলে দিলো দারোয়ান। সম্ভবত ফুটো দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলো সে। তাকে দেখে নিঃশব্দে সালাম ঠুকলো ইয়াকুব। কিছু না বলে মাথা নীচু করে ঢুকে পড়লো ছফা। দরজাটা বন্ধ করেই বোবা দারোয়ান তাকে নিয়ে রওনা দিলো বাড়ির দিকে। চারপাশে চকিতে চোখ বুলালো। গতকালের মতোই সুনসান পুরো বাড়িটা। মূল বাড়ির সদর-দরজাটা খোলাই আছে। ভবনের ডানপাশে গাড়ি রাখার যে গ্যারাজটা আছে তার বাইরে পার্ক করে রাখা আছে একটি প্রাইভেটকার। ছফা বুঝতে পারলো, এটাই মুশকান জুবেরি ব্যবহার করে।

বোবাকে অনুসরণ করে ভেতরে ঢুকে পড়লো সে। একটা মাঝারি গোছের হলওয়ে। দু-পাশে কতোগুলো দরজা, সবগুলোই বন্ধ। ভেতরটা মৃদু লালচে বাল্বের আলোয় কিছুটা আলোকিত। এই স্বল্প-আলো মনে করিয়ে দিচ্ছে বাড়িটার অতীত সময়কে।

হলওয়ের ডান দিকে একটা কাঠের সিঁড়ি। বোবা সেই সিঁড়ির সামনে এসে থেমে গেলো, হাত তুলে ইশারা করলো সোজা উপরে চলে যেতে। ছফা। কিছু বলতে গিয়েও বললো না। গভীর করে দম নিয়ে পা বাড়ালো সিঁড়ির দিকে।

কাঠের সিঁড়ি হলেও পুরোটাই কার্পেটে মোড়ানো। রেলিংটা চমৎকার নক্সা করা, কালচে বার্নিশ। সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে আরেকটা লালচে বাতি জ্বলছে। দোতলায় উঠতেই থমকে দাঁড়ালো সে। তার থেকে কয়েক গজ দুরে বুকের কাছে দু-হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে মুশকান জুবেরি। মহিলা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে মাথার উপরে একটা ছোটো

ঝারবাতি জ্বলছে। খুবই মৃদু আলো আসছে সেটা থেকে। সেই আলোতে মুশকান জুবেরিকে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে।

যথারীতি শাড়ি পরে আছে মহিলা। গায়ে একটা শাল, তবে গতরাতের মতো লাল নয়, ঘিয়েরঙ। শাড়িটাও জামদানি নয়, সাদারঙের সাধারণ সুতির। চোখে টানা করে কাজল দেয়া। চুলগুলো সুন্দর করে বেঁধে খোঁপা করে রেখেছে। কপালে লালটিপ। শালের সাথে ম্যাচ করে ঠোঁটে হালকা ঘিয়েরঙা লিপস্টিক। তার চোখের দৃষ্টি অন্তর্ভেদী, কিন্তু মোহনীয়। সত্যি বলতে দুর্দমনীয়!

ছফার ধারণা মহিলা তাকে প্রলুব্ধ করে বাগে আনার চেষ্টা করবে। মনে মনে মুচকি হাসলো সে। যদি ওরকম কিছু ভেবে থাকে তাহলে মিসেস জুবেরি বিরাট বড় ভুল করেছে। সব পুরুষমানুষ ঐ এমপি আর এসপির মতো নয়!

"আসুন," বললো মুশকান।

সম্বিত ফিরে পেলো ছফা। এতোক্ষণ ধরে যে মহিলার দিকে তাকিয়ে আছে বুঝতেই পারে নি।

মুশকান জুবেরি ঘুরে গেলো। তার পদক্ষেপ খুবই ছোটো; শান্ত; আর অভিজাত। ছফা তার পেছন পেছন গিয়ে ঢুকলো বড় একটা ঘরে। একেবারেই পুরনো আভিজাত্য নিয়ে সাজানো হয়েছে ঘরটা। কাঠের ফ্লোরটার বেশিরভাগ মোটা কার্পেটে মোড়ানো। উত্তর দিকের দেয়ালে দু দুটো বিশাল বুকশেলফ। সেই শেলফ দুটোর উপরে একটি হরিণ আর ভালুকের মাথা স্টাফ করা। পুরনো দিনের কলের গান গ্রামোফোন রয়েছে শেলফের পাশেই। ওটার পাশে ছোট্ট একটা র‍্যাকে প্রচুর লং-প্লে, যা আজকাল আর দেখা যায় না। একসেট পুরনো ধাঁচের সোফা রয়েছে ঘরে, আরো আছে মোড়া জাতীয় কিছু আসন। ঘরের এককোণে একটা ইজিচেয়ারও দেখতে পেলো। বড় আর আয়তক্ষেত্রের নীচু টেবিল, কিছু মাঝারিগোছের আসবাব, কফি টেবিল আর অসংখ্য অ্যান্টিকে সাজানো। ঘরটা দেখে ছফা

বুঝতে পারলো এটা মুশকান জুবেরির স্টাডিরুম। এখানেই বাইরের মানুষজনের সাথে দেখা করে মহিলা, আবার বাকি সময়ে এটাই তার স্টাডিরুম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

"বসুন," একটা সিঙ্গেল সোফা দেখিয়ে বললো বাড়ির মালিক। নিজে বসলো একটু দূরে মোড়ার মতো আসনে।

ছফা ঘরটার চারপাশে আরেকবার তাকিয়ে বসে পড়লো। হাতাওয়ালা পুরনো দিনের সোফাটা বেশ আরামদায়ক।

"চা নাকি কফি, কোনটা নেবেন?" বেশ আন্তরিকভাবেই জানতে চাইলো মুশকান।

"কোনোটাই না," মাথা দুলিয়ে বললো ছফা।

মুচকি হাসলো মিসেস জুবেরি। আমার বাসায় এসে কোনো কিছু খেতে ভয় পাচ্ছেন?"

"না," জোর দিয়ে বললো ডিবির ইনভেস্টিগেটর। যদিও কথাটা একদিক থেকে সত্যি। অতি সতর্কতা তো এক ধরণের ভয়-ই! "আমি আসলে দরকারি কথা শোনার জন্য এসেছি।"

মুশকান স্থিরচোখে তাকিয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। "তার মানে, আপনার হাতে সময় খুব কম?"

"কার সময় কম সেটা সময় এলেই বোঝা যাবে।"

একটু ভেবে বললো মুশকান, "ঠিক আছে, তাহলে শুরু করুন।"

"এখানে আসার আমন্ত্রণটা কিন্তু আপনিই দিয়েছেন…আপনিই শুরু করুন।"

আবারো মুচকি হাসি দেখা গেলো মুশকানের ঠোঁটে। “আমি কিভাবে শুরু করবো? আমি তো জানিই না একজন পুলিশ কেন আমার পেছনে লেগেছে।”

ভুরু তুললো ছফা। “আপনি তাহলে জেনে গেছেন আমি পুলিশের লোক?”

“এটা জানা এমন আর কি।”

“কিন্তু আমার ফোন নাম্বারটা কিভাবে পেলেন?”

“এটা কি কঠিন কাজ?” মাথা দোলালো মিসেস জুবেরি। “ফোনের ব্যালান্স রিচার্জ করার জন্য এখানে খুব বেশি দোকান নেই।”

ভুরু কুচকে ফেললো ছফা। আতর আলী যেভাবে তার নাম্বার জোগাড় করেছিলো ঠিক একইভাবে মুশকান জুবেরিও হয়তো কাজের লোকজন কিংবা হোটেলের কর্মচারিদের দিয়ে তার নাম্বার বাগিয়ে নিয়েছে।

“আর আমি যে পুলিশ এটা নিশ্চয় এসপি কিংবা ওসি বলেছে? নাকি ঐ এমপি?”

মাথা দোলালো মুশকান। “ওরা কেউ আমাকে বলে নি আপনি পুলিশ। ইনফ্যাক্ট, ওরা হঠাৎ করে আমার ফোনই ধরছে না। বলতে পারেন, সে কারণেই আমি ধরে নিয়েছি আপনি পুলিশই হবেন।”

“বাহ্, প্রশংসা না করে পারছি না।”

“কিসের?”

কথাটা বলার সময় মুশকান জুবেরির চাহনিটা ছফাকে মুগ্ধ করলো। “আপনার লজিক-সেন্সের।”

"ও।" একটু থেমে আবার বললো, "এখন বলুন, আমার বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগটা কি? এটা জানার অধিকার নিশ্চয় আমার রয়েছে?"

"অবশ্যই," বললো ছফা। "তবে তার আগে আমাকে বলুন আপনি কে, কোত্থেকে এসেছেন।"

এবার মুশকান ভুরু কুচকালো, তবে সামান্য সময়ের জন্য। "আমার সম্পর্কে কিছু না জেনেই এখানে চলে এসেছেন?"

"কিছু জানি না তা তো বলি নি…অনেক কিছুই জানি।"

"তাই?" মুচকি হাসলো মহিলা।

"শুনি তো, কি জানেন।"

ছফা গভীর করে দম নিয়ে নিলো। তার সহকারী যে তথ্য পাঠিয়েছে সেগুলো বলতে গেলে অকাট্য। "আমাকে পরীক্ষা করবেন না, ডাক্তার মুশকান সোহেলী!"

স্থিরচোখে চেয়ে রইলো মিসেস জুবেরি। তার চোখেমুখে কপট মুগ্ধতা।

"রাশেদ জুবেরিকে বিয়ে করার আগে তা-ই ছিলেন," ছফা আয়েশ করে হেলান দিলো সোফায়। "সপরিবারে আমেরিকায় ছিলেন দীর্ঘদিন। তারপর হুট করেই দেশে চলে এলেন। ঢাকার অরিয়েন্ট হাসপাতালে যোগ দিলেন এক সময়।"

মুশকান কিছু বললো না। তার অভিব্যক্তি দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই সে কি ভাবছে।

"সেখানে রোগি হিসেবে পেয়ে গেলেন রাশেদ জুবেরিকে। উনি প্রোস্টেট ক্যান্সারে ভুগছিলেন। একেবারে টার্মিনাল স্টেজে ছিলেন। আপনাদের হাসপাতালে দীর্ঘদিন চিকিৎসা

নিয়েছে ভদ্রলোক। অবিবাহিত বলে তাকে দেখাশোনা করার কেউ ছিলো না। বাবা-মা একাত্তরে মারা গেছে। বাবার দিক থেকে কিছু আত্মীয়-স্বজন থাকলেও মায়ের দিকে নিকট কোনো নিকটাত্মীয় বলতে গেলে এখন আর নেই।” একটু থামলো মহিলার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য, কিন্তু হতাশ হলো। মুখটা যেনো তৈলচিত্রের মতো স্থির হয়ে চেয়ে আছে তার দিকে। পলক প্রায় ফেলছেই না।

“রাশেদ জুবেরি প্রায় তিনমাস ছিলেন অরিয়েন্ট হাসপাতালে...তখনই আপনার সাথে বেশ ভালো সম্পর্ক তৈরি হয় কিন্তু সেটা ডাক্তার-রোগির সম্পর্কের বাইরে কিছু ছিলো না... যতোটা আমি জেনেছি।” আবারো থামলো তবে এবার কথা গুছিয়ে নেবার জন্য। “রাশেদ জুবেরি বুঝে গেছিলেন উনি আর বেশি দিন বাঁচবেন না। কয়েক মাসের ব্যাপার। বেশ খাদ্যরসিক ছিলেন ভদ্রলোক, এটা-ওটা খেতে চাইতেন। কিন্তু তার সেই আব্দার পূরণ করার মতো কেউ ছিলো না...আপনি ছাড়া।”

মুশকনি এবার আলুতো করে হেসে বুকের কাছে দু-হাত ভাঁজ করলো।

“আপনি নিজের হাতে রান্না করে উনাকে খাওয়াতে শুরু করলেন। উনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সম্ভবত আপনার অসাধারণ রান্নায় সম্মোহিত হয়ে গেলেন পুরোপুরি। এজন্যে আমি ভদ্রলোককে অবশ্য দোষও দেই না। আপনার রান্না সতিই অতুলনীয়।”।

মুচকি হেসে ভুরু তুললো মুশকান জুবেরি। “এটা কি আপনার নিজস্ব মতামত?”

“বলতে পারেন..কারণ আমিও রবীন্দ্রনাথে খেয়েছি, অসাধারণ না বলে উপায় নেই।”

“ধন্যবাদ।”

“একটি প্রবাদ আছে...কারোর মন জয় করতে চাইলে আগে তার পাকস্থলী জয় করো। সেভাবেই আপনি রাশেদ জুবেরির মন জয় করতে সক্ষম হলেন...খুব দ্রুত।”

"আপনি কি শিওর, চা-কফি কিছু নেবেন না?" অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলে উঠলো মিসেস জুবেরি।

"নো থ্যাঙ্কস।"

"আমি যদি একটু কফি নেই তাহলে কিছু মনে করবেন? শীতকালে আমার ঘন ঘন চা-কফির তেষ্টা পায়...ওসব না-হলে মাথা ধরে আসে।"

"এটা আপনারই বাড়ি..জিজ্ঞেস করার কোনো দরকার নেই," মুচকি হেসে বললো ছফা।

"থ্যাঙ্কস," বলেই উঠে দাঁড়ালো মুশকান। বইয়ের শেলফের পাশে বাক্সের মতোন আসবাবের ভেতর থেকে একটা ফ্লাস্ক বের করে আনলো, সেইসাথে একটা কাপ। ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢেলে নিলো। "একটু বেশি করেই বানিয়েছিলাম...ভেবেছিলাম আপনি হয়তো খাবেন...কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এ বাড়িতে কিছু খাবেন না বলে আগে থেকেই ঠিক করে এসেছেন।"

ছফা কিছু বললো না।

"কোমরে পিস্তল, বাইরে দু-জন পুলিশ, তারপরও কোনো পুরুষ মানুষ একজন নিরস্ত্র মহিলাকে ভয় পেলে অবাক হতেই হয়।" ফ্লাস্কটা রেখে চলে এলো আগের জায়গায়।

ছফা খুবই অবাক হলো কথাটা শুনে। পুলিশ হিসেবে তার কাছে পিস্তল থাকাটা স্বাভাবিক, এটা কাণ্ডজ্ঞান বলে ধরে নেয়া যায়, কিন্তু বাইরে যে দু-জন আছে সেটা কিভাবে জানতে পারলো এই মহিলা। "মনে হচ্ছে আপনার চোখ সবদিকেই থাকে," আস্তে করে বললো সে। "অনেক কিছুই দেখতে পান?"

কফিতে চুমুক দিয়ে মাথা দোলালো মুশকান। "ব্যাপারটা অতো রহস্যময় নয়, যেমনটা আপনি আমার সবকিছুর বেলায় ভাবছেন," একটু থেমে ইজিচেয়ারের পাশে একটা

আবাবের দিকে ইশারা করলো। "ওখানে। একটা মনিটর আছে...তিন-চারটা সার্ভিল্যান্স ক্যামেরার ফিড দেখা যায়।"

তথ্যটা ছফাকে চমকে দিলো, সেইসাথে পেয়ে গেলো অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব।

"কি হলো, বলুন?" কফির কাপটা ঠোঁটের কাছে এনে অভেদী দৃষ্টি হেনে বললো মুশকান জুবেরি।

"তারপর রাশেদ জুবেরি হাসপাতাল ছেড়ে বনানীতে নিজের বাড়িতে উঠলেন. আপনিও তার সঙ্গি হলেন।"

কফির কাপে নিঃশব্দে চুমুক দিলো মুশকান।

"উনার সার্বক্ষণিক দেখভালের দায়িত্ব নিলেন। ভদ্রলোক যতোদিন বেঁচে ছিলেন আপনি তার পাশেই ছিলেন। ধরে নিচ্ছি, রোজ রোজ উনাকে মনভোলানো খাবার রান্না করে খাওয়াতেন।"

"মনভোলানো?" স্মিতহাসি দিলো মুশকান। "আমি ধরে নিচ্ছি এটা। কম্প্রিমেন্ট... যদিও আপনি কী অর্থে ব্যবহার করেছেন ঠিক বুঝতে পারছি না।" নির্বিকার থাকার চেষ্টা করলো ছফা। "রাশেদ জুবেরি হাসপাতাল ছাড়ার পর খুব বেশিদিন বাঁচেন নি..সম্ভবত চার মাস?"

"পাঁচমাস সতেরো দিন," শুধরে দিলো মিসেস জুবেরি। "আপনাদের বিয়েটা কবে হয়েছিলো?"

"এতোকিছু জানেন আর এটা জানতে পারেন নি?" কফির কাপটা পাশের কফি টেবিলে রেখে দিলো। "মনে হচ্ছে আপনার সোর্স অব ইনফর্মেশন ঐ হাসপাতালটাই।"

কথাটা সত্যি। ছফার সহকারী প্রায় সব তথ্যই ওখান থেকে জোগাড় করেছে। "রাশেদ জুবেরির সাথে আপনার বিয়ের খবরটা খুব কম মানুষই জানে।"

"হুম। আমরা তো আর ঘটা করে বিয়ে করি নি.. আবার টিনএজারদের মতো পালিয়েও সেটা করা হয় নি।" একটু থেমে গভীর করে দম নিয়ে নিলো। সে। "বিয়ের আইডিয়াটা একদমই ওর নিজের ছিলো। আমি প্রথমে রাজি ছিলাম না। পরে ভেবে দেখলাম একজন মৃত্যুপথযাত্রি...যে কিনা অল্প কিছুদিন বাঁচবে, তার একটা ইচ্ছে পূরণ করে তাকে দু-দণ্ড শান্তি দিতে পারলে মন্দ কী।"

"আর তাই আপনি উনাকে দু-দণ্ড শান্তি দেবার জন্য বনলতা সেন হয়ে গেলেন?"

ছফার টিপ্পনীটা মুশকান শুধুমাত্র হালকা বাঁকাহাসি দিয়ে জবাব দিলো। "কী হয়েছিলাম জানি না...তবে কাগজে-কলমে মিসেস জুবেরি হয়ে গেলাম। মুশকান জুবেরি।"।

"তারপর উনার সমস্ত সম্পত্তি আপনি আপনার নামে লিখিয়ে নিলেন?

স্থিরচোখে চেয়ে রইলো ডাক্তার। "আপনি আপনার নামের মতো ব্যতিক্রমী চরিত্র নন, মি. ছফা। সাধারণ মানুষ যেভাবে ভাবে আপনিও ঠিক সেভাবেই ভাবেন।" একটু থেমে আবার বলতে লাগলো সে, "আজ বাদে কাল যে মারা যাবে তাকে কোনো মেয়ে বিয়ে করলে সেটা অবশ্যই সম্পত্তির লোভে করবে-খুবই সাধারণ মানের চিন্তা-ভাবনা। আপনার এমন চিন্তা ভাবনায় আমি কিছুটা হতাশ। শিক্ষিত লোকজনদের আরো একটু উদার মনমানসিকতা থাকা দরকার।"

নুরে ছফা কিছু বললো না।

এবার নিঃশব্দে হাসলো মুশকান। "বিয়ের আগে আমি জানতামই না ওর নামে বিরাট সম্পত্তি রয়েছে...ওগুলো বেদখল হয়ে আছে দীর্ঘদিন ধরে। যখন জানতে পারলাম তখন

বিশ্বাসই করতে পারি নি সম্পত্তিগুলো কোনোদিন উদ্ধার করা যাবে। ও নিজেও এসব সম্পত্তির আশা ছেড়ে দিয়েছিলো।”

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো ছফা।

“বলছি, এতো অধৈর্য হবার দরকার নেই। আপনার সমস্ত প্রশ্নের জবাবই আমি দেবো।” গায়ের শালটা খুলে ঠিকঠাক করে আবারও শরীরে জড়িয়ে নিলো।

কয়েক মুহূর্তের জন্য ছফা মুগ্ধ হয়ে দেখলো তার সামনে বসা মহিলার দেহসৌষ্ঠব। যেকোনো তরুণীর চেয়েও দেহের গড়ন ভালো। নির্মেদ। রোগাও নয় আবার প্রয়োজনের তুলনায় বেশিও নেই কোনো কিছু। যেটা যেরকম থাকার কথা সেরকমই আছে। মহিলার বয়স আন্দাজ করতে পারলো না। কতো হবে? এসব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে কাজে মনোযোগ দিলো।

“২০০৭ সাল, এক-এগারো হিসেবে যেটা পরিচিত, সেই সময়টাতে ছুট করেই একটা দারুণ সুযোগ চলে এলো। রাশেদ তখন খুবই অসুস্থ। ওর এক ঘনিষ্ঠ বনধু ইকবাল ছিলো সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। সেনাসমর্থিত ঐ সরকারে ইকবালের খুব প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিলো। ওর মাধ্যমেই বেদখল হওয়া সম্পত্তিগুলো রাতারাতি ফিরে পাই আমরা।”

এই তথ্যটা ছফা আতরের কাছ থেকে জেনেছিলো। ঐ সময়ে রাজনীতিবিদেরা ছিলো দৌড়ের উপরে, সেই সুযোগে বেদখল সম্পত্তিগুলো খুব দ্রুত ফিরে পাওয়াটা স্বাভাবিকই। তবে সে অবাক হচ্ছে, মহিলা অকপটে সত্যি কথা বলছে বলে।

“তবে দু-বছর পর নির্বাচন হলে.ইকবালরা চলে যায়, আসে নতুন সরকার…তখন আবার সম্পত্তিগুলো বেদখল হতে শুরু করে।”

“এখানকার স্থানীয় এমপি আসাদুলাহ?”

ছফার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো মুশকান। "ইকবাল থাকতেই জমির কাগজপত্রগুলো ঠিকঠাক করে নিয়েছিলাম কিন্তু ঢাকায়। বসে সুন্দরপুরের বিশাল সম্পত্তি দখলে রাখাটা কঠিনই ছিলো।"

"পরে এমপির সাথে একটা রফা করে নিলেন? ফিফটি-ফিফটি? নাকি ফরটি-সিক্সটি?"

মুচকি হাসলো মুশকান। "এরকম কিছু করা হয় নি। জুবেরি আমার নামে যে অংশগুলো লিখে দিয়েছিলো সেগুলোর সবটাই ফিরে পাই তবে বিনিময়ে একটা আপোষ করতে হয়েছিলো আমাকে।"

"কি রকম?"

"অলোকনাথ বসু তার সম্পত্তির প্রায় ষাটভাগ দেবোত্তর সম্পত্তি হিসেবে দান করে গেছিলেন...ঐ সম্পত্তিগুলো এমপির পকেটে চলে যায়। আর এটা করতে আমি তাকে সাহায্য করেছি। বলতে পারেন, সাহায্য করতে বাধ্য হয়েছি।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ছফা। "তারপর চলে এলেন এখানে?"

"কিন্তু আপনার চাকরি? ওটা ছাড়লেন কেন?"

মুশকান চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। "ভালো লাগছিলো না। আমি আসলে প্রকৃতির কাছাকাছি থাকার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিলাম। সেই সুযোগটা এসে যায় এই সম্পত্তিগুলো পাবার পর। তখন ঠিক করলাম, আর চাকরি নয়...সব ছেড়েছুঁড়ে বহু দূরে গিয়ে থাকবো। তাছাড়া মৃত্যুর আগে রাশেদ আমাকে একটা রেসটুরেন্ট করার জন্য অনুরোধ করেছিলো। সে বলেছিলো, আমার জাদুকরি রান্নার স্বাদ থেকে মানুষজনকে বঞ্চিত করা ঠিক হচ্ছে না।" মুচকি হাসলো মুশকান। "এমনকি মৃত্যুর আগেও আমার হাত ধরে এ কথাটা বলেছিলো। বলতে পারেন, তার কথা রাখার জন্যই রবীন্দ্রনাথ করেছি। অবশ্য, ও ভাবে নি আমি এই সুন্দরপুরে এসে এটা করবো।"

ছফা অনেক কষ্টে কথা বলা থেকে নিজেকে বিরত রাখলো। সে চাইছে, আগে মুশকান জুবেরি নিজের মুখে সব বলুক।

"তাকা আমার কাছে অসহ্য ঠেকছিলো…তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ নিয়ে যে রকম পরিকল্পনা আমার ছিলো সেটা ঢাকায় কিংবা আশেপাশে করা সম্ভব ছিলো না।"

"কেন?"

"ঢাকায় কোনো কিছু বিশুদ্ধ, কেমিক্যালফ্রি..ফরমালিনমুক্ত পাওয়া যায় না। ডাক্তার হিসেবে অন্য অনেকের চেয়ে এটা আমি ভালো করেই জানতাম। তরিতরকারি, ফলমূল থেকে শুরু করে মাছ-মাংস, কোনো কিছুই এসব থেকে মুক্ত নয়। এমনকি, দুধ পর্যন্ত বিষে ভরা। আমি চাই নি। রবীন্দ্রনাথে এসব জিনিস দিয়ে রান্না করা হোক। তাছাড়া ওসব ভেজাল জিনিস ব্যবহার করে আমার মনমতো রেসিপি তৈরি করাও সম্ভব ছিলো না। স্বাদের ব্যাপারটা খুবই সূক্ষম। সামান্য হেরফের হলেও বদলে যায়।"

"আচ্ছা," আস্তে করে বললো নুরে ছফা।

"কিন্তু এখানে প্রচুর আবাদি জমি আছে…থাকার মতো সুন্দর একটি বাড়িও আছে, আমি ইচ্ছে করলে সবকিছুই ফলাতে পারি, চাষবাস করতে পারি, তাই ঠিক করলাম এখানেই চলে আসবো।"

"আপনি কি কুমীরের মাংস দিয়েও রেসিপি করেন নাকি?"

মুচকি হেসে মাথা দোলালো মুশকান। "না। ওগুলো মাত্র তিন-চার মাস ধরে ব্রিডিং করছি। অনেকটা শখে। তবে ভবিষ্যতে বিদেশে রপ্তানী করার পরিকল্পনা আছে আমার।"

"আপনার এই শখটা কিন্তু সিকিউরিটি পারপাসও সার্ভ করছে দারুণ আইডিয়া।"

এবার চোখ দিয়ে হাসলো মুশকান জুবেরি। "গতকাল রাতের আগে অবশ্য এটা বুঝতে পারি নি। এখন মনে হচ্ছে আইডিয়াটা আসলেই দারুণ।"

ভুরু কুচকালো ছফা। "আর গতরাতে ফালুকে দিয়ে মাটি খুঁড়ে কি পুঁতে ফেললেন? সেটাও কি কোনো শখ?"

এবার বেশ কিছুটা সময় ধরে মুশকান জুবেরি হাসলো, তবে একদম নিঃশব্দে। "দেখে ভয় পেয়েছিলেন নাকি?"

প্রশ্নটা ছফার পৌরুষে লাগলেও হজম করলে চুপচাপ।

"আমি স্প্যানিশ কুইজিন খুব পছন্দ করি। ওদের কিছু ধরণ আমি দেশীয় খাবারের সাথে ব্লেন্ডিং করে রেসিপি বানিয়েছি। এটাকে এক ধরণের ফিউশন বলতে পারেন। খাবারগুলো লোকে পছন্দও করেছে। আপনিও সেগুলো খেয়েছেন। সম্ভবত পছন্দও করেছেন।"

"রেস্টুরেন্টেও কি আপনার চোখ সবকিছু লক্ষ্য করে?" শেষ পর্যন্ত না বলে পারলো না। "আই মিন, সার্ভিল্যান্স করেন?"

"হোটেল-রেসটুরেন্টে সার্ভিল্যান্স ক্যামেরা থাকাটা তো খুবই সাধারণ ব্যাপার, তাই না?" একটু থেমে আবার বললো, "নাকি সুন্দরপুরের মতো গ্রামীণ এলাকায় ওসব থাকাটা বেমানান?"

এবার ছফা বুঝতে পারলো মুশকান জুবেরি কেন তার দিকে ওভাবে তাকিয়েছিলো। আগেভাগে কিছু টের পাওয়াটা আসলে কোনো রহস্যময় ব্যাপার নয়, এটা নিছকই আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের বাড়তি সুবিধা। রবীন্দ্রনাথের প্রাইভেট রুমে বসে কাস্টমারদের মনিটর করার সুবিধা রয়েছে। আর সেই সুবিধা ব্যবহার করেই মুশকান জুবেরি দেখেছে তার গতিবিধি, চাহনি। অন্যসব কাস্টমার থেকে খুব সহজেই তাকে আলাদা করতে পেরেছে।

“গতরাতে গর্ত করে কি মাটিচাপা দিলেন, সেটা কিন্তু বললেন না?” প্রসঙ্গে ফিরে এলো নুরে ছফা।

“বলছি। স্প্যানিশ কুইজিন...ওসবে প্রচর রেডওয়াইন ব্যবহার করা হয়...বলতে পারেন পানির বদলে রেডওয়াইন দেয় ওরা। ওখানে রেডওয়াইন খুবই অ্যাভেলেবেইল। সস্তাও বটে। বিশেষ করে খাবারে ব্যবহার করা হয়। যেগুলো।”

রেডওয়াইন! ছফার মাথায় নানান হিসেব জট পাকাতে লাগলো।

“এখানে...এই দেশে রেডওয়াইন খুব কমই পাওয়া যায়...ঢাকা থেকে আপনি কয়েক বোতল আনতে পারবেন কিন্তু দাম পড়বে অনেক..আর জিসিটা পুরোপুরি লিগ্যালও হবে না।” একটু থেমে আবার বললো, “ওভাবে রেডওয়াইন এনে রান্না করলে খাবারের দাম হবে আকাশছোঁয়া...তাছাড়া, সব সময় ওয়াইনের সরবরাহও থাকবে না।”

“তাই আপনি নিজেই রেডওয়াইন বানাতে শুরু করলেন?”

“হুম। এটা বানানো এমন কোনো কঠিন কাজ নয়। খুব সহজ।” তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, “লাল আঙ্গুরের রস গেজানোর জন্য মাটির নীচে রাখার দরকার পড়ে... বুঝতে পেরেছেন?”

হতাশ এবং অসহায় বোধ করলো ছফা। মাটির নীচে তাহলে ওয়াইন রাখা হচ্ছিলো।

“বিশ্বাস না-হলে গতরাতে যেখানে ওয়াইনগুলো রেখেছি সেটা খুঁড়ে দেখতে পারেন।”

নিজের অভিব্যক্তি লুকানোর চেষ্টা করলো সে। বোঝাই যাচ্ছে তার সামনে যে বসে আছে সে থট-রিডিং করতে পারে। “আপনি নিশ্চয়ই সার্ভিল্যান্স ক্যামেরায় দেখেছিলেন আমি আপনার বাড়িতে ঢুকেছি?” আবারো প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাইলো।

“অবশ্যই।”

"তারপরও আমাকে ধরলেন না কেন? মানে, ধরার কোনো চেষ্টাই করেন নি...কেন?"

"আপনার জায়গায় সত্যিকারের কোনো চোর ঢুকলেও আমি ধরার চেষ্টা করতাম না... ওসব করে লাভ কি? আমি তো এখানে এমন কিছু করি না যে, খুব তটস্থ থাকতে হবে। কিংবা এমন কিছু রাখি না চুরির ভয়ে রাতে ঘুম হবে না।" একটু থেমে আবার বললো, "এর আগেও এরকমভাবে অনেকে এই বাড়িতে ঢুকেছে...তাদের কেউ কেউ চোর ছিলো... সবাই না। অনেকে আগ্রহ আর কৌতূহল থেকেও ঢু মেরেছে। একজন মহিলা শহর থেকে এসে এখানে থাকে...আগ্রহ হওয়াটাই স্বাভাবিক।"

"তাহলে ওদেরকে আপনি এমনি এমনি ছেড়ে দিয়েছেন? কিছুই করেন। নি?"

কপালের উপর থেকে একগাছি চুল সরিয়ে দিলো মুশকান। "একেবারে এমনি এমনি ছেড়ে দেই নি। একটু ভয় পাইয়ে দিয়েছি, যাতে এই বাড়ির ত্রি সীমানার মধ্যে কেউ না আসতে পারে।"

ছফা ভুরু কুচকে তাকালো। আতরের বলা জ্বলজ্বলে চোখের ব্যাখ্যা কি তাহলে এই? "কিভাবে ভয় দেখাতেন?" আগ্রহী হয়ে জানতে চাইলো সে।

"খুব সহজেই..." বলেই মুচকি হাসলো। প্রথমে যখন এখানে আসি। তখন থেকেই টের পেলাম আশেপাশের মানুষজন আমার ব্যাপারে খুব আগ্রহী। রাত-বিরাতে দেয়াল টপকে বাড়ির ভেতরেও ঢু মারে কেউ কেউ। তো, হুট করে মনে হলো একটা কাজ করা যেতে পারে আমার এক বান্ধবী আছে...ও নাটক-সিনেমায় অভিনয় করে। ওকে একবার ডাইনির চরিত্রে অভিনয় করতে দেখেছিলাম...এটা দেখে মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। ওর মাধ্যমে একজোড়া কসমেটিক কন্ট্যাক্ট লেন্স জোগাড় করলাম। ওই লেন্সটা রাতের বেলায় জ্বলজ্বল করে। রেডিয়াম আর কি।"

ছফা কিছু বলতে গিয়েও বললো না। কুসংস্কারমুক্ত মানুষ হিসেবে সে এই ব্যাখ্যাটা স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিলো। এছাড়া আর কীই-বা হতে পারে?

"বলতে পারেন, ওই লেন্স দুটো দারুণ কাজে দিয়েছে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। বুঝতে পারছে, সার্ভিল্যান্স ক্যামেরায় আতরকে দেয়াল টপকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে মুশকান জুবেরি রেডিয়াম কন্ট্যাক্ট লেন্স পরে বসেছিলো বেলকনিতে। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, ঐ ইনফর্মারকে ঘাবড়ে দেয়া। তখন মহিলা ইচ্ছে করেই রেডওয়াইন পান করছিলো আতরের কাছে ওটা যেনো রক্ত বলে মনে হয়।

"কিন্তু এরফলে গ্রামের লোকজন যে আপনাকে ডাইনি বলে সন্দেহ করতে শুরু করেছে তা কি আপনি জানেন?"

মুচকি হাসলো মিসেস জুবেরি। "সমস্যা কি? ওরা যা খুশি ভাবুক আমার উদ্দেশ্য তো খুব সহজ, কেউ যেনো আমার ত্রি-সীমানায় না আসে। সেটা ভয় থেকে হোক কিংবা অন্য কিছু, তাতে আমার কিছু যায় আসে না।"

"বুঝেছি," বললো ছফা। "একজন ডাইনি, যার সাথে এমপি, ডিসি, এসপি'র দারুণ খাতির...তাকে কেউ ঘাঁটাতে যাবে না। দূর থেকে শুধু ডাইনি বলে দুটো মন্দ কথা বলবে।"

"ঠিক," মাথা নেড়ে সায় দিলো মুশকান জুবেরি।

"কিনতু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, আপনার বাড়িতে এক মেয়ে। আছে, সে আমাকে সামনাসামনি দেখেও কিছু বলে নি। মানে, একটু ভয় পাওয়া...চিৎকার দেয়া..এসব কিছুই করে নি।"

প্রচ্ছন্ন হাসি দেখা গেলো মুশকানের ঠোঁটে। ছফার প্রশ্নগুলো যেনো খুব উপভোগ করছে। "আসলে ওই মেয়েটা আপনাকে দেখতেই পায় নি...দেখতে পেলে অবশ্যই

চিৎকার দিতো।”

“কি বলেন…মেয়েটা আমাকে অবশ্যই দেখেছে!” জোর দিয়ে বললো।

“ওই মেয়েটা আমার সাথেই থাকে। আপনাদের ভাষায় কাজের মেয়ে…আমি অবশ্য বলি, হোম-অ্যাসিসটেন্ট।” একটু থেমে কানের পাশে চুলগুলো সরিয়ে দিলো এবার। “সাফিনা ছোটোবেলা থেকেই রাতকানা রোগে ভুগছে। খুব গরীব ঘরের মেয়ে..অপুষ্টি থেকে এটা হয়ে গেছে। দিনের বেলায় সব দেখতে পেলেও রাতে তেমন দেখে না বললেই চলে।”

ছফা হা-করে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত।

দারোয়ান বোবা, কাজের মেয়ে রাতকানা, জ্বলজ্বলে চোখের আসল কারণ রেডিয়াম কন্ট্যাক্ট লেন্স, মাটিচাপা দেয়া হয়েছে ঘরে বানানো রেডওয়াইন, সার্ভিল্যান্স ক্যামেরার সাহায্যে অনেক কিছুই দেখতে পায় মহিলা, শখের কুমীর চাষ শুরু করেছে ইদানিং।

মাথার মধ্যে এসব কিছু ভনভন করে ঘুরতে লাগলো। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে তার সমস্ত সন্দেহ, প্রশ্ন বিশাল এক গহবরে মুখ থুবরে পড়তে যাচ্ছে। সে কি তাহলে ভুল মানুষের পেছনে ছুটছে?

“আর কিছু জানতে চান না?”

মুশকানের কথায় সম্বিত ফিরে পেলো সে। “আপনি কি জানেন, আজ দুপুরে একটা ঘটনা ঘটেছে সুন্দরপুরের বড় কবরস্তানে?” প্রসঙ্গটা মনে পড়তেই জিজ্ঞেস করলো সে। “ঐ যে ফালু..সে একজনকে মেরে জীবন্ত কবর দেবার চেষ্টা করেছিলো, ভাগ্য ভালো, লোকটা প্রাণে বেচে গেছে।”

কপালে ভাঁজ পড়লো মুশকান জুবেরির। “তাই নাকি?”

“হুম। ঘটনার পর থেকে ফালুকে পাওয়া যাচ্ছে না। কবরস্তানে তার ঘর তল্লাশী করেছে পুলিশ.. কিছুই পায় নি।”

“ওর ঘর থেকে কী পাবার আশা করেছিলেন, আপনি? মানে পুলিশ?” স্থিরচোখে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলো ছফা। “লাশ।”

মুশকানের কপালের ভাঁজ আরো প্রকট হলো। চোখে তার বিস্ময় মাখানো প্রশ্ন। মাথাটা ডানপাশে একটু কাত হয়ে গেলো।

“আমাদের কাছে ইনফর্মেশন ছিলো, ওর ঘরের খাটের নীচে কঙ্কাল আছে।”

“কঙ্কাল দিয়ে ও কি করে?”

“জানি না কি করে, তদন্ত হলে সব বেরিয়ে আসবে।”

নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো মুশকান জুবেরি, তবে সেটা ক্ষণিকের জন্যে। “আপনি কি ওর ঘটনার সাথে আমাকেও সন্দেহ করছেন?”

কাঁধ তুললো সে। “আমি আপাতত আপনার ব্যাপারেই মনোযোগ দিচ্ছি..ফালুর ঘটনাটা পরে দেখা যাবে। ওটা স্থানীয় পুলিশ-”।

“আমার কি ব্যাপার?” কথার মাঝখানে বলে উঠলো মুশকান। “একটু পরিস্কার করে বলবেন কি?”

গভীর করে নিঃশ্বাস নিলে নুরে ছফা। “বলছি।” কথাগুলো গুছিয়ে নেবার জন্য একটু সময় নিলো সে। মিসেস জুবেরি এখনও তার দিকে স্থিরচোখে চেয়ে আছে। “আমি আসলে একজন মানুষের নিখোঁজ হবার কেস তদন্ত করছি আর সেটা করতে গিয়েই আপনার সন্ধান পেয়েছি।”

মুশকান অভিব্যক্তিহীন চোখে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। "আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না?"

"হাসিব আহমেদ নামের এক ভদ্রলোক তিনমাস আগে নিখোঁজ হয় ঢাকা থেকে। তার কোনো হদিশ পাওয়া যায় নি এখন পর্যন্ত। ঐ কেসটা পুলিশ, সিআইডি ঘুরে ডিবির কাছে আসে..বর্তমানে ওটার তদন্ত করছি আমি।"

গভীর করে নিঃশ্বাস নিলো মিসেস জুবেরি, কিছু বলতে গিয়েও যেনো বললো না।

"হাসিবের মামা খুবই প্রভাবশালী একজন ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত আগ্রহে কেসটা আমাকে দেয়া হয়েছে। প্রথমে আমি তদন্ত করে কিছুই পাই নি। কেসটা একেবারে কানাগলির মতোই একটা জায়গায় গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। সেখান থেকে এক পা-ও এগোতে পারি নি। অবশেষে একটা সূত্র পেয়ে যাই। হাসিব যে ট্যাক্সিখ্যাবে করে এখানে এসছে সেটা ট্রেস করতে পারি। ট্যাক্সিক্যাব ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি, হাসিব ঢাকা থেকে এখানে, আপনার ঐ রবীন্দ্রনাথে এসেছিলো। তারপর থেকে সে নিখোঁজ।"

"এর মানে কি?" মুশকান জুবেরিকে বিস্মিত দেখালো। "রবীন্দ্রনাথে প্রতিদিন শত শত লোক আসে..খাওয়া-দাওয়া করে আবার চলে যায়...তারা কোথায় যায়...কি করে... সেখান থেকে নিখোঁজ হয় নাকি গুম হয় তা আমি কিভাবে জানবো? এর সাথে আমার কি সম্পর্ক?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ছফা। "ঐ ড্রাইভার বলেছে, কাকতালীয়ভাবে সে হাসিবের ঘটনার দু-মাস আগে আরেকজনকে নিয়ে এখানে এসেছিলো।"

"বাহ্" বাঁকাহাসি দিলো মিসেস জুবেরি। "দু-জন লোক দু-তিনমাসের ব্যবধানে এখানে চলে এলো...তারপর তাদের আর খোঁজ পাওয়া গেলো না...এ থেকে আপনি কি করে

আমাকে জড়ালেন? এখানে আমার কি ভূমিকা?”

ছফা বাঁকাহাসি দিলো, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি হেনে চেয়ে থেকে বললো, “মিসেস জুবেরি, আমি কিন্তু বলি নি দ্বিতীয়জন নিখোঁজ হয়েছে। বলেছি, ঐ লোকটাও এখানে এসেছিলো।”

এই প্রথম মুশকান একটু ভড়কে গেলো, তবে সেটা খুবই সামান্য সময়ের জন্য, তারপর গভীর করে দম নিয়ে বললো, “আমি ভেবেছি আপনি দু-জন নিখোঁজ হবার কথা বলছেন।”

“যাহোক, শুধু দু-জন হলেও ব্যাপারটা কাকতালীয় বলে ধরে নিতাম,” আস্তে করে বললো ছফা। “কিন্তু আমি খোঁজ নিয়ে এরকম আরো তিনটি ঘটনা পেয়েছি…ওরা সবাই একদিন হুট করে নিখোঁজ হয়ে গেছে।”

অবিশ্বাসে তাকালো মুশকান জুবেরি। “ওরা সবাই এখানে এসে নিখোঁজ হয়েছে আর সেই কাজটার সাথে আমি জড়িত…এর কি প্রমাণ আছে আপনার কাছে?”

পাঁচজনের মধ্যে দু-জন ভিক্টিম যে এখানে এসেছিলো সেটা ঐ ট্যাক্সিক্যাব ড্রাইভারই সাক্ষী।”

“আর বাকিদের ব্যাপারটা?”

“ওটা আমার অনুমান।”

“শুধুই অনুমান? কোনো প্রমাণ নেই?”

ছফা হাসলো। আশা করছি সেটা খুব জলদিই পেয়ে যাবো। ঢাকায় আমার এক সিনিয়র কলিগ ওটা দেখছেন।” একটু থেমে আবার বললো সে, “অরিয়েন্ট হাসপাতালের সিনিয়র ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদকে নিশ্চয় আপনি চেনেন?” মুশকানের জবাবের অপেক্ষা না করেই আবার বললো, “উনাকে আমার ঐ কলিগ জিজ্ঞাসাবাদ করছেন।”

মুশকান জুবেরি স্থিরচোখে চেয়ে রইলো, সেই চোখে কি খেলা করছে। তা অবশ্য বোঝা গেলো না। শুধু চোখের মণিগুলো মৃদু নড়ছে।

"আমার ঐ কলিগ কিন্তু খুব বিখ্যাত..জীবনে কোনো কেসে ব্যর্থ হন। নি..."।

"আর আপনি? আপনি কি কখনও ব্যর্থ হয়েছেন?"

মাথা দোলালো ছফা। "এখন পর্যন্ত হই নি। মনে হচ্ছে না খুব শীঘ্রই হবো।"

মুচকি হাসলো মিসেস জুবেরি। "মনে হচ্ছে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস আপনাকে উন্নাসিক বানিয়ে ফেলেছে। কিংবা ব্যর্থ হবার ভয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছেন!"

কথাটা আমলে না নিয়ে বললো নুরে ছফা, "অবশ্য আমার কলিগ আমার চেয়ে এককাঠি উপরে, আপনি হয়তো উনার নাম পত্রিকায়। দেখেছেন...ডিবির সাবেক ইনভেস্টিগেটর কেএস খান।"

মূর্তির মতো স্থির হয়ে রইলো মুশকান। নির্বিকার মুখেই বললো, "আমি পত্রিকা পড়ি না। ওগুলো পড়ার জিনিস বলে মনে করি না। অরুচিকর আর মুল জিনিস আমার ধাতে সয় না।" বাঁকাহাসি হেসে প্রসঙ্গে ফিরে এলো ছফা, "আমি নিশ্চিত, ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদ যতো শক্তিশালী নার্ভের অধিকারীই হয়ে থাকুন না কেন, মি. খানের সামনে টিকতে পারবেন না।"

মাথার চুলে হাত বুলিয়ে ঘরের চারপাশে তাকালো মুশকান। "আমি ঐসব লোকজনকে নিয়ে কি করেছি বলে মনে করেন? মানে, আপনি বলছেন, পাঁচজন লোককে এখানে এনে উধাও করে দিয়েছি..তাদেরকে আমি কেন উধাও করবো? আপনার কি ধারণা, আমি তাদেরকে জবাই করে রবীন্দ্রনাথের রেসিপি বানিয়ে ভোজনরসিকদের প্লেটে তুলে দিয়েছি?" বাঁকাহাসি দিলো সাবেক ডাক্তার।

“না,” ছফাও পাল্টা হাসি দিয়ে বললো, “আমি অতোটা ফ্যান্টাসি করি নি এখনও।”

“ও,” কৃত্রিম অবাক হবার ভান করলে ডাক্তার মুশকান। “তাহলে কি ধারণা করেছেন, শুনি?”

“আপনি অনেক কথা বললেও একটা কথা এড়িয়ে গেছেন...” মুশকান জুবেরি অপেক্ষা করলো কথাটা শোনার জন্য।

“...অরিয়েন্ট হাসপাতালের ভালো চাকরিটা কেন ছেড়েছেন?”

“আপনার কি মনে হয়?”

“আমি জানতে পেরেছি, আপনি যখন চাকরিটা ছাড়েন তার আগে অরিয়েন্ট হাসপাতালে একটা কেলেংকারি ঘটে গেছিলো। পত্রপত্রিকায়ও সেটা এসেছিলো। খুবই বাজে ঘটনা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অনেক চেষ্টা করেও ধামাচাপা দিতে পারে নি।”

নীচের ঠোঁট দুটো কামড়ে চেয়ে রইলো মুশকান।

“গরীব মানুষকে অল্প টাকা দিয়ে ফুসলিয়ে লিভার-কিডনি বিক্রি করাতেন আপনারা... মানে অরিয়েন্ট হাসপাতালের কিছু ডাক্তার আর কর্মচারি। সেইসব লিভার-কিডনি ধনী ক্লায়েন্টদের বাঁচাতে ট্রান্সপ্লান্ট করতে আপনার হাসপাতাল। এক সাংবাদিক এটার পেছনে লাগলে সবটা ফাঁস হয়ে যায়। কর্তৃপক্ষ দারুণ বিপাকে পড়ে।”

“তদন্ত করে এটাই পেলেন?” আবারো বাঁকাহাসি দেখা গেলো মুশকানের ঠোঁটে। “এটা পত্রপত্রিকায় তো ডিটেইল এসেছিলো।”

“কিন্তু যেটা ডিটেইল আসে নি সেটা হলো কে কে এর সাথে জড়িত ছিলো।”

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো সাবেক ডাক্তার। “আজ এতোদিন পর আপনি কি সেটা উদঘাটন করতে পেরেছেন?”

“ঘুম,” মাথা নেড়ে জোর দিয়ে বললো ছফা।

“আমি কিন্তু খুব আগ্রহ বোধ করছি এটা শোনার জন্য

“অরিয়েন্ট হাসপাতালের চার-পাঁচজন সার্জনকে সন্দেহ করা। হচ্ছিলো।”

“এটাও পত্রিকার খবর। ওরা আমাদের প্রায় সব সার্জনকেই সন্দেহ করে খবর ছাপিয়েছিলো। আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার মতো ব্যাপার আর কি।”

“ওখানে কিন্তু আপনার নামও ছিলো?”

“অবশ্যই ছিলো। সেইসাথে আরো চারজনের নাম। কিনতু কেউ প্রমাণ করতে পারে নি আমরা এ-কাজে জড়িত ছিলাম। এ দেশের প্রায় সব প্রাইভেট হাসপাতাল এভাবেই অর্গ্যান কালেক্ট করে দালালদের মাধ্যমে। এর সঙ্গে ডাক্তাররা জড়িত থাকে না। একটু থেমে আবার বললো, “মনে রাখবেন, একটা অভিযোগ উঠেছিলো, আর সেটা কেউ প্রমাণ করতে পারে নি।”

“করার চেষ্টাই করে নি,” চট করে বলে উঠলো ছফা, “ঘটনাটা ওখানেই ধামাচাপা দেয়া হয়।”

দীর্ঘশ্বাস ফেললো মুশকান জুবেরি। “এটা আপনার নিজস্ব মতামত...এ ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই।”

কথাটা গায়ে না মেখেই বললো ছফা, “ওই ঘটনার পরই আপনি হুট করে একদিন চাকরি ছেড়ে দেন। সম্ভবত, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আপনাকে সেফ-এক্সিট করে দেবার জন্য চাকরি

ছাড়ার প্রস্তাব দিয়েছিলো, কারণ ওখানকার সবচাইতে প্রভাবশালী ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদের সাথে আপনার বেশ ভালো সম্পর্ক।”

“এটা কোনো গোপন ব্যাপার নয়। আমরা অসম্ভব ভালো বন্ধু।”

ছফা গালে হাত বুলাতে লাগলো।

“তবে আমার চাকরি ছাড়ার সাথে উনার কিংবা ঐ ঘটনার কোনো সম্পর্কই নেই। ওটা ছিলো একেবারেই আমার নিজস্ব সিদ্ধান্ত। তাছাড়া আপনি হয়তো জানেন না, অর্গ্যান ডোনেটের কেলেঙ্কারির কয়েক মাস পর আমি চাকরি ছাড়ি। ততোদিনে ঐ ঘটনার কথা সবাই ভুলে গেছিলো।”

“আচ্ছা, তাহলে আমি কি জানতে পারি, চাকরিটা কেন ছেড়েছিলেন?”

“আমি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলাম। ডাক্তারি করতে আর ভালো লাগছিলো না। নিত্য-নতুন রান্না করা, রেসিপি বানানো, ভিন্ন ভিন্ন কুইজিন নিয়ে এক্সপেরিয়েমেন্ট করা...এসব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। অবশ্য এরজন্য রাশেদ অনেকাংশে দায়ি। তাকে প্রতিদিন মজার মজার সব রেসিপি খাইয়ে মুগ্ধ করে দিতাম। আমার হাতের রান্না খেয়ে একজন মানুষ এমনভাবে তৃপ্ত হচ্ছে দেখে খুব ভালো লাগতো। প্রচণ্ড উৎসাহি হয়ে পড়েছিলাম। টাকা পয়সার তেমন অভাব ছিলো না, সুতরাং চাকরিটা বোঝা মনে হতে লাগলো, তাই ছেড়ে দিলাম।”

ছফা নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলো মুশকানের দিকে।

“আপনি আমাকে ঠিক কি নিয়ে সন্দেহ করছেন, স্পষ্ট করে বলবেন। কি?”

মিসেস জুবেরির প্রশ্নে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলো সে।

“কিছু মানুষের নিখোঁজ হয়ে যাওয়া..হাসপাতালের অর্গান কেলেংকারি…আমার চাকরি ছেড়ে দেয়া…এসব একসূত্রে গেঁথে আপনি আসলে কি প্রমাণ করতে চাইছেন?”

ছফা গভীর করে দম নিয়ে নিলো। “আমি নিশ্চিত, আপনি ঐ নিখোঁজ মানুষগুলোর মূল্যবান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাচারের সাথে জড়িত

মাথা দুলিয়ে হাসতে লাগলো মুশকান, যেনো হাস্যকর কোনো জোক শুনেছে সে। “আমি অর্গ্যান পাচার করি?”

“হ্যাঁ,” বেশ জোর দিয়ে বললো ছফা।

“তারপর ওই মানুষগুলোকে মেরে গুম করে ফেলি, তাই না?”

ছফা কোনো জবাব দিলো না।

“এ কাজে নিশ্চয় ঐ কবর খোরার ছেলেটা..ফালুও জড়িত…কী বলেন?”

ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো নুরে ছফা। তার সামনে যে মহিলা বসে আছে। তার কথা আর ভাবভঙ্গি দেখে কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। সবটা কেমনজনি প্রহেলিকাময় বলে মনে হচ্ছে।

“আমার চাকরি ছাড়ার সত্যি কারণটা জানতে চান?”

ছফা নিশ্চুপ রইলো।

“লিভার-কিডনির কেলেংকারির আগেই ডাক্তারি পেশার প্রতি মন উঠে গেছিলো। একটা কারণ তো আগেই বলেছি, আরেকটা কারণ হলো, এদেশের মানুষ ডাক্তারদের সম্মান করে না। কোনো রোগি মারা গেলেই তারা ডাক্তারকে দোষি মনে করে। তাদের ধারণা ডাক্তারের অবহেলাই রোগির মৃত্যুর একমাত্র কারণ। ডাক্তার যেনো মর্তের ঈশ্বর…সে

চাইলেই যেকোনো রোগিকে বাঁচাতে পারে।” একটু থামলো মুশকান। “শুধু অভিযোগ, গালাগালি আর অসম্মান করলেও হয়তো সহ্য করে এই পেশায় থাকতাম কিন্তু তা তো হয় না। ডাক্তারকে রীতিমতো মারতে আসে। চোখের সামনে অনেক ডাক্তারকে মৃতরোগির বিক্ষুব্ধ আত্মীয়দের হাতে লাঞ্ছিত হতে দেখেছি। এই ভয়ে সারাক্ষণ কুঁকড়ে থাকতাম। বিশেষ করে আমি সার্জন হওয়ায় প্রচুর। অপারেশন করতে হতো...রোগির মৃত্যু হতো অনেক ক্ষেত্রে...প্রতিটি অপারেশনের সময় তাই নার্ভাস হয়ে পড়তাম। অবশেষে এই নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতেই চাকরিটা ছেড়ে দেই

সব শুনে ছফা মুচকি হাসলো। মুশকানের এই ব্যাখ্যাটা আমলে না। নিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলো সে। “আপনাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছিলাম... যে পাঁচজন ভিক্টিম, আই মিন মিসিং-পারসনের কথা বলছি তারা সবাই অন্য অনেকের মতো ফেসবুক ব্যবহার করতো। মজার ব্যাপার কি জানেন? তারা নিখোঁজ হবার পর পরই অ্যাকাউন্টগুলো ডি-অ্যাক্টিভ হয়ে। গেছে সবার!”

মুশকান জুবেরি চেষ্টা করলো নির্বিকার থাকার কিন্তু ছফার দৃষ্টিতে সেটা এড়ালো না।

“এটা অবশ্যই খুনির কাজ। সে খুব সতর্ক। শিকারকে বাগে পেয়ে তাকে হত্যা করার আগেই যেভাবে হোক তার কাছ থেকে পাসওয়ার্ডটা নিয়ে নিয়েছে, কিন্তু একজনের বেলায় সে এটা করতে পারে নি।”

মুশকান তারপরও চুপ রইলো।

“ঐ একজন হলো শেষেরজন। যার কেসটা আমি তদন্ত করছি। এরইমধ্যে পুলিশের একটা নতুন ডিপার্টমেন্ট হয়েছে...টেলিকমিউনিকেশন্স মনিটরিং সেল...ওরা খুবই আধুনিক টেকনোলজি ব্যবহার করে। আমি ওদের সাহায্য নিয়েছিলাম...অবশেষে ওরা হাসিবের অ্যাকাউন্টটার পাসওয়ার্ড ক্র্যাক করতে পেরেছে। অ্যাকাউন্টটা চেক করে দেখা

গেছে ওখানে চারুলতা নামের একটি আইডির সাথে হাসিবের নিয়মিত যোগাযোগ ছিলো।”

মুশকান বাঁকাহাসি দেবার চেষ্টা করলেও সেটা কেমন মলিন দেখালো।

“চারুলতা আইডিটির লোকেশন ট্র্যাকডাউন করা হয়েছে..ওটা এখানকার...এই সুন্দরপুরের।”

“সুন্দরপুর হয়তো একটি মফশ্বল শহর কিন্তু বর্তমানে এখানে অনেকেই ইন্টারনেট ব্যবহার করে।”

“তা করে। তবে তাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভক্ত ক-জন আছে যে তার রেসটুরেন্ট নাম রাখবে উনার নামে? ফেসবুক অ্যাকাউন্টের নাম দেবে উনার সষ্ট চরিত্রের নামে?” মাথা দুলিয়ে আরার বললো সে, “সম্ভবত খুব কম। আরতাদের মধ্যে নারী আছে ক-জন?”

ছফার দিকে তাকিয়ে হাসলো মিসেস জুবেরি। “তাহলে এখন আমাকে গ্রেফতার করছেন না কেন? আপনি খুবই নিশ্চিত। শক্ত প্রমাণও আছে আপনার কাছে।”

“হুম। তবে একটু অপেক্ষা করতে হচ্ছে। আশা করছি খুব শীঘ্রই আমার সিনিয়র কলিগ মি, খান আপনার ঐ বন্ধু ডাক্তার আসকারের কাছ থেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বের করে আনতে পারবে।”

মুশকান চুপ থেকে নিজের ঘরের চারপাশটা দেখে নিলো একবার। “আপনি কি আমার সম্পর্কে সত্যিটা জানতে চান?”

ছফা বাঁকাহাসি দিলো। “আমি তো জানতাম সেটা জানার জন্যই এখানে এসেছি।”

মাথা নেড়ে সায় দিলো মুশকান। “আপনি যখন আমার সব সত্যি জানতে পারবেন তখন বুঝতে পারবেন কতোটা ভুল ধারণা করেছিলেন আমার সম্পর্কে। আপনার

সবগুলো অনুমানই মিথ্যে প্রমাণিত হয়ে যাবে। আপনার তখন মনে হবে আমার পেছনে লেগে খামোখাই সময় নষ্ট করেছেন। তদন্তকারী হিসেবে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটি করে ফেলেছেন?”

ভুরু তুললো ছফা। “বেশ। আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি সবটা শোনার জন্য।”

“আপনি অনেক কিছু জানলেও আমার জীবনে সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডিটার কথা জানেন না। ওরকম কঠিন পরিস্থিতিতে খুব কম মানুষই পড়েছে। আর তারচেয়েও অনেক কম মানুষ টিকে থেকে বেঁচে আসতে পেরেছে সভ্য দুনিয়ায়। আমিও অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছিলাম কিন্তু ঘটনাটি আমাকে সারাজীবনের জন্য বদলে দিয়েছে।”

. “ঘটনাটা কি?” কৌতূহলী হয়ে উঠলো ছফা। সে এসব কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না।

উঠে দাঁড়ালো মিসেস জুবেরি। “আমি দশ বছর বয়সে আমেরিকায় চলে যাই বাবা-মায়ের সাথে...” সারি সারি বইয়ের শেলফের কাছে গিয়ে থামলো সে। “হাইস্কুল শেষে ওখানকার এক মেডিকেল কলেজে ভর্তি হই...” একটা বড় আকৃতির চারকোণা অ্যালবাম বের করে আনলো বুকশেলফ থেকে। “...ফাইনাল ইয়ারের সামার ভ্যাকেশনে আমরা বন্ধুরা মিলে বেড়াতে যাবার প্ল্যান করি।” অ্যালবামটা নিয়ে এসে আগের জায়গায়। বসলো। “আমাদের গন্তব্য ছিলো লাতিন-আমেরিকা। মাচুপিচু..ইনকা সভ্যতা...মেক্সিকান পিরামিড...এসব দেখবো...” অ্যালবামটা ছফার দিকে বাড়িয়ে দিলো এবার। “..এটা দেখুন। ওই ভয়ঙ্কর কাহিনীটা বলতে ভালো লাগে না। দুঃসহস্মৃতি রোমন্থন করা আনন্দের কোনো বিষয় নয়।”

ছফা অ্যালবামটা হাতে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলো মুশকান জুবেরির দিকে।

“আপনি এটা দেখলেই সব বুঝতে পারবেন।”

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে অ্যালবামটা খুললো সে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে বেশ পুরনো। প্রথম পৃষ্ঠায় ইংরেজিতে বোল্ড ফন্টে লেখা : অ্যালাইভ।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা ফাঁকা, তৃতীয় পৃষ্ঠায় চার-পাঁচটা পারিবারিক ছবি। একটি সুখি পরিবার। মা-বাবা, ভাই-বোন।

"আমার ফ্যামিলির ছবি..." আস্তে করে বললো মুশকান।

ছফা লক্ষ্য করলো ছবিতে কোনো সন-তারিখ দেয়া নেই। পোশাক আশাক দেখেও নিশ্চিত হতে পারলো না ছবিগুলো কোন দশকের। চতুর্থ পৃষ্ঠা ওল্টাতে গিয়ে দেখলো পৃষ্ঠাগুলো একটার সাথে আরেকটা লেগে আছে। বোঝা যাচ্ছে খুব একটা খুলে দেখা হয় না, একান্তই ব্যক্তিগত একটি অ্যালবাম। নিশ্চয় বাইরের খুব কম মানুষই এটা দেখেছে। হয়তো অনেকদিন কেউ ধরেও দেখে নি। চতুর্থ পৃষ্ঠায় যেতে ছফাকে রীতিমতো আঙুলে থুতু মেখে ওল্টাতে হলো। এই পৃষ্ঠায় আছে আরো ছয়-সাতটি ছবি। সবগুলোই স্কুলের। কিশোরি মুশকান আর তার সাদা-কালো-বাদামি বন্ধুরা। তাদের অঙ্গভঙ্গি খুব মজার। কেউ ভেংচি কাটছে তো কেউ চোখ ট্যারা করে আছে। কেউ বা মুখ ঢেকে রেখেছে।

"আমি স্কুল ভীষণ পছন্দ করতাম...বলতে গেলে স্কুলে যাবার জন্য মুখিয়ে থাকতাম প্রতিদিন।"

চকিতে মুশকান জুবেরির দিকে তাকালো ছফা। পঞ্চম পৃষ্ঠায় চোখ বুলালো সে। সম্ভবত কলেজের ছবি।

"স্কুলের মতোই কলেজও খুব ভালোবাসতাম। কলেজেই আমার সব বেস্ট ফ্রেন্ডদের সাথে পরিচয় হয়।"

ছষ্ঠ পৃষ্ঠায় যেতে আবরো বেগ পেলো, পরের পাতার সাথে লেগে আছে। ষষ্ঠ আর সপ্তম পৃষ্ঠায় মেডিকেল কলেজের প্রচুর ছবিতে ভরতি। কোনোটাতে মুশকানের গায়ে অ্যাপ্রোন,

কোনোটাতে সাধারণ টি-শার্ট আর জিন্স প্যান্ট। ছফা মনে মনে মুশকান জুবেরির সৌন্দর্যের প্রশংসা না করে পারলো না।

যৌবনে এই মহিলা চোখ ধাঁধানো সুন্দরি ছিলো।

না, এখনও আছে।

নিজেকে শুধরে দিলো সে। চোখ তুলে তাকালো মহিলার দিকে। বয়স বাড়লেও খুব একটা পরিবর্তন হয় নি। শরীরের গড়ন প্রায় আগের মতোই আছে।

“মেডিকেল কলেজের মতো ভালো সময় আমার জীবনে খুব কমই এসেছে। পড়াশোনার চাপ থাকলেও আমি খুব এনজয় করেছি সময়টা।”

অষ্টম পৃষ্ঠাটিও পরের পৃষ্ঠার সাথে লেগে আছে। ছফা বিরক্ত হয়ে পাতাটি ওল্টালো। পাতাগুলো একটার সাথে একটা শুধু লেগেই নেই, কেমন। পুরনো গন্ধ আর চটচটে হয়ে আছে। ছফা দেখতে পেলো কতোগুলো ছবি। প্রায় সবগুলোতেই একদল তরুণ-তরুণী এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পেছনে সারি সারি দাঁড় করানো প্লেন। ক্যামেরার দিকে থাম্ব-আপ দেখাচ্ছে। সবাই। একজন ছেলের হাতে প্ল্যাকার্ড বন ভয়েজ! একটা ছবিতে তরুণী মুশকান ভেংচি কাটছে ক্যামেরাম্যানকে। তার পেছনে বন্ধুবান্ধবের দল। সেখানে চিনা-জাপানি, লাতিন-কৃষ্ণাঙ্গ আর শ্বেতাঙ্গদের সন্নিবেশ। মুচকি হাসলো সে। তারুণ্য এমনই। সব কিছুতে ফুর্তি। মজা।

“টুরে যাবার আগের ছবি…” আস্তে করে বললো মুশকান।

পরের পাতা উল্টিয়ে ছফা স্থিরচোখে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। এখানে কোনো ছবি নেই। আস্ত একটি পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার প্রায় অর্ধেকটা পেপারক্লিপিংস রাখা হয়েছে। ডানদিকের পৃষ্ঠায় আরেকটি পত্রিকা আরেকটি পেপার-ক্লিপিংস। আমেরিকার বিখ্যাত

দুটো পত্রিকা-ওয়াশিংটন পোস্ট আর বাল্টিমোর ট্রিবিউন। দুটো পত্রিকাই একটি নিউজ ব্যানার হেডলাইন করেছে: মর্মান্তিক এক প্লেন ক্র্যাশ।

ছফা মুখ তুলে তাকালো মুশকানের দিকে।

“মাচুপিচু দেখে ফেরার পথে আমাদের প্লেনটা খারাপ আবহাওয়ায় পড়ে ক্র্যাশ করে...” একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার ভেতর থেকে। “...আন্দিজের অনেক উপরে...বরফে ঢাকা একটি উপত্যকায়...”।

পত্রিকার রিপোর্টের দিকে নজর দিলো ছফা। ওখানে বিস্তারিত বলা আছে। প্লেনটা আন্দিজ পর্বতমালার উপর দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ করে হারিয়ে গেছে। সবাই ধারণা করছে প্লেনটা বরফে ঢাকা পার্বত্য-অঞ্চলের কোথাও বিধ্বস্ত হয়েছে। যাত্রিদের কারোর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই। অন্য একটি ছোট্ট পেপার-ক্লিপিংসে আছে, তিনদিন ধরে রেসকিউ টিম চেষ্টা করেও প্লেনের কোনো ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পায় নি। কর্তৃপক্ষ আশংকা করছে। প্লেনের কোনো যাত্রি বেঁচে নেই!

ছফা আবারো মুখ তুলে তাকালো মুশকানের দিকে। মহিলাকে কেমনজানি অশরীরি বলে মনে হচ্ছে এখন। তারপর একটা ভাবনা মাথায় আসতেই সারা শরীর কাঁটা দিয়ে উঠলো। সবাই যদি মরে গিয়ে থাকে তাহলে সামনে যে বসে আছে সে কে?!

.

অধ্যায় ৩৫

কেএস খান বুঝতে পারছে তাকে কেন এই কাজটা করতে বলেছে নুরে ছফা। যদিও এটা ডিবির লোকজনের করার কথা কিন্তু ও চাইছে দ্রুত ফলাফল বের করে আনতে। আর যে লোককে ইন্টেরোগেট করা হবে তিনি অনেক শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি-দেশের একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক। বয়সে প্রবীণ এই ভদ্রলোকের সাথে ক্ষমতার উচ্চপর্যায়ের অনেকেরই সু-

সম্পর্ক রয়েছে। তাকে সাধারণ লোকজনের মতো হুমকি-ধামকি দিয়ে জেরা করা যাবে না, ভদ্রভাবে কথা আদায় করতে হবে। এদিকে ডিবিতে এমন কেউ নেই যে এ কাজটা ঠিকঠাকমতো করতে পারবে। তবে এক সময় ডিপার্টমেন্টে কর্মরত অবস্থায় কেএস খান কারোর পেট থেকে কথা আদায় করার বেলায় বেশ দক্ষ হিসেবেই পরিচিত ছিলো। সুতরাং ছফার এই চাওয়াটা একদিক থেকে ঠিকই আছে।

ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদ নিজের ফ্ল্যাটের স্টাডিরুমে বসে থাকলেও একটু অস্বস্তিতে আছেন বলে মনে হলো। তার অভিজাত ভঙ্গিটি বেশ ভালোভাবেই ধাক্কা খেয়েছে। এক ধরণের উদ্বেগও দেখা যাচ্ছে ভদ্রলোকের মধ্যে। কেএসকের কাছে এটা খটকা বলেই মনে হলো। একজন অভিজ্ঞ সার্জন কেন এতো সহজে ঘাবড়ে যাবে? তার নার্ভ তো বেশ শক্ত হবার কথা।

জাওয়াদ নামের ছফার সহকারী ছেলেটা ঘরের এককোণে চুপচাপ বসে আছে। সে অপেক্ষা করছে কেএস খানের পদ্ধতি দেখার জন্য। এই লোকের এতো সুনাম শুনেছে যে, রীতিমতো কিংবদন্তী চরিত্র বলে মনে করে তাকে। এখন কিংবদন্তীর কীর্তি দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

আজ সকাল থেকে কেএস খানের শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছিলো। বিকেলের দিকে আবার বাজে সর্দির আগমন ঘটেছে। রুমালটা দিয়ে নাক মুছে নিলো সে। "সরি," বিব্রত হয়ে বললো এক সময়কার ডিবির তুখোড় ইভেস্টিগেটর।

"ইটস ওকে," ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদ বললেন। "আপনার উচিত অ্যালার্জির ওষুধ খাওয়া, নইলে সর্দিটা বেশ ভোগাবে।"

রুমালটা পকেটে রেখে মুচকি হাসলো কেএস খান। "ওষুধ আমি সবই...কোনোটাই বাদ দেই না কিন্তু কম হয় না। আমি হইলাম ওষুধের ব্ল্যাকহোল...যেটাই খাই সব ভ্যানিশ হইয়া যায়।" তারপর হেহে করে হেসে ফেললো।

ডাক্তারের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আর সবার মতো তিনিও মি. খানকে চলভাষায় কথা বলতে দেখে অবাক হয়েছেন। "আপনার কি ক্রনিকল ডিজিজ রয়েছে?" ডাক্তারের মতো আচরণ করার চেষ্টা করলেন। মি. সায়িদ।

"আমারটা একটু ক্রিটিক্যাল," তীর্যক হাসি দিলো কেএস খান। "কোনো পার্টিকুলার রোগ আমারে ভোগায় না...বলতে পারেন, সব রোগই পালা কইরা আমারে ভোগায়। একটা যায় তো আরেকটা আইসা হাজির।" আবারো হাসলো সে তবে নিঃশব্দে।

ভুরু তুললেন ডাক্তার। "মানে?"

"মানে খুব সোজা," গাল চুলকালো সাবেক ডিবি অফিসার, "আমি প্রতিদিনই কোন না কোনো রোগে ভুগি...তয় কোনোটাই বড় কিছু না...সবই। সামান্য...এই ধরেন সর্দি, জ্বর, মাথাব্যথা, ঘাড় ব্যথা..."

"আপনার উচিত থরো চেকআপ করা।"

"আমার পারসোনাল ডাক্তার আছে...রেগুলার চেক-আপ করি।"

"উনি আপনার সমস্যাটা ধরতে পারছেন না?"

"উনি কেন...কেউই আমার সমস্যা ধরতে পারে না। সবাই কয়, আমার নাকি সব ঠিকঠাকই চলে...কিন্তু..."

"কি কি?"

"বাদ দেন আমার কথা, আপনের কথা বলেন।"

"আমি কি বলবো? আপনারা আমার কাছে কি চান তা-ই তো বুঝতে পারছি না।"

খোদাদাদ শাহবাজ খান কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে কথাগুলো গুছিয়ে নিলো। “আসল কথায় যাওনের আগে আপনেরে একটু ক্লিয়ার কইরা নেই, নাকটা এবার হাত দিয়ে চুলকে নিলো সে, “আমি কইলাম মিসেস জুবেরির কেসটা নিয়া তদন্ত করতাছি না। ঐটা করতাছে ডিবির সিনিয়র ইনভেস্টিগেটর নুরে ছফা।”

ডাক্তার একটু অবাকই হলেন কথাটা শুনে কিনতু নিজেকে সংযত রাখলেন বাড়তি আগ্রহ দেখানো থেকে।

“আমি রিটায়ার্ড মানুষ নতুন ইনভেস্টিগেটরগো ক্রিমিনোলজি পড়াই” একটু থেমে আবার বললো সাবেক ডিবি কর্মকর্তা, “নুরে ছফা আমারে বললো, আপনের ইন্টারভিউটা যে আমি নেই। বিষয়টা একটু ক্রিটিক্যাল তো, তাই।”

“ক্রিটিক্যাল কেন?” ভুরু কুচকে জানতে চাইলেন ডাক্তার।

“ছফা একটা কেস নিয়া তদন্ত করতাছে, তদন্ত করতে গিয়া মুশকান। জুবেরিরে প্রাইম সাসপেক্ট হিসাবে পাইছে সে। মহিলারে অলরেডি ইন্টেরোগেট করছে..উনার কাছ থেইকা অনেক কিছুই জানবার পারছে, মহিলা কিছু কথা স্বীকারও করছে...” একটু থেমে সামনে বসা ডাক্তারের অভিব্যক্তি বোঝার চেষ্টা করলো। “এখনও তার ইন্টেরোগেশন চলতাছে... কিছু ইনফর্মেশন ডাবল চেক করবার চাইতাছে ছফা। এই কাজটা ইনভেস্টিগেশনে খুবই ইম্পোর্টেন্ট। এইজন্য আপনের কাছে আসছি আমরা।”

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডাক্তার আসকার। “মুশকানকে কি কেসে সন্দেহ করা হচ্ছে?”

কপাল চুলকালো কেএসকে। “এইটা তো এখন ডিটেইল বলা যাইবো না। ...সংক্ষেপে মুশকানের বিরুদ্ধে অভিযোগটা বলি আপনেরে...তাইলে হয়তো সিচুয়েশনের গ্র্যাভিটিটা ধরবার পারবেন।” ডাক্তারকে দৃষ্টির তীরে বিদ্ধ করে রেখেছে সে। “পাঁচজন মানুষ হত্যার

অভিযোগ আছে ওই ভদ্রমহিলার বিরুদ্ধে। লোকগুলারে নিয়া সে কি করছে সেইটা শুনলে আপনের পিলা চমকাইয়া যাইবো।”

ডাক্তার আসকার একটু চমকে উঠলেন। “মানে?”

“সেইটা আপনেরে পরে বলবো। তার আগে আপনের বোঝা উচিত আমাদের কাছে মিথ্যা বললে কি হইতে পারে। নুরে ছফা একটু ঘাড়ত্যাড়া মানুষ...এই পাঁচজন মানুষের হত্যা মামলায় আপনেরেও জড়াইয়া ফেলবো। সে, অভিযোগ আনবো আপনে ইচ্ছা কইরা সত্য লুকাইছেন। এমনও হইতে পারে, সে দাবি কইরা বসলো, আপনেও ঐ মুশকানের সাথে জড়িত

ডাক্তার ভয় না পাবার চেষ্টা করলেন।

“মুশকানের শেষ ভিক্টিমটা আবার প্রধানমন্ত্রীর অফিসের এক ক্ষমতাবান লোকের আপন ভাগিনা। মনে হইতাছে সে তার সর্বোচ্চ ক্ষমতা অ্যাপ্লাই করবো।”

এবার ঢোক গিললেন ডাক্তার। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে তিনি ভড়কে গেছেন কথাটা শুনে।

“আদালতে আপনের অ্যাগেইনস্টে অভিযোগ প্রমাণ হইবো কি হইবো না তা তো জানি না...তয় আপনার রেপুটেশন যে নষ্ট হইবো তা বুঝবার পারছি।”

মাথা দোলালেন আসকার ইবনে সায়িদ। কথাটার সাথে দ্বিমত পোষন করে নাকি আক্ষেপে বোঝা গেলো না। আস্তে করে মাথা নীচু করে রাখলেন তিনি।

“তাছাড়া আপনের হাসপাতালের অনেকরে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও অনেক কিছু জানা যাইবো কিন্তু এইটা আমি চাই না। এইটা করলে ব্যাপারটা সবাই জাইনা যাইবো। আমি জানি আপনে সবই জানেন। তাই ভাবলাম, আপনেরে একটা চান্স দেয়া দরকার। কী বলেন?”

স্থিরচোখে চেয়ে রইলেন ডাক্তার আসকার, যেনো কী বলবেন সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না।

"এইসব ব্যাপারে যারে-তারে জিজ্ঞাসাবাদ করলে খালি আপনেই না, আপনের ঐ হাসপাতালেরও রেপুটেশন নষ্ট হইবো। যতোদূর জানি, আপনে আবার হাসপাতালের একজন পার্টনারও।" একটু থেমে ভদ্রলোককে আবারো দেখে নিলো সে। "কিন্তু আমি চাই আপনে এই জঘন্য কেসটা থেইকা নিজেরে দূরে রাখেন।"

গভীর করে নিঃশ্বাস নিলেন ডাক্তার। "মুশকান কি বলেছে?" অনেকটা অসহায়ের মতো জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

মাথা দুলিয়ে জবাব দিলো কেএস খান। "সরি। এইটা বলা যাইবো না, টেকনিক্যাল সমস্যা আছে।"

কপালের বামপাশটা হাত দিয়ে ঘষতে লাগলেন ভদ্রলোক। কেএস খান বুঝতে পারলো ডাক্তার এখন চৌরঙ্গির মোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাকে একটা পথ বেছে নিতে সাহায্য করা দরকার। আর সেই পথটা অবশ্যই সঠিক পথ।

"সহমরণে যায়েন না, ডাক্তার..." আস্তে করে বললো কেএসকে। "যে মারা যায় তার লগে কেউ সহমরণে গেলেও মৃতব্যক্তির কইলাম কোনো লাভ হয় না। সহমরণে যে যায় তারই ক্ষতি হয়।"

ডাক্তার আসকার ফ্যালফ্যাল চোখে চেয়ে রইলেন। "আপনের জন্য কাজটা কিন্তু খুব সহজ..."

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন ভদ্রলোক।

“এই বিরাট ঝামেলা থেইকা নিজেরে পুরাপুরি দূরে রাখতে চাইলে খুব সহজেই সেইটা আপনে করতে পারেন। সত্যিটা বইলা দেন। আলটিমেটলি এইটা আপনে লুকায়া রাখতে পারবেন না…ঘটনাটা অনেকেই জানে।”

মাথা নেড়ে সায় দিলেন ডাক্তার। জাওয়াদের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সেও বুঝতে পারছে ডাক্তার পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। মনে মনে কেএস খানের প্রশংসা না করে পারলো না।

“কোন সত্যটা জানতে চান?”

“মুশকান জুবেরি চাকরিটা ছাড়লো কেন?”

একটু চুপ থেকে বললেন ডাক্তার, “ও কেন চাকরিটা ছেড়েছে সেটা এক কথায় বলা যাবে না। একটু ব্যাখ্যা করতে হবে ব্যাপারটা।”

“করেন…কোনো সমস্যা নাই,” অভয় দিলো মি. খান।

“আপনারা হয়তো জানেন না মুশকান সপরিবারে আমেরিকায় থাকতো…ওখান থেকেই পড়াশোনা কমপ্লিট করেছে।”

আগ্রহভরে চেয়ে রইলো কেএস খান।

“পাঁচ-ছয় বছর আগে আমেরিকা থেকে আমাদের হাসপাতালে এক ডাক্তার এসে জয়েন করে। ঐ ডাক্তার মুশকানকে চিনতো। ওরা পড়াশোনা করেছে একই মেডিকেল কলেজে…মুশকানের কয়েক বছরের জুনিয়র সে…” ডাক্তার একটু থেমে কথা গুছিয়ে নিলেন। “ও জয়েন করার পর মুশকানের ব্যাপারে খুবই অদ্ভুত আর গা শিউরে ওঠার মতো একটি কথা ভেসে বেড়াতে লাগলো। হাসপাতালের ম্যানেজমেন্ট অবশেষে এ নিয়ে

আমার সঙ্গে কথা বললো। আমি মুশকানকে আমেরিকায় থাকতেই চিনি। ওর সব কিছু জানি।”

অবাক হলো কেএস খান। “বলেন কি?”

ডাক্তার চুপ মেরে রইলেন।

“কিন্তু কথাটা কি ছিলো?” মি. খান উদগ্রীব হয়ে উঠলো।

“ফাইনাল ইয়ারে মুশকান তার কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সাউথ আমেরিকা ঘুরে গিয়ে মারাত্মক এক প্লেন ক্রাশের শিকার হয়েছিলো। ওদের প্লেনটা ক্র্যাশ করে আন্দিজের দুর্গম এক পাহাড়ি অঞ্চলে।”

“আন্দিজে?”

“হুম। ঘটনাটা পত্রপত্রিকায় ফলাও করে প্রচার হয়েছে, ইনফ্যাক্ট ঘটনাটা নিয়ে অনেক প্রবন্ধ, বই, এমনকি সিনেমাও তৈরি হয়েছে।” একটু থেমে আবার বললেন ভদ্রলোক, “কিন্তু ও যেভাবে বেঁচেছে সেটা শুনলে যে কারোর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবে।”

“কি সেইটা?”

একটু থেমে গুছিয়ে নিলেন ডাক্তার। “শুধু ও নয়...ওই প্লেনের একশ’রও বেশি যাত্রির মধ্যে মাত্র আঠারোজন বেঁচে গিয়েছিলো। অবশেষে কয়েক মাস পর তাদেরকে উদ্ধার করা হয়। পুরো ব্যাপারটাকে আন্দিজের মিরাকল বলেই জানে সবাই। বিস্ময়কর একটি ঘটনা। ওরকম জায়গায় ওদের বেঁচে থাকার কথা নয়।”

“তাইলে ওরা অ্যাতোদিন বাঁচলো কেমনে?”

কেএস খানের প্রশ্নে গম্ভীর হয়ে গেলেন ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদ। “মানুষ খেয়ে!”

৮. মানুষের মাংস

অধ্যায় ৩৬

ওরা মানুষের মাংস খেয়ে বেঁচেছিলো!

অ্যালবামটা কোলের উপর রেখে হতভম্ব হয়ে বসে আছে নুরে ছফা। এটা জানার পর তার মাথা রীতিমতো ভো ভো করছে। সভ্য দুনিয়ার কিছু মানুষ দুর্গম অঞ্চলে আটকা পড়ে মানুষের মাংস খেয়ে বেঁচে ছিলো আশিদিনেরও বেশি সময় ধরে।

সে টের পাচ্ছে একটা অবশ করা ঘোরের মধ্যে চলে যাচ্ছে যেনো। তার বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে এটা। কল্পনা করতেই সারা শরীর গুলিয়ে উঠলো।

"কেউ জানতো না আমরা অনেকেই বেঁচে ছিলাম, তাই উদ্ধার করতেও আসে নি," বললো মুশকান। "সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকলাম রেসকিউ টিম এসে আমাদের উদ্ধার করবে, কিন্তু পাঁচদিন পরও কেউ এলো না।"

ছফা অ্যালবামের দিকে তাকালো। পেপার-ক্লিপিংসে ছড়াছড়ি। সবগুলোই আসল পত্রিকা থেকে কেটে লাগানো হয়েছে, কোনো ফটোকপি নয়। একটা ক্লিপিংসের দিকে চোখ গেলো তার। বড় বড় বোল্ড অক্ষরে লেখা গা শিউরে মুঠা হেডলাইন আর ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্লেনের ছবি।

ছফা চোখ সরিয়ে নিলো। আরেকটা ক্লিপিংসের দিকে তাকালো সে। ওটা বলছে, মোট ১০২ জন যাত্রির মধ্যে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। পয়ষট্টিজনের তো, বাকি সাইত্রিশ জনের বেশিরভাগই মারাত্মক আহত ছিলো, একদম সুস্থ, কিংবা সামান্য আহত ছিলো মাত্র বারোজন।

"সাত হাজার মিটার উঁচু পাহাড়ের কোলে আমাদের বিমানটি আছড়ে পড়ে খুবই দুর্গম এলাকায়। বরফে ঢাকা উপত্যকা...প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর ঝড়ো বাতাস...কোনো পানি নেই..খাবার নেই...গাছপালাও নেই যে পাতা খেয়ে বেঁচে থাকা যাবে...কোনো জীব-জন্তুরও দেখা পাই নি ওগুলো শিকার করে ক্ষুধা মেটাতে পারবো।"

ছফা আরেকটা পৃষ্ঠা উল্টাতে গিয়ে টের পেলো তার হাত একটু কাঁপছে। ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা শুনে হয়তো তার নার্ভ সিস্টেমও ভড়কে গেছে! কম্পিত হাতেই পৃষ্ঠাটা ওল্টালো। আরো কিছু ক্লিপিংস। আন্দিজের ম্যাপ, বিমানটি যেখানে বিধ্বস্ত হয়েছে সেই জায়গাটি বৃত্ত এঁকে চিহ্নিত করা। ভাঙাচোরা বিমানের ভেতরে বসে থাকা জীবিতদের ছবি।

"এই ছবিগুলো আমার ক্যামেরায় তোলা হয়েছিলো," জানালো মুশকান। তার মধ্যে এক ধরণের উদাস ভাব চলে এসেছে। "যদি আমাদের মধ্যে একজনও জীবিত অবস্থায় সভ্য-দুনিয়ার ফিরে যেতে পারে তাহলে ছবিগুলো সবাই দেখতে পাবে...কিংবা আমাদের সবার মৃত্যুর পরও যদি কেউ ওখানে আসে তাহলে ছবিগুলো আলোর মুখ দেখবে-এই উদ্দেশ্যেই তুলেছিলাম।"

ছফা দেখলো একটা ছবিতে বাকিদের সাথে তরুণী মুশকানও বসে আছে বিধ্বস্ত প্লেনের ভেতরে। ভারি সোয়েটারে তার শরীর আর মাথা ঢাকা থাকলেও মুখটা দেখে চিনতে অসুবিধা হলো না।

"প্লেনে থাকা কিছু খাবার আর পানি অল্প অল্প খেয়ে পাঁচ-ছয় দিন পার করলাম আমরা...এরমধ্যে আহত আরো তিনজন মারা গেলো। ওরকম জায়গায় শুধুমাত্র

ফাস্টএইড দিয়ে ওদের বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি।”

ছফা মুখ তুলে তাকালো। মুশকাল জুবেরকে ঝাপসা দেখলো সে। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেছে। মুখ দিয়ে কোনো কথা বের করতে পারলো না।

“একসপ্তাহ পর আমরা যারা বেঁচে ছিলাম তারা টের পেলাম খিদে কতোটা ভয়ঙ্কর হতে পারে। না-খেয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম ধীরে ধীরে।”

ছফা আরেকটি ক্লিপিংসের দিকে চোখ বুলালো। একই খবর। একই ছবি। তবে ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকার।

“খিদের কাছে সব পরাজিত হয়। সবার আগে পরাজিত হয় স্বাদ-রুচি। তারপর যুক্তি-বুদ্ধি, সভ্যতা, মানবিকতা।”

মুখ তুলে তাকালো নুরে ছফা।

‘আমাদের মধ্যে নরম্যান নামের এক যুবক ছিলো। প্রথমে ও-ই প্রস্তাব করলো মৃতযাত্রিদের মাংস খেয়ে বেঁচে থাকতে পারি আমরা। প্রচণ্ড শীত আর বরফের মধ্যে থাকার কারণে লাশগুলো পচে যায় নি।”

ছফা টের পেলো তার পেটটা গুলিয়ে উঠছে। মৃত মানুষের মাংস! দৃশ্যটা ভাবতেও কষ্ট হলো।

“প্রথমে কেউ রাজি হয় নি..কিনতু আরো তিনদিন অভুক্ত থাকার পর...” কথা বলা থামিয়ে দিলো মুশকান। “...আগেই বলেছি, খিদের কাছে। সবকিছু হেরে যায়।”

ক্রমশ তার সামনে বসে থাকা মুশকান জুবেরি আরো বেশি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। যেনো এক মায়াবি তার মায়ার জাল ছড়িয়ে দিয়েছে। চারপাশে এক ধরণের কুয়াশা। মাথাটা ঝিমঝিম করছে আগের চেয়েও বেশি।

"যাত্রিদের মধ্যে একজন ডাক্তার ছিলো কিন্তু সে ছিলো মারাত্মক আহত…তাই ওরা সবাই সদ্য মেডিকেল থেকে বের হওয়া আমাকেই বললো মৃত মানুষগুলোর কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খাওয়ার উপযোগী আর পুষ্টি জোগাবে বেশি…" একটু থামলো মুশকান। "…দিনের পর দিন আমরা মৃতদের খেয়ে বেঁচে রইলাম…অপেক্ষা করতে লাগলাম উদ্ধার পাবার জন্য। যদিও ততদিনে অনেকেই হাল ছেড়ে দিয়েছিলো। বাঁচার আশা কেউ করছিলো না।"

আরেকটা ক্লিপিংস আর ছবির দিকে তাকালো ছফা ভগ্নপ্রায় প্লেনের বাইরে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বেঁচে থাকা কিছু মানব-সন্তান। তাদের প্রত্যেকের চেহারা বিধ্বস্ত, শরীর দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের মতোই।

"এভাবে এক মাস চলে গেলো কিন্তু কেউ এলো না আমাদের উদ্ধার করতে।"

ছফা আরেকটা পৃষ্ঠা উল্টালো কম্পিত হাতে।

"লাশগুলো কেটে খাওয়ার উপযোগী অংশগুলো আমরা বরফের ভেতর ঢুকিয়ে রাখতাম সংরক্ষণ করার জন্য। প্লেনের ভেতরে পাওয়া ম্যাচবক্স থেকে আগুন জ্বালিয়ে এটা ওটা পুড়িয়ে বরফ গলিয়ে খাবার পানি তৈরি করে নিতাম। কিন্তু কোনো কিছুই যথেষ্ট ছিলো না। ক্রমশ বনের পশুর মতো হয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। অভুক্ত পশু! হিংস্র আর অসভ্য। শুধু বেঁচে থাকাটাই যেনো একমাত্র লক্ষ্য। আর কোনো উদ্দেশ্য নেই আমাদের সামনে।"

পেপার ক্লিপিংস থেকে চোখ সরিয়ে মুশকানের দিকে তাকিয়ে রইলো। নুরে ছফা। তার মুখে কোনো রা নেই। কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে সে। চোখের সামনে মুশকানের অবয়বটি কুয়াশায় মিলিয়ে যাচ্ছে, তরঙ্গায়িত হচ্ছে! তার কথাগুলো যেনো বহূদূর থেকে ভেসে আসা গুঞ্জনের মতো শোনাচ্ছে এখন।

“আহত, রোগগ্রস্ত মানুষগুলো টিকে থাকার অনেক চেষ্টা করেও একে একে ঢলে পড়লো মৃত্যুর কোলে। তারা হয়ে উঠলো আমাদের আহার!”

ছফার বমি বমি ভাব হলো। “এভাবে দু-মাস চলে গেলো কিন্তু উদ্ধারের কোনো চিহ্ন দেখতে পেলাম না। এবার প্রায় সবাই আশা ছেড়ে দিলো। তিনজন সাহসী যুবক চেষ্টা করলো পাহাড় থেকে নীচে নামার। আমরা বাঁধা দিলাম, কিন্তু তারা ছিলো বেপরোয়া, কারো কথা শুনলো না। একটু থামলো মুশকান জুবেরি। “ওদের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি..সম্ভবত ভুলপথে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে.কিংবা দুর্ঘটনায় পড়ে থাকবে হয়তো।”

এসব কথা আর শুনতে চাইছে না ছফা কিন্তু মুখ ফুটে বলতেও পারছে না।

“শেষদিকে প্রায় দু-দুটো সপ্তাহ আমরা কেউ ঘুমাতে পারি নি।”

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো ডিবির জাঁদরেল ইনভেস্টিগেটর। তার সেই দৃষ্টি ঢুলু ঢুলু।

“খাবার উপযোগী লাশ ফুরিয়ে গেছিলো..যারা বেঁচে ছিলাম তারা মনে মনে আশা করতাম কেউ হয়তো এমন কঠিন পরিস্থিতি সহ্য করতে না পেরে মরে যাবে আর আমরা...”

ছফার বমি বমি ভাবটা আবারো ফিরে এলো।

“কিন্তু কেউ আর মরছিলো না, দীর্ঘশ্বাস ফেললো মুশকান। “দু মাসেরও বেশি সময় ধরে কঠিন পরিস্থিতিতে লড়াই করে আমরা হয়তো টিকে থাকার অসামান্য ক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছিলাম। কোনো কিছুই আর আমাদের পরাজিত করতে পারছিলো না।”

ছফা আরেকটি পৃষ্ঠা উল্টালো।

“আরো পাঁচদিন কোনো কিছু না খেয়ে কাটিয়ে দিলাম। খিদে আমাদেরকে অসভ্যতার চরম অবস্থায় নিয়ে গেলো। একরাতে আমাদের মধ্যে একজন অন্য একজনকে হত্যা করে

ফেললো!”

স্থিরচোখে চেয়ে রইলো ছফা।

“আমরা সবাই বুঝতে পারলাম কিন্তু এ নিয়ে কেউ কিছু বললাম না। আরো কয়েকটা দিনের আহার তো হলো!” একটু থেমে উদাস হয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো মুশকান। “ঐ ঘটনার পর থেকে আমরা কেউ রাতে ঘুমাতাম না...কেউ কাউকে বিশ্বাস করতাম না। সবাই সতর্ক থাকতাম। সবাই জানতাম এরপর কি হতে চলেছে...” এবার ছফার দিকে তাকালো। “একদল আরেক দলকে মেরে ফেলবে...নিজেদের আহার বানাবে!”

নুরে ছফা মুখ খোলার চেষ্টা করলো কিন্তু হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলো মুশকান।

“আপনাকে কিছু বলতে হবে না। যা বলার আমিই বলছি।” একটু থেমে গভীর করে নিঃশ্বাস নিয়ে নিলো আবার। “আমরা সবাই উদ্ধারের আশা ছেড়ে দিয়ে শারীরিক এবং মানসিকভাবে ভেঙে পড়লাম। সবাই সবাইকে সন্দেহ করতে লাগলাম...যে কেউ যে কাউকে খুন করে খেয়ে ফেলতে পারে। বরফে ঢাকা উপত্যকায়...মাটি থেকে সাত হাজার মিটার উপরে পশুর মতো বেঁচে রইলাম আমরা কয়েকজন মানুষ।”

ছফা আরেকটি পৃষ্ঠা উল্টালো। কিছু পেপার-ক্লিপিংসের সাথে ছবিও আছে মনেক। কিন্তু স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছে না। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে তার।

“অবশেষে একদিন সকালে হুট করেই একটা হেলিকপ্টার দেখতে পলাম আকাশে।”

ছফা চোখ দুটো পিটপিট করে দেখার চেষ্টা করলো। একদল উদ্ধার পাওয়া মানুষের ছবি ভেসে উঠলো তার সামনে।

.

অধ্যায় ৩৭

কেএসকে চুপ মেরে আছে। ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদও কিছু বলছেন না। জাওয়াদ নিজের সিটে এপাশ-ওপাশ করছে বলে খ্যাচখ্যাচ করে শব্দ হচ্ছে, সেই শব্দটাই সুকঠিন নীরবতাকে জমাট বাঁধতে দিচ্ছে না।

"বুঝতেই পারছেন," দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ডাক্তার। "মানুষের মাংস খেয়ে বেঁচে যাওয়াদের ব্যাপারে সমাজ আর আশেপাশের মানুষ কেমন আচরণ করে।"

কেএসকে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"বেঁচে যাওয়াদের মধ্যে একমাত্র মুশকানই ছিলো এশিয়ান...মুসলিম..." চশমাটা খুলে পরিস্কার করে নিলেন ডাক্তার। " তার অবস্থা হয়েছিলো খুবই শোচনীয়। নিজের পরিবার থেকেও সে বিরূপ মনোভাবের শিকার হয়। খুব দ্রুতই তার জীবনটা অসহনীয় হয়ে ওঠে।"

চুপ মেরে রইলো কেএসকে। সে এই ব্যাপারটা বুঝতে পারছে। যেখানে আমাদের দেশে একজন ধর্ষিতাকেই সব অপমান আর গঞ্জনা সইতে হয় সেখানে মানুষের মাংস খাওয়া একজনের সাথে কি আচরণ করা হবে সেটা অনুমেয়। আমেরিকায় থাকলেও নিজের কমিউনিটিতে কঠিন অবস্থায় পড়তে হয়েছে মুশকানকে। একদম স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়াটা আর সম্ভবও হয় নি।

"এই কথাটা আমাদের হাসপাতালে জানাজানি হয়ে গেলে ভীষণ সমস্যা হবে... রেপুটেশনের ব্যাপার...বুঝতেই পারছেন।"

ডাক্তারের কথায় মাথা নেড়ে সায় দিলো কেএস খান।

"তাই আমি মুশকানকে একটা অফার দিলাম," ডাক্তার একটু কেশে নিলেন। "হাসপাতালের চাকরিটা সে ছেড়ে দিয়ে একজন কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করতে পারে...পর্দার আড়ালে থেকে কাজ করতে কোনো সমস্যা নেই...কিন্তু মুশকান এই প্রস্তাবে রাজি হয় নি। সে চাকরি ছেড়ে দেয়।"

"তখন কি উনি মি. জুবেরিকে বিয়ে করেছেন?" এই প্রথম জাওয়াদ কোনো প্রশ্ন করলো।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন ডাক্তার। "এই ঘটনার মাসখানেক আগেই। ওদের বিয়েটা হয়।"

কথাটা শোনার পর অনেকক্ষণ চুপ মেরে রইলো কেএসকে। এরকম অভাবনীয় ঘটনা শুনতে হবে সেটা ঘুণাক্ষরেও ভাবে নি। আন্দিজের এই প্লেন ক্রাশের উপরে দু-দুটো বই আছে, একটা সিনেমাও বানানো হয়েছে। সিনেমাটা না দেখলেও বই পড়েছে অনেক আগে। খুবই লোমহর্ষক কাহিনী। বইটা পড়ার পর প্রায় মাসখানেক সে কোনো ধরণের মাংস খেতে পারে নি। মাংস দেখলেই তার মনে হতো নরমাংসের কথা। একদল বিপন্ন মানুষ লাশ কেটে খাচ্ছে!

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় খোদাদাদ শাহবাজ খান নড়েচড়ে বসলো। "ডাক্তার, ঐ ঘটনার উপরে আমি দুইটা বই পড়ছি...ওইখানে তো মুশকান নামের কোনো ক্যারেক্টারের কথা লেখা নাই?!"

কথাটা শুনে ছফার সহকারী জাওয়াদ গোল গোল চোখে চেয়ে রইলো, তবে ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদ গভীর করে নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, "মুশকানের অনুরোধে বই দুটোর লেখক তার নাম ব্যবহার করে নি। তার চরিত্রটি অন্য নামে আছে বইয়ে।"

কেএস খান চুপ মেরে গেলো।

"মুশকান জানতো, এটা জানাজানি হলে সামাজিকভাবে কি রকম সমস্যায় পড়তে পারে।" দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এলো ডাক্তারের ভেতর থেকে। "বই লেখার অনেক আগেই সে তার নিজের কমিউনিটি আর পরিবারের কাছ থেকে বিরূপ আচরণের শিকার হয়েছিলো। ওদের কাছে এটা লুকানো যায় নি।"

"এই কারণেই মুশকান আমেরিকায় থাকে নি," অস্ফুটস্বরে বললো কেএস খান।

"ও বুঝতে পেরেছিলো বইতে ওর কথা লেখা হলে শুধু আমেরিকায় নয়, পৃথিবীর সবখানেই বিরূপ আচরণের শিকার হবে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ডিবির সাবেক কর্মকর্তা। ঘটনাটা আসলেই প্যাথেটিক। কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বললো না।

"অনেক রাত হয়েছে, আমি আবার আর্লি রাইজার।"

সম্বিত ফিরে পেয়ে ডাক্তারের দিকে মুখ তুলে তাকালো কেএসকে।

হাতঘড়িতে হাত রেখে বললেন তিনি, "একটু স্টাডি করে ঘুমাতে যাবো। আপনাদের যদি আর কিছু জানার না থাকে তাহলে..."

মাথা নেড়ে সায় দিলো কেএস খান। জাওয়াদকে ইশারা করে নিজেও উঠে দাঁড়ালো। "সরি, ডাক্তার। আমরা আর আপনের সময় নষ্ট করুম না।" কথাটা বলেই হাত বাড়িয়ে দিলো সে।

ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদ উঠে দাঁড়িয়ে কেএসকের বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরে সৌজন্যমূলক মাপায়সি দিলেন।

"থ্যাঙ্কস ফর গিভিং আস ইওর ভ্যালুয়েবল টাইম।"

ডাক্তার আর কিছু না বললে জাওয়াদকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলো সে। অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে লিফটের সামনে এসে হাই তুললো। "কি জানতে আসলাম আর কি জানলাম," অনেকটা বিড়বিড় করে বললো সাবেক ডিবি কর্মকর্তা। "আমি কখনও ঘুণাক্ষরেও ভাবি নাই সেভেনটি টু-র এই আলোড়নসৃষ্টিকারী ঘটনায় আমাদের দেশের কেউ ছিলো।" হাফ ছাড়লো মি. খান। "শেক্সপিয়ার কইলাম অনেক আগেই বইলা গেছে, ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশান। একদম সত্যি কথা।"

জাওয়াদ মাথা নেড়ে সায় দিলো। “কিন্তু স্যার, একটা জিনিস আমার মাথায় ঢুকছে না?”

“কি?”

“আপনি বলছেন আন্দিজের ঘটনাটা ১৯৭২ সালের... যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে মুশকান জুবেরির বয়স এখন কতো?”

কপালের ডানপাশটা চুলকে দ্রুত হিসেব কষে ফেললো কেএসকে। “উমমমম... পয়ষট্টি...না, না...ছেষট্টি!”

. “কিন্তু নুরে ছফা স্যার তো আমাকে বলেছেন মহিলা দেখতে যথেষ্ট স্মার্ট... অ্যাট্রাক্টিভ...মানে খুব সুন্দরি?”

“ষাইটের পর কি কেউ এরকম থাকবার পারে না?”

মাথা দোলালো জাওয়াদ। “স্যার, আপনি বুঝতে পারছেন না.. ছফা স্যার বলেছেন, সুন্দরপুরের এমপি ঐ মহিলাকে বিয়ে করতে চাইছে। ছেষট্টি বছরের কোনো মহিলাকে একজন এমপি কেন বিয়ে করতে চাইবে?”

কেএস খান আবারো গাল চুলকালো। একটু ধন্দে পড়ে গেছে সে।

“এখন আমার মনে পড়েছে, ছফা স্যার ফোনে আমাকে ডিটেইল বলার সময় বলেছিলেন, ঐ মহিলার বয়স আনুমানিক ত্রিশ থেকে পয়ত্রিশের মধ্যে হবে।”

চমকে উঠলো মি, খান। “বলো কি!”

“জি, স্যার।” জোর দিয়ে বললো ছেলেটা।

“হায় হায়, সর্বনাশ হইয়া গেছে! মনে হইতাছে ছফা বিরাট বড় ভুল কইরা ফালাইছে!”

.

অধ্যায় ৩৮

বুকের কাছে দু-হাত ভাঁজ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে মুশকান জুবেরি, তার দৃষ্টি সামনে বসা নুরে ছফার দিকে নিবদ্ধ। ডিবির জাঁদরেল ইনভেস্টিগেটর যেনো আক্ষরিক অর্থেই হতবাক হয়ে আছে দীর্ঘ সময় ধরে। কোলের উপরে পেপার-ক্লিপিংসের অ্যালবামটা নিয়ে বসে আছে সে। কখনও মনোযোগ দিয়ে ছবি আর নিউজগুলো পড়ছে, কখনও মুখ তুলে তাকাচ্ছে। যেনো ছবির একটি চরিত্রকে সামনাসামনি পেয়ে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করছে বার বার।

"এ-এই ঘটনাটা তো..." ঢোক গিললো নুরে ছফা, " মানে..." মাতালের মতো আচরণ করছে সে। চোখ দুটো দুলু ঢুলু। কথাটা শেষ করতে পারলো না।

"১৯৭২ সালে," আস্তে করে বললো মুশকান জুবেরি। তার ঠোঁটে দুর্বোধ্য হাসি। "তখন কি আপনার জন্ম হয়েছিলো?" তারপর মাথা দোলালো। সে। "আমার তা মনে হচ্ছে না।"

ছফা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো মহিলার দিকে।

"আপনার কথা বলার ক্ষমতা বোধহয় লোপ পেয়ে গেছে, স্থিরচোখে চেয়ে আবারো হাসি দিলো। "মনে হয় না যোগ-বিয়োগ করে বয়স বের করার মতো অবস্থাতে আপনি এখন আছেন।"

ছফা ঢোক গিললো। তার দৃষ্টি এখন ঝাপসা নয়, পানিতে প্রতিফলিত হওয়া প্রতিবিম্বের মতো টলমল করছে চারপাশের দৃশ্যপট।

"সমস্যা নেই। আপনার সমস্ত প্রশ্নের জবাব আমি নিজে থেকেই দিচ্ছি। ভালো করেই জানি আপনার মাথায় কোন কোন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে।"

ছফা আবারো নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলো। তার মনে অনেক প্রশ্ন থাকলেও অজ্ঞাত এক কারণে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।

উঠে দাঁড়ালো মুশকান। ছফার সামনে এসে ভালো করে তাকালো তার চোখের দিকে, ডাক্তার যেভাবে রোগির চোখ পরীক্ষা করে ঠিক সেভাবে। মনে হলো সসতুষ্ট হয়েছে।

ছফা টের পেলো মহিলার গায়ের গন্ধ! সেই গন্ধ মোহনীয়; মাদকতাপূর্ণ, দুর্দমনীয়! জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলো সে।

"আহ" মায়াবি কণ্ঠে বলে উঠলো মুশকান। "মাথাটাকে এবার একটু বিশ্রাম দিন। কী দরকার যোগ-বিয়োগের হিসেব করে। বললামই তো..আমি আপনার সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে দেবো। আপনাকে কষ্ট করে কিছু বলতে হবে না-ভাবতেও হবে না।"

নুরে ছফার মনে হলো সে বাস্তবের কোনো জগতে নেই। অপার্থিব এক জগতে, অমর্ত্যের এক অপ্সরার মুখোমুখি বসে আছে।

"তখন আমার বয়স ছিলো পঁচিশ!" লাস্যময়ীহাসি দিয়ে বললো মুশকান। "কি, বিশ্বাস হচ্ছে না?" ছফার থুতনিটা আলতো করে ধরে তার চোখে চোখ রেখে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলো। "স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে?"

শুধুমাত্র মুখটা একটু হা করতে পারলো ছফা। আস্তে করে তার সেই ঠোঁটে তর্জনি দিয়ে স্পর্শ করলো মুশকান। আরো গভীরভাবে তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। যেনো বোঝার চেষ্টা করছে ডিবির ইনভেস্টিগেটরের মাথায় কোন চিন্তাটা খেলা করছে এ মুহূর্তে।

"আমি কে?" নিঃশব্দে হাসলো। "আমি কে!"

ছফা নির্বাক চোখে চেয়ে রইলো কেবল।

“তুমি আমার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে চাও, তাই না?” ছফার ঠোঁটে আঙুল ছোঁয়ালো সে। “রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসে নি…এই নামটা নিয়ে তোমার কোনো প্রশ্ন নেই? কেন আমি এমন নাম দিলাম?”

ছফার ঠোঁট দুটো সামান্য কেঁপে উঠলো।

“অন্যেরা তোমাকে এ সম্পর্কে কিছু বলেছে?” মাথা দোলালো আপন মনে। “ওসব একদম সত্যি না।”

মৃদু গোঙানি দিতে পারলো নুরে ছফা।

“আহ, তুমি কিছু বোলো না…যা বলার আমিই বলছি।” তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলো সে, “আমি আসলেই রবীন্দ্রনাথের ভক্ত। সেই ছোটোবেলা থেকে। আমার মা খুব ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতো..আমাকেও শিখিয়েছিলো। ছায়ানটের প্রথমদিকার ছাত্র ছিলাম আমি। ৬২-তে যখন পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করা হলো, সেই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে অনেকের সঙ্গে আমিও ছিলাম…তখন অবশ্য আমি অল্পবয়সি কিশোরী।” ছফার দিকে তাকালো সে। “ঠিক এভাবে লক্ষমীছেলের মতো বসে থাকো।” কানের পাশ থেকে আবারো চুল সরিয়ে নিলো। “এরপরই বাবার চাকরির কারণে আমরা সপরিবারে আমেরিকায় চলে যাই। সেখানে গিয়ে আমরা মা-মেয়ে রবীন্দ্রচর্চা অব্যাহত রেখেছিলাম। সকালের শুরু আর রাতে ঘুমাতে যাবার আগে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা-গাওয়া আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিলো।” একটু থেমে আবার বললো, “তো, কয়েক বছর আগে যখন সুন্দরপুরে রেস্টুরেন্ট দেবো তখন সেটার নাম নিয়ে খুব একটা ভাবি নি। রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতা, গান আমার মুখস্ত. তার গল্প-উপন্যাসের অনেক চরিত্রই আমার প্রিয়…ওখান থেকে একটা বেছে নিতে কী আর এমন কঠিন কাজ।” ছফার দিকে তাকালো স্থিরচোখে। “সত্যি বলতে, চারুলতা আর ঘরে-বাইরে নাম দুটোই আমার প্রথম পছন্দ ছিলো। কিন্তু নাম দেবার আগে একটা পাগলামি করে বসলাম।”

ছফা বহুকষ্টে মুখ খুলতে পারলো কিন্তু জান্তব গোঙানি ছাড়া কোনো শব্দ বের করতে ব্যর্থ হলো আরেকবার।

"প্রচুর মজার মজার খাবার রান্না করলাম। রাতে ডাইনিং টেবিলে ক্যান্ডেল-লাইট জ্বালিয়ে সেগুলো পরিবেশন করলাম সুন্দর করে, তারপর প্ল্যানচেট করে ডেকে আনতে চাইলাম আমার প্রিয় রবীন্দ্রনাথকে।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। "কিন্তু উনি এলেন না!" সত্যি সত্যি উদাস হয়ে গেলো মুশকান। "কেন এলেন না, জানো?"

ছফার দিক থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না।

বাঁকাহাসি দেখা গেলো রহস্যময়ীর ঠোঁটে। "আমি উনার সম্পর্কে এতোকিছু জানতাম আর এটা জানতাম না, উনি খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে একদম অমনোযোগী ছিলেন। উনি মনে করতেন খাওয়া-দাওয়া করা সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। তারচেয়ে বড় কথা, আমার বানানো খাবারগুলো প্রায় সবই ছিলো নন-ভেজ।" মাথা দোলালো ডাক্তার মুশকান। "রবীন্দ্রনাথ মধ্য-বয়সের পর ভেজিটেরিয়ান হয়ে গেছিলেন। তাই আমার মিনতি সত্ত্বেও উনি আর এলেন না। সেজন্যে মনের দুঃখে এমন নাম দিয়েছি। কথাটা তো সত্যি, তাই না?" নির্বাক ছফার দিকে তাকালো সে। "তুমি বিরক্ত হচ্ছো? এসব গল্প শুনতে ভালো লাগছে না?" আক্ষেপে মাথা দোলালো। "ও…সরি!"।

এবার উঠে দাঁড়ালো মুশকান। "তুমি আসলে শুনতে চাও ওদের আমি কি করেছি… তাই না?" তাকে একটু উদাস দেখালো। "তাহলে মন দিয়ে। শোনো, প্রথমজনকে আমি এখানে ডেকে আনি নি। ও নিজের আগ্রহেই চলে এসেছিলো। চমৎকার মানুষ ছিলো… রবীন্দ্রনাথে খাওয়ার পর আমার সাথে দেখা করলো, অনেক প্রশংসা করলো। সুযোগ পেলেই কাউকে কিছু না বলে চলে আসতো এখানে। ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠলো। একদিন এই যে এখানে…" ঘরের চারপাশে চোখ বুলালো সে। "… আমরা গল্প করছিলাম। পূর্ণিমা ছিলো সেটা। বাইরে জ্যোৎস্না। ওর মধ্যে কী যে হলো…" চোখ বন্ধ করে ফেললো মুশকান। "আমিও সাড়া দিলাম একজন আরেকজনকে পাবার

জন্য পাগল হয়ে গেলাম, " ছফার দিকে কেমন করে তাকালো। "কিন্তু ওর নগ্ন শরীর...ওর গন্ধ আমাকে এলোমেলো করে দিলো মুহূর্তে। ওর সাথে মিলিত হবার আগ্রহ হারিয়ে ফেললাম।"

ছফার সামনে একটু পায়চারি করলো সে।

"ও প্রথমে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলো আমাকে তারপর জোড়াজুড়ি...এক পর্যায়ে জবরদস্তি করতে লাগলো। ভীষণ ক্ষেপে গেলাম আমি। ওর ধারণাই ছিলো না আমি ওকে কি করতে পারি। ও আমাকে অন্যসব মেয়ের মতো ভেবেছিলো। দুর্বল। অসহায়।" বাঁকাহাসি দিলো সে। "দিলাম ওর ঘাড়টা মটকে!"

আধো-অচেতনের মধ্যেই আৎকে উঠলো ছফা। চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে আছে।

"ও মরে যাবার পর ভাবলাম ওকে এভাবে অপচয় করাটা ঠিক হবে না। তাই খেয়ে ফেললাম।"

জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে শুরু করলো নুরে ছফা।

"অনেক দিন পর আরেকজন আমার প্রতি ঝুকলো আবার. আমিও সুযোগ করে দিলাম। প্রশ্রয় দিলাম। কৌশলে এখানে এনে..." নিঃশব্দে হাসলো মুশকান জুবেরি। বাতাসে ঘ্রাণ নিলো সে। "তবে শেষের দু-জনকে পুরোপুরি কৌশল করে ডেকে এনেছি এখানে। ওরা চারুলতা'কে পাবার জন্য ঘরের বাইরে এসে হারিয়ে গেলো চিরতরের জন্য!" গভীর করে নিঃশ্বাস নিলো। "আর তুমি..." ছফার খুব কাছে মুখ নিয়ে এলো সে। "তোমাকে আমি ডেকে আনি নি। তুমিও আমার টানে এখানে আসে নি। তাই ঠিক করেছি, তোমাকে আমি-"

একটা রিংটোন বেজে উঠলে চমকে তাকালো মুশকান। সোজা হয়ে দাঁড়ালো। ছফা তার জ্যাকেটের খোলা জিপারের ভেতরে কোনোরকমে কম্পিত হাতটা ঢুকিয়ে দিতে পারলো।

বুকপকেট থেকে মোবাইলফোনটা বের করে আনতেই হাত থেকে সেটা পড়ে গেলো মেঝের ভারি কার্পেটের উপরে। ফ্যাল ফ্যাল চোখে সেদিকে চেয়ে রইলো সে।

মুশকান তাকালো ফোনের দিকে। ডিসপ্লেটা আলোকিত হয়ে আছে। কলার আইডি দেখতে পেয়ে নীচু হয়ে ফোনটা তুলে নিলো, তার ঠোঁটে দেখা গেলো মুচকি হাসি। কলটা রিসিভ করে স্পিকার অন করে দিলো, ফোনটা চেপে ধরলো ইনভেস্টিগেটরের ডানকানে।

"হ্যালো, নুরে ছফা?" ওপাশ থেকে উদ্বিগ্ন একটা কণ্ঠ শোনা গেলো। কিন্তু ডিবির তুখোড় ইনভেস্টিগেটর কোনো জবাব দিতে পারলো না।

"হ্যালো, আমার কথা শুনতাছেন? হ্যালো..."

"অ্যা..." একটা শব্দ বের হলো ছফার মুখ দিয়ে। তার জিভ ভারি হয়ে। গেছে, কথা বলতে গেলে গোঙানি বের হচ্ছে এখন। "সু-স্যা-স্যা!" বহু কষ্টে মাতালের মতো জড়ানো কণ্ঠে শুধু এটুকুই বলতে পারলো।

"ছফা, শুনেন...আপনে যেই মুশকানের কথা বলতাছেন সম্ভবত ঐ মহিলা সেই মুশকান না!"

নুরে ছফা চোখ কুচকে তাকালো তার সামনে থাকা মুখটার দিকে। সেই মুখে দুবোধ্য হাসি। কিছুটা তাচ্ছিল্যের, কিছুটা অবজ্ঞার!

ছফার কান থেকে ফোনটা সরিয়ে নিলো ডাক্তার মুশকান। কলটা না কেটেই চেয়ারের পাশে কফি টেবিলের উপরে রেখে দিলো। ফোন থেকে উদ্বিগ্ন কণ্ঠটা বেশ জোরে জোরে চেঁচাতে লাগলো :

"ছফা! আপনে ঠিক আছেন তো? ছফা! নুরে ছফা!"

ঢুলু ঢুলু চোখে পাশ ফিরে ফোনের দিকে তাকালো ডিবির ইনভেস্টিগেটর, কিন্তু হাত বাড়িয়ে ফোনটা ধরার ক্ষমতা তার নেই।

.

ফোনের দিকে অবিশ্বাসে চেয়ে আছে কেএস খান। কলটা এখনও কেটে দেয়া হয় নি কিন্তু ছফার দিক থেকে কোনো সাড়াশব্দও পাচ্ছে না।

জাওয়াদ তার দিকে ঝুঁকে ডিসপ্লেটা দেখলো। "স্যার, কি হলো?" তার কণ্ঠে আতঙ্ক।

"ছফা তো কোনো রেসপন্স করতাছে না!" চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো কেএসকে। আর কোনো কথা না বলে ফোনটা জাওয়াদের হাতে দিয়ে দিলো সাবেক ডিবি কর্মকর্তা।

ছেলেটা কানে ফোন চেপে বলতে লাগলো, "স্যার? স্যার, আমি জাওয়াদ..স্যার?" ফ্যালফ্যাল চোখে ছেলেটা তাকালো কেএস খানের দিকে।

"কইলাম না, কোনো রেসপন্স করতাছে না," অনেকটা বিড়বিড় করে বললো ক্রিমিনোলজির শিক্ষক।

"ছফা স্যার কিছুই বলেন নি?"

মাথা দোলালো সে।

"তাহলে ফোনটা কে রিসিভ করেছে?"

ছেলেটার দিকে তাকালো সাবেক ইনভেস্টিগেটর। "কলটা কাটছেন তো, নাকি?"

"ওহ, সরি।" কলটা কেটে দিয়ে জানতে চাইলো জাওয়াদ, "এখন তাহলে কি করবো আমরা?"।

“বুঝবার পারতাছি না,” চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো মি. খান। তার মাথায় নানান আশংকা ঘুরপাক খাচ্ছে। “মনে হয় একবার একটু দু-হা করলো…তারপর চুপ।”

“ঘটনা কি?”

যেনো সম্বিত ফিরে পেলো কেএসকে, তারপর ঝটপট বলতে লাগলো, “তুমি সুন্দরপুরে এসপিরে ফোন দাও…ওরে বো ছফার ব্যাপারে কিছু জানে কিনা…ছফা কই আছে সেই ব্যাপারে খোঁজ নিতে বলো…জলদি করো..আর আমি একটু ডাক্তারের সাথে কথা বইলা আসতেছি,” কথাটা বলেই পেছন ফিরে ডাক্তারের অ্যাপার্টমেন্টের দরজার দিকে পা বাড়ালো আবার।

কলিংবেল বাজাতেই ডাক্তার নিজেই এসে দরজা খুলে দিলেন। কেএস খানকে দেখে অবাক হলেন ভদ্রলোক। “আপনি!”

“সরি…একটা জরুরি দরকারে আপনেরে আবার ডিস্টার্ব করতে হইলো।”

.

অধ্যায় ৩৯

“কি?” বেশ রহস্য করে বললো মুশকান জুবেরি, “তুমিও কি ঐ কেএসকের মতো মনে করো, আমি অন্য কেউ?” ছফার মোবাইলফোনের ডিসপ্লেতে। কেএসকে নামটা সে দেখেছে।

কিনতু যাকে বললো সে চোখের পাতা খুলে রাখতেই বেগ পাচ্ছে। এখন। মুখ দিয়ে শব্দ বের করতে গিয়ে আবারো জড়িয়ে গেলো।

ছফার গালে আলতো করে টোকা দিয়ে লম্বা করে ঘ্রাণ নিলো সে। এটা করার সময় চোখ দুটো কয়েক মুহূর্তের জন্য বন্ধ করে ফেললো। "তোমাকেও অপচয় করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই।"

মুচকি হেসে আবার নিজের আসনে ফিরে গেলো। ছফার দুলুঢুলু চোখে আতঙ্কের প্রচ্ছায়া দেখা যাচ্ছে এখন।

"ভয় পাচ্ছো?" স্থিরচোখে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। হঠাৎ করেই গুনগুন করে গাইতে শুরু করলো মুশকান :

"তোমায় কিছু দেব বলে চায় যে আমার মন, নাই-বা তোমার থাকল প্রয়োজন।
যখন তোমার পেলেম দেখা, অন্ধকারে একা একা ফিরতেছিলে বিজন গভীর বন।
ইচ্ছা ছিল একটি বাতি জ্বালাই তোমার পথে, নাই-বা তোমার থাকল প্রয়োজন।"

গানটা থামিয়ে গভীর করে নিঃশ্বাস নিলো। "তোমার শরীরের ঘ্রাণটা বেশ...খেতে দারুণ লাগবে।"

ছফা কিছু বলার চেষ্টা করেও বলতে পারলো না।

তর্জনি নাড়িয়ে মানা করলো মুশকান। "না...আমি আমার কথা বলছি।" তারপর আবারো হাসি, আবারো রহস্যময় চাহনি। "ওদের কিন্তু আমি একা খাই নি। রবীন্দ্রনাথে যারা খেতে আসে তারাও ওদের স্বাদ পায়!"

এমন অবস্থায়ও ছফা আৎকে উঠলো কথাটা শুনে।

"আর তারা সবাই বেশ আয়েশ করে ওদের খায়?"

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলো ইনভেস্টিগেটর। সেও ঐ রেসটুরেন্টে খেয়েছে। আয়েশ করেই খেয়েছে!

“ওদের খেতে তোমার কেমন লেগেছে?”

ছফার মনে হলো সে বমি করে দেবে। রাগে কাঁপতে লাগলো তার সারা শরীর। আতঙ্কের সাথে টের পেলো বমিটা বোধহয় এবার আর আটকাতে পারবে না।

“চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। তুমি এখন কথা বলতে পারবে না, হাতঘড়িতে সময় দেখলো। কিছুক্ষণ পর আমার কথাও শুনতে পাবে না তুমি। আর এতোক্ষণ ধরে আমি যা বললাম সে-সব কথা অন্য কাউকে শোনানোর সুযোগ তুমি পাবে না। তুমি আমার কথা বুঝতে পেরেছো?”

নুরে ছফা জোর করে চোখের পাতা খুলে রাখার চেষ্টা করলো।

*

“এইটা কেমনে সম্ভব?”

একটু আগে যেখানে বসেছিলো ঠিক সেখানেই আবারো বসে আছে কেএসকে। ডাক্তার আসকারও আগের চেয়ারে বসে আছেন, তবে জাওয়াদ এখন ঘরে নেই।

“এইটা তো কোনো যুক্তি-বুদ্ধিতে মিলানো যাইতাছে না।”

ডাক্তার আসকার মাথা নেড়ে সায় দিলেন। “আপনি কেন, কেউই এটা বিশ্বাস করবে না। করতে পারবে না। আমেরিকা থেকে যে ডাক্তার এখানে জয়েন করেছিলো তারও বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছিলো। কিনতু ঘটনা সত্যি।”

আরেকবার বিস্মিত হলো কেএস খান। “কি কারণে এমনটা হইছে তা কি আপনেরা জানেন? মানে আপনে নিজেও একজন নামকরা ডাক্তার...আপনের তো আইডিয়া থাকার কথা?”

ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদ গম্ভীর হয়ে গেলেন। তার মুখ থমথমে। “এটা মেডিকেল সায়েন্স দিয়ে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। অন্তত আজকের দিন। পর্যন্ত এটা অব্যাখ্যাতই বলতে পারেন।”

“আপনে মুশকানুরে এই ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই?”

আলতো করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডাক্তার। “করেছিলাম...এরকম একটি বিস্ময়কর ঘটনা আমাকেও দারুণ কৌতূহলি করেছিলো...কিন্তু মুশকান আমাকে যেটা বলেছিলো সেটা একেবারেই অবিশ্বাস্য।”

“কি বলছিলো আপনেরে?”

“আগেই বলেছি, আন্দিজের প্লেন ক্রাশের সময় ওরা মৃত সহযাত্রিদের লাশ খেতো। মেডিকেল সায়েন্সের স্টুডেন্ট হিসেবে ওগুলোর কোন অংশ খাওয়ার উপযোগী সেটা বাছাই করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো মুশকানের উপরেই” একটু থেমে গেলেন ডাক্তার। “কাকতালীয়ভাবে পর পর কয়েকদিন মানুষের শরীরের নির্দিষ্ট একটি অংশ ও খেয়েছিলো। ওর ধারণা এরফলেই ওর এমন পরিবর্তন। আই মিন, ঘটনাচক্রে আবিষ্কার করেছে সে।”

কেএসকে কিছুই বুঝতে পারলো না। “ইট ডাসেন্ট মেক সেন্স!” বিড়বিড় করে বললো।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন আসকার ইবনে সায়িদ। “ইট রিয়েলি ডাসেন্ট মেক সেন্স অ্যাট অল।”

“মানুষের শরীরের কোন অংশটা খাইতো মুশকান?”

কেএসকের দিকে তাকালেন ডাক্তার। বুঝতে পারছেন ভদ্রলোকের আগ্রহের পারদ সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে গেছে। “ও সেটা কখনও কাউকে বলে নি।” দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি, “সম্ভবত এই জীবনে কখনও কাউকে বলবেও না।”

মি. খান স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

“এই সিক্রেটটা সে কি কারণে কারোর সাথে শেয়ার করে না, জানেন?”

কেএসকে মাথা নেড়ে সায় দিলো। “একটা মারাত্মক বিশৃঙ্খলার জন্ম দিবো। সভ্যতা আর সভ্য থাকবে না। মানুষ হইয়া যাইবো অসভ্য। পশু। ঠিক যেমনটা ছিলো আদিমযুগে...” একটু থেমে আবার বললো, “...ঠিক আদিমও না..তার চায়াও বর্বর। একে অন্যেরে খাওনের জন্য...” আর বলতে পারলো না। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার ভেতর থেকে। “সবাই চিরযৌবন। চায়!”

ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদ চোখ বন্ধ করে ফেললেন। কতোগুলো দৃশ্য ভেসে উঠলো তার মনের পর্দায়। মৃত্যুভয়ে কাতর একজন মানুষ তার সবচাইতে ঘনিষ্ঠবনধুর কাছে নিজের গোপনভীতিটার কথা জানালো একদিন। ক্রমশ বার্ধক্যের চোরাবালিতে তলিয়ে যাচ্ছে। এগিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর হিমশীতল গহ্বরের দিকে। কিন্তু সে বাঁচতে চায় আরো অনেক বছর। এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে বড় ভয়। আজকাল মৃত্যুচিন্তা তাকে দিন-রাত ব্যতিব্যস্ত করে রাখছে।

সব শুনে মুশকান পরম মমতায় বন্ধুর হাত দুটো ধরে সহমর্মিতা জানালো! “এই পৃথিবীতে আমার বন্ধু বলতে শুধু তুমি সেই তুমি চলে গেলে যে আমি বড় একা হয়ে যাবো!”

আলো-আঁধারির একটি ডাইনিংরুম। বিশাল একটি টেবিল। দু-জন মানুষ চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছে। কেউ কিছু জানতে চাইছে না। কেউ কিছু বলছেও না। যেনো নীরবতার এক অলিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ তারা। এরপর থেকে নির্জন জমিদারবাড়িটি হয়ে উঠলো মৃত্যুভয়ে পর্যদস্ত বৃদ্ধমানুষটির নিয়মিত গন্তব্য। আর আলো-আঁধারির ডাইনিংরুমটি তার গোপন তীর্থস্থান।

অনেকক্ষণ পর চোখ খুললেন ডাক্তার। দেখতে পেলেন কেএস খান গভীর মনোযোগের সাথে চেয়ে আছে তার দিকে।

“মানুষ সব সময়ই চিরযৌবন লাভের আশায় মরিয়া...” ধীরকণ্ঠে বললেন তিনি। “সভ্যতার শুরু থেকে সে এই চেষ্টাটা করে আসছে, এখনও এ নিয়ে বিরাট গবেষণা করছে হাজার-হাজার বিজ্ঞানী কিনতু তারা কেউই জানে না, মানুষের শরীরের ভেতরেই লুকিয়ে আছে চিরযৌবন লাভের সেই অমৃত!”

হতবুদ্ধির দেখালো কেএস খানকে।

“ ডিজাইনড বাই মাদার-ন্যাচার,” গম্ভীর মুখে বললেন ডাক্তার। আর এমনভাবে এটা করা হয়েছে, যৌবন দীর্ঘায়িত করতে চাইলে পুরো হিউম্যান রেইসটাই বিলুপ্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। একটা বিশৃঙ্খলার জন্ম। দেবে।” কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে আবার বললেন তিনি, “মুশকান এটা ভালো করেই জানে।”

অবিশ্বাস্য শোনালেও কেএসকে বোঝার চেষ্টা করলো। মানুষের শরীরের ভেতরেই জীবনরক্ষাকারী উপাদান রয়েছে, আর সেটা প্রমাণিত। বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট থেকে শুরু করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এমনকি রক্ত-অন্য মানুষের জীবন রক্ষা করে থাকে। হয়তো চিরযৌবন লাভের উপাদানও মানুষ নিজের শরীরে বয়ে বেড়াচ্ছে। কে জানে!

“ডাক্তার?” অনেকক্ষণ চুপ থেকে বলে উঠলো সে।

একটু চমকে তাকালেন আসকার ইবনে সায়িদ।

“আন্দিজের পরও কি মুশকান জুবেরি...?”

কথাটা শেষ করতে না পারলেও সাবেক ইনভেস্টিগেটরের প্রশ্নটা কি বুঝতে পারলেন তিনি।

“তাইলে কি ঐ পাঁচজন মানুষরে…?”

মাথা নীচু করে ফেললেন ভদ্রলোক। বাম-হাত দিয়ে কপালটা আর্ততা করে ঘষতে লাগলেন তিনি। “এটা আমি জানি না। শুধু জানি, মানুষের ওই বিশেষ প্রত্যঙ্গটির প্রতি ও অ্যাডিক্টেড হয়ে পড়েছে। এটা যে ওকে যৌবন। ধরে রাখতে সাহায্য করছে সেটা তো প্রমাণিত…অন্তত মুশকানের কোনো সন্দেহ নেই এতো”।

কেএস খানের কপালে ভাঁজ পড়লো। সভ্যতার ইতিহাসে এরকম ঘটনা প্রচুর আছে। ক্যানিবালিজম এক ধরণের বিকৃত-নেশা। মানসিক সমস্যাও বটে। হয়তো এ-কারণেই কিছু অসভ্য জাতি ছাড়াও সভ্যজগতের অনেকেই সঙ্গোপনে এটার চর্চা করে থাকে। কদিন আগেও পাকিস্তানে দু ভাইকে কবর থেকে লাশ তুলে রান্না করে খেয়ে ফেলার জন্য মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। সত্তুরের দশকে ঢাকার আজিমপুর কবরস্তানের নরমাংসভোজি জলিল বেশ আলোচনায় চলে এসেছিলো। লাশের কলিজা খাওয়া ছিলো তার নেশা। এরকম অনেক ঘটনার কথা সে জানে। প্রায় সব দেশেই আছে এমন। কিছু মানুষ।

“আন্দিজে আটকা পড়ার সময় তারা সবাই যখন দু-মাসের মতো নরমাংস খেতে বাধ্য হয়েছিলো তখন কিন্তু মুশকান এটা বুঝতে পারে নি। মানে, চিরযৌবন লাভের কথা বলছি। ঐ অঙ্গটি খাওয়ার পর দারুণ এনার্জি পেয়েছিলো সে। প্রচণ্ড শীত আর কষ্টের মধ্যে তাকে এক ধরণের প্রশান্তি দিয়েছিলো। ও আমাকে বলেছে, ওটা খাওয়ার পর নাকি তার নার্ভ খুব শক্ত হয়ে যায়। একটু থামলেন ডাক্তার। “তবে উদ্ধার পাবার অনেক পরে সে। আবিষ্কার করে তার মধ্যে একটি পরিবর্তনও ঘটে গেছে।”

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো কেএসকে। “পরিবর্তন?”

“কোনো পরিবর্তন না হওয়া!”

“দীর্ঘ চল্লিশ বছরে তার মধ্যে যে পরিবর্তন হয়েছে সেটা খুবই কম। বলতে পারেন, তার বেলায় ওটা খুব ধীরগতির হয়ে গেছে। চল্লিশটি বসন্তের পরিবর্তে মাত্র সাত-আটটি বসন্তের পরিবর্তন হয়েছে তার শরীরে!” একটু থেমে আবার বললেন, “যে ডাক্তার জয়েন করেছিলো আমাদের হাসপাতালে সেও প্রথমে মুশকানের পেছনে লাগলো এই সিক্রেটটা জানার জন্য। কিন্তু মুশকান যখন কিছু জানালো না তখন সে ক্ষিপ্ত হয়ে তার আন্দিজের ঘটনাটা বলে দিলো হাসপাতালের কয়েকজনকে। সেইসাথে আরো বলতে লাগলো, মুশকান এখনও সুযোগ পেলে মানুষের মাংস খায়। সে মানুষখেকো।”

কেএসকের মনে হলো আগামী কয়েকমাস কোনো মাংস খেতে পারবে। ঠিক এমন সময় দরজায় নক হলো। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন ডাক্তার।

“জাওয়াদ আসছে মনে হয়।” কথাটা বলে মি. খান নিজেই উঠে গেলো দরজা খুলে দিতো।

“স্যার!” ঘরে ঢুকেই উদ্বেগের সাথে বললো জাওয়াদ। “সুন্দরপুরের এসপি বলেলো ছফাসার নাকি ঐ মহিলার বাড়িতে গেছেন। উনিও ফোন দিয়েছিলেন কিন্তু উনার কলটাও রিসিভ করা হয় নি। উনাকে এক্ষুণি ফোর্স নিয়ে ঐ বাড়িটা রেইড দিতে বলে দিয়েছি।” হরবর করে বলে গেলো নুরে ছফার সহকারি।

কেএসকে পেছন ফিরে তাকালো ডাক্তারের দিকে। ভদ্রলোক ভুরু কুচকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন।

“আপনি না বললেন মুশকানকে পুলিশ কাস্টডিতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে?”

মাথা দোলালো মি. খান। “আসলে ছফা মুশানের বাড়িতে গেছে...মহিলা নিজেই ওরে ফোন কইরা দেখা করতে বলছে। ঐ বাড়িতে ঢুকার আগে সে আমারে ফোন দিয়া এইটা জানাইছিলো।”

ডাক্তার আর কিছু বললেন না। তাকে যে ধোঁকা দিয়ে কথা আদায় করা হয়েছে সেটা ভালোমতোই বুঝতে পারছেন এখন। “আমার মনে হয়। আপনারা এখানে সময় নষ্ট না করে ওই লোককে বাঁচানোর চেষ্টা করলেই বেশি ভালো হয়।”

কেএসকে টের পেলো তার গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেছে।

“মুশকান কোনোভাবেই ধরা দেবে না। মরে যাবে, তবুও না!”

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে দাঁড়ালো খোদাদাদ শাহবাজ খান।

“হয় সে আপনার ঐ লোককে মেরে ফেলবে, নয়তো সে নিজে মরবে।”

.

অধ্যায় ৪০

একটু আগে সুন্দরপুরের এসপি কল করেছিলো ছফার ফোনে, মুশকান সেটা ধরে নি। পর পর তিনবার চেষ্টা করেছে পুলিশের লোকটি। তার মানে ছফার ব্যাপারে তারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। সেটাই স্বাভাবিক। গভীর করে দম নিয়ে নিলো সে। তার সামনে যে বসে আছে তাকে নিয়ে এখন কোনো মাথাব্যথা নেই। পুরোপুরি জ্ঞান হারাবার পথে আছে সে। একটু আগে কোল থেকে পেপার-ক্লিপিংসের অ্যালবামটি মেঝেতে পড়ে গেছে। এখন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে সেটার দিকে। সেই দৃষ্টিতে শুধুই অসহায়ত্ব। তাকে যে ড্রাগস দেয়া হয়েছে সেটা কাজ করে পা থেকে, তারপর আস্তে আস্তে উপরে উঠতে শুরু করে। অবশ হতে থাকে হাত-মুখ। শেষে পুরোপুরি অচেতন। ক্লিপিংসের অ্যালবামের পাতার দুই কোণে মাখিয়ে রেখেছিলো সে। খুবই শক্তিশালী ডোজের একটি ড্রাগস। আঙুল থেকে সামান্য পরিমাণও যদি জিভে লাগে কাজ হয়ে যায়।

আজ বিকেলের দিকে খুব দ্রুত সে বুঝতে পেরেছিলো ঘটনা কোন দিকে মোড় নিচ্ছে। যে এসপি তার সেবা করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করে সে তার ফোন ধরছে না। যে এমপি উদগ্রীব হয়ে ঢাকা থেকে বার বার ছুটে আসে তার সান্নিধ্য পাবার আশায়, তাকে পাবার জন্য হুমকি-ধামকি পর্যন্ত দিতে পারে, সেও হাত-পা গুটিয়ে ফেলেছে আচমকা।

এদিকে বিকেলের শেষের দিকে সার্ভিল্যান্স ক্যামেরায় দেখেছে তার বাড়ির সামনে এসে নজর রাখতে শুরু করেছে দু-জন মানুষ। গত কয়েক দিনের ঘটনা আর এইসব এক করে খুব দ্রুত সে বুঝে যায় কি ঘটতে চলেছে। সে ভাবে নি ঢাকা থেকে কোনো পুলিশ এসে তার পেছনে লেগেছে। যদি বুঝতো বহু আগেই প্রস্তুতি নিয়ে রাখতো।

যাহোক, সন্ধ্যা নামার আগেই বুঝে যায় খুব দ্রুতই ধরা পড়তে যাচ্ছে। বাড়ি থেকে বের হওয়াটাও সম্ভব নয়। আবার পেছন দিক দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পথটা সে নিজেই কয়েক মাস আগে বন্ধ করে দিয়েছে কুমিরের চাষ করে। সে জানে না তার ব্যাপারে পুলিশ কতোদূর জানতে পেরেছে, কিভাবে জানতে পেরেছে। এখন সবটাই পরিস্কার তার কাছে। অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত কঠিন একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে-এই দুর্গতুল্য বাড়িতে অনেক কিছু আছে যেগুলো অন্য কারোর হাতে পড়ার আগেই ধ্বংস করে ফেলতে হবে। এটা খুব জরুরি।

মুশকান এও বুঝতে পারছে যা করার দ্রুত করতে হবে। ঘরের এককোণে রাখা মনিটরটি চালু করে দিলো সে। ছয়টি উইন্ডো ভেসে উঠলো পদায়। সবগুলো উইন্ডোতে এই বাড়ির সার্ভিল্যান্স ক্যামেরাগুলোর ফিড দেখা যাচ্ছে। রিমোটের চেয়ে সামান্য বড় একটা জয় স্টিক হাতে তুলে নিয়ে বাইরের মেইনগেটের উপরে যে ক্যামেরাটি আছে সেটা নিয়ন্ত্রণ করলো। মেইনগেটের বাইরে সাদাপোশাকের দু-জন লোককে দেখতে পেলো সে। দু জনেই সিগারেট ফুকছে গেটের ওপাশে দাঁড়িয়ে। আর গেটের ভেতরে, একপাশে ছোট্ট একটা টুলের উপর বসে আছে দারোয়ান ইয়াকুব।

দরজা দিয়ে কেউ ঢুকছে টের পেয়ে সেদিকে তাকালো মুশকান। গোরখোদক ফালু দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

নুরে ছফা এখনও পুরোপুরি অচেতন হয়ে যায় নি। সে হয়তো হাত-পা নাড়াতে পারছে না, মুখ দিয়ে শব্দ বের করতে পারছে না কিনতু সবই দেখতে পাচ্ছে। সম্ভবত ফালুকে ঘরে ঢুকতে দেখে সে আতঙ্কিত হয়ে উঠলো, আধো অচেতনে থেকেও আতঙ্ক গ্রাস করলো তাকে।

একটু আগে এসপি ফোন করার পর পরই ইন্টারকমটা তুলে রাতকানা মেয়েটিকে বলেছিলো, সে যেনো তার ভাইকে এক্ষুণি উপরতলায় পাঠিয়ে দেয়। কথাটা শুনে সাফিনা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছিলো।

"আমি জানি সে তোমার ঘরে লুকিয়ে আছে," বেশ জোর দিয়ে। বলেছিলো মুশকান। দারোয়ান আর সাফিনার সাহায্যে সে যে এই বাড়িতে ঢুকেছে সেটাও সিসিক্যামে দেখেছিলো। "তোমার ভাইয়ের ভালোর জন্যই বলছি...ওকে উপরে পাঠিয়ে দাও। বাইরে পুলিশ আছে। ও পালাতে পারবে না। আমি ওকে বাড়ি থেকে বের করার ব্যবস্থা করছি।" এ কথা বলেই ইন্টারকমের রিসিভারটা নামিয়ে রাখে সে।

ফালু দরজার কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

"তোমার ঘটনা আমি শুনেছি," বললো মুশকান। কয়েক পা এগিয়ে গেলো সে। "ঐ ইনফর্মারকে কেন মেরেছো?"

কাচুমাচু খেলে গোরখোদক। "ও...ও সব দেইখা ফালাইছে...জাইনা গেছে!"

ভুরু কুচকে ফেললো মুশকান। "কি জেনে গেছে?"

গাল চুলকালো ফালু। "আমি যে কঙ্কাল চুরি কইরা বেচতাম..."

মুশকান জুবেরি আর কিছু বললো না। এই গোরখোদক ছেলেটাকে সুন্দরপুরের অনেক মানুষ মান্য করে, সমীহ করে। তাদের ধারণা ছেলেটার মধ্যে অলৌকিক কোনো ক্ষমতা

আছে, আর সেই ক্ষমতাবলে কেউ মারা যাবার আগেই সে বুঝে যায়, আগাম কবর খুরে রাখে। এ কথাটা যখন সে প্রথম শুনলো ফালুর সৎবোন সাফিনার কাছ থেকে তখন মনে মনে খুব হেসেছিলো। সে জানতো ফালুর এরকম কোনো ক্ষমতা নেই, তবে নিশ্চয় কোনো গোমড় আছে। সব মানুষেরই তা থাকে। এখন দেখছে, সুন্দরপুরের কামেল গোরখোদক আসলে নরকঙ্কাল চুরি করে বিক্রি করে!

"যাহোক, বাড়ির বাইরে পুলিশ আছে। তুমি এখানে থাকলে ধরা পড়ে। যাবে।"

মুশকানের কথা শুনে ঢোক গিললো পলাতক গোরখোদক।

"তবে আমি তোমাকে পালাতে সাহায্য করবো যদি আমার কথামতো কাজ করো।"

"বলেন, কি করতে হইবো," ফালু বললো।

*

জমিদার বাড়ির সামনে সাদা পোশাকের যে দু-জন পুলিশ সদস্য ডিউটিতে ছিলো তারা গেটের সামনে এসে জোরে জোরে আঘাত করছে কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। একটু আগে তাদেরকে থানা থেকে ফোন করে জানানো হয় ঐ বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ার জন্য। নুরে ছফা নামে ডিবির যে অফিসার ওখানে ঢুকেছে সে নাকি ভীষণ বিপদে পড়েছে। তাকে ফোন করলেও সে ফোন ধরছে না। ধরলেও কোনো রকম সাড়া-শব্দ করছে না। তাদেরকে আরো বলা হয়েছে, থানা থেকে একটা টিম রওনা দিয়ে দিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা চলে আসবে এখানে।

"ওই ব্যাটা দারোয়ানের বাচ্চা! গেট খোল!" তাদের মধ্যে লম্বা করে যে লোকটা আছে সে চেঁচিয়ে উঠলো। আচার-আচরণে সে সবসময়ই আগ্রাসী। "ওই মাদারচোদ্দ! গেট খুলবি নাকি ভাইঙ্গা ঢুকুম?"

তারপরও কোনো সাড়াশব্দ নেই। সঙ্গির দিকে তাকালো। "আমি কি দেয়াল টপকাইয়া ভেতরে ঢুকবো?"

মাথা চুলকালো সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশের একটি দল চলে আসবে। তাদের জন্য অপেক্ষা না করে ভেতরে ঢোকাটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছে না। "ফোর্স তো চইলা আসবো...ওরা আসুক, তারপর যা করার করন যাইবো কি কও?"

অন্য সঙ্গিটি কাঁধ তুললো কেবল। "হ, তাই করো।"

এমন সময় ওপাশ থেকে খুট করে শব্দ শুনতে পেয়ে তারা দুজনেই সতর্ক হয়ে উঠলো।

"ঐ দারোয়ান মনে হয় গেটের পেছনেই আছে," আগ্রাসী পুলিশ বললো তার সঙ্গিকে। "ওই শুয়োরেরবাচ্চা! আমরা পুলিশ....গেট খোল কইতাছি!" তারপরও কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে পা দিয়ে জোরে জোরে লাথি মারলো গেটে। এমন সময় তার কাঁধে সঙ্গির হাত পড়তেই লাথি মারা থামিয়ে। দিলো।

"ফোর্স আসতাছে," অন্যজন বললো তাকে।

এবার মাটির রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলার শব্দ শুনতে পেলো তারা। গাড়িগুলো আসার অপেক্ষায় গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রইলো দু-জনে।

একটা নয়, দুটো গাড়ি এগিয়ে আসছে জমিদার বাড়ির দিকে। হেডলাইটের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো মেইনগেটের সামনের অংশটা।

প্রথমে একটা জিপ এসে থামলো গেটের সামনে। সুন্দরপুর থানার ওসি, এসআই আনোয়ারসহ আরো তিনজন কনস্টেবল নেমে এলো সেটা থেকে। তাদের স্যালুট দিয়ে কিছু বলতে যাবে অমনি আরেকটি জিপ এসে থামলো, ওসি আর এসআই সেই গাড়ির সামনে ছুটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে। জিপ থেকে নেমে এলো এসপি মনোয়ার হোসেন।

“এখনও ভেতরে ঢোকেন নি?” ওসির উদ্দেশ্যে বললো সে।

“স্যার, আমি তো জাস্ট এলাম,” ব্যাখ্যা করলো সুন্দরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

“যে দু-জন ডিউটিতে ছিলো ওরা কি করেছে?” “স্যার,” পেছন থেকে সামনে চলে এলো ডিউটিতে থাকা দু-জন সাদা পোশাকের পুলিশ। “ভিতর থেইকা গেট বন্ধ কইরা রাখছে। অনেক ধাক্কাইছি-”

“আরে এতো কথা বলছো কেন? গেটটা যেভাবে পারো খোলার ব্যবস্থা করো!” চিৎকার করে বললো এসপি।

পড়িমরি করে ডিউটিতে থাকা দু-জন আবার গেটের সামনে দৌড়ে গেলো। ওসি পেছনে ফিরে তার সঙ্গে আসা তিনজন কনস্টেবলকে ইশারা করলো ওদের সাথে যোগ দিতে।

“স্যার, গেটটা যদি খুইলা না দেয় তাইলে কিন্তু ভাইঙ্গা ঢুইকা যাবো।”

মাথা নেড়ে সায় দিলো এসপি। “যা করার জলদি করেন।”

ওসিও আর কোনো কথা না বলে গেটের কাছে চলে গেলো, তার পেছনে পেছনে এসআই আনোয়ার।

“এই! গেট খোল!” ডিউটিতে থাকা একজন হাক দিলো। “স্যার,” পেছন ফিরে তাকালো সে। “মনে হয় না ভিতর থেইকা গেট খুইলা দিবো।”

“তাইলে দেয়াল টপকাইয়া ভিতরে ঢোকো।”

“আমার সাথে আসো,” ঝটপট বলে উঠলো এসআই আনোয়ার। ডিউটিতে থাকা দু-জন পুলিশকে নিয়ে চলে গেলো গেটের ডানপাশের দেয়ালের দিকে।

“ভেতর থেকে কিছু শোনা গেছে?” এসপি বলে উঠলো ওসির পেছনে এসে।

“না, স্যার,” পেছন ফিরে বললো ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। “পুরা বাড়িই সুনসান। ওরা আমারে একটু পর পর জানাইছে সব। ছফাস্যার ভিতরে ঢুকার পর তেমন কিছুই ঘটে নাই।”

এসপি চিন্তিতমুখে কিছু বলতে যাবে অমনি “আগুন-আগুন!” বলে একটা চিৎকার হলো। তাদের কাছে দৌড়ে এলো আনোয়ার।

“স্যার, বাড়িটাতে আগুন লাগছে!”

“কি?” আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠলো ওসি।

“জলদি বাড়িতে ঢোকো তোমরা!” চিৎকার করে বললো এসপি মনোয়ার।

এসআই আবারো দৌড়ে গেলো দেয়ালের দিকে।

এসপি আর ওসি কয়েক পা পেছনে যেতেই দেখতে পেলো গেটের পেছন থেকে লালচে আলো আর ধোঁয়া উঠছে। সম্ভবত বাড়িটার দোতলায় আগুন লেগেছে। আরেকটু পিছিয়ে যেতেই বুঝতে পারলো তাদের আন্দাজ পুরোপুরি সঠিক।

“ঘটনা-” ওসি কথাটা বলতে পারলো না, তার আগেই বাড়ির ভেতর থেকে গগনবিদারি চিৎকার ভেসে এলো। আর সেই কণ্ঠটা একজন নারীর!

৯. বোবা ইয়াকুব

অধ্যায় ৪১

বোবা ইয়াকুব মেইনগেটের পাশে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দোতলা বাড়ির দিকে মুখ করে। মূক-বধির হিসেবে কোনো শব্দ তার কানে পৌঁছায় না বলে নারীকণ্ঠের চিৎকারটা সে শুনতে পায় নি, চিৎকারটী কার সেটা বোঝা তো দরে কথা। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে দোতলায়!

একটু আগে ম্যাডাম নীচতলার জানালার সামনে এসে তাকে ইশারায় ডেকে নিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে সে যেনো কোনোভাবেই গেটটা খুলে না দেয়। এরপর গেটের বাইরে কিছু লোকজন এসে গেট খোলার জন্য চিৎকার চেঁচামেচি করেছে। আর পুরো দৃশ্যটা সে দেখেছে গেটের মধ্যে একটা ছোট্ট ফুটো দিয়ে। ক্ষিপ্ত হয়ে এক লোক গেটে লাথিও মেরেছে, তারপরও সে গেটটা খুলে দেয় নি। একটু আগে গেটের বাইরে পুলিশের দুটো গাড়ি এসে থেমেছে। সঙ্গে সঙ্গে ইয়াকুব বুঝতে পেরেছিলো, ঐ ফালু ছেলেটাকে এখানে ঢুকতে না দিলে আজ এতোকিছু হতো না। সাফিনার ভাই ছাড়াও ফালু তার বনধুও বটে, তাই ইয়াকুব তাকে লুকিয়ে থাকার জন্য ম্যাডামের অগোচরে বাড়িতে ঢুকতে দিয়েছে। ওকে খুঁজতে যে পুলিশ চলে আসবে সেটা জানলে এই কাজ কখনওই করতো না।

তার এই আক্ষেপটার স্থায়িত্ব ছিলো মাত্র কয়েক সেকেন্ডের। তারপরই দেখতে পায় দোতলার একটি ঘরে আগুন লেগে গেছে। নিমেষে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়লো পাশের

ঘরে। দেখতে দেখতে পুরো দোতলায়। বাড়ির দিকে ছুটে গেছিলো সে, কিন্তু সবগুলো দরজাই বন্ধ। কয়েকবার দরজা-জানালায় ধাক্কা মেরে কোনো সাড়া পায় নি। ঘটনা কি কিছুই বুঝতে না পেরে আবারো মেইনগেটের কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে। তার কোন ধারণাই নেই একটি নারীকণ্ঠের চিৎকার প্রকম্পিত করেছে চারপাশ।

হঠাৎ চোখের কোণ দিয়ে ডানদিকে কিছু একটা দেখতে পেয়ে চমকে তাকালো ইয়াকুব। দু-জন লোক পিস্তল হাতে ছুটে আসছে তার দিকে। আরেকজন সাদাপোশাকের লোক তখনও দেয়ালের উপরে। দু-জনের মধ্যে পুলিশের পোশাক পরা একজন আর অন্যজন সাদাপোশাকে। ইয়াকুব দু হাত তুলে কিছু বলার চেষ্টা করলেও শুধু গোঙানির মতো শব্দ করতে পারলো। তারপরই দু-জন মানুষ পিস্তল তাক করে তাকে মাটিতে বসে পড়ার জন্য হুকুম করলো। ওরা নিশ্চয়ই চিৎকার করে কিছু বলছে, কিন্তু বোবা শুধু ওদের ক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি দেখতে পেলো।

মাথার উপরে হাত তুলে হাটু গেড়ে বসে পড়লো দারোয়ান। পুলিশের পোশাক পরা একজন চিৎকার করে হাত নেড়ে চাবি চাইলে তার কাছে। দেরি করে কোমর থেকে চাবির গোছাটা বের করে পুলিশের হাতে দিয়ে দিলো সে। লোকটা দৌড়ে চলে গেলো মেইনগেটের দিকে। দ্রুত তালা খুলে টেনে গেটটা খুলে দিলো।

এসপি মনোয়ার, ওসি আর দু-জন কনস্টেবল হুরমুর করে ঢুকে পড়লো বাড়ির ভেতরে। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা দোতলা বাড়িটির দিকে তাকালো সবাই। বাড়ির সামনে যে লন আছে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো তারা, বুঝতে পারলো না কি করবে।

"স্যার, নীচতলায় এখনও আগুন ছড়ায়া পড়ে নাই," কথাটা বললো আনোয়ার। "ভিতরে গিয়া দেখুম?"

"জলদি করো, তাড়া দিয়ে বললো এসপি।

এসআই আনোয়ার লনটা পেরিয়ে গেলো বড় বড় পা ফেলে। তার পেছন পেছন ছুটলো ডিউটিতে থাকা দু-জন পুলিশ। তাদের সবার হাতে পিস্তল। আনোয়ার মূল ভবনের গেটটা ধাক্কা মেরে বুঝতে পারলো ওটা ভেতর থেকে বন্ধ। পাশের জানালার কপাটে ধাক্কা মারলো, ওটাও বন্ধ। এবার সে দরজায় লাথি মারলো কিন্তু কাজ হলো না। সেগুন কাঠের ভারি দরজা, কয়েকজন মানুষের পক্ষেও লাথি মেরে ভাঙা সম্ভব নয়।

আনোয়ার সাদাপোশাকের দু-জনকে বললো বাড়িটার পেছনে চলে যেতে, ওখানে কোনো দরজা খোলা আছে কিনা দেখতে। সঙ্গে সঙ্গে দু-জন পুলিশ চলে গেলো পেছন-বাড়িতে। আনোয়ার যখন আবারো লাথি মারতে যাবে দরজায় তখনই সেই চিৎকারটা ফিরে এলো আবার।

নারীকণ্ঠের আর্তনাদ।

এসপি মনোয়ার হোসেন বুঝতে পারলো এটা কার কণ্ঠ।

মুশকান জুবেরি!

"স্যার, কে চিল্লাইতাছে?" ওসি জানতে চাইলো তার কাছে।

"জানি না," মিথ্যে বললো সে।

"বাড়িতে আগুন দিলো কে?" বিড়বিড় করে বললো ওসি।

"হায় আল্লাহ, নুরে ছফা কোথায়?" এসপির মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলো কথাটা।

ওসি কোনো জবাব দিতে না পেরে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তারপরই গেটের দিকে নজর যেতে বলে উঠলো, "ঐ ব্যাটা দারোয়ানরে জিজ্ঞেস করি?"

"ও বোবা...কথা বলতে পারে না।"

এসপির দিকে ভুরু কুচকে তাকালো সুন্দরপুরের ওসি। মুশকান জুবেরির সাথে যে এসপির দারুণ সখ্যতা সেটা তারা ভালো করেই জানে। এখন দেখতে পাচ্ছে, এই বাড়ির অনেক খবরও এসপির জানা।

নারীকণ্ঠটা আবারো চিৎকার দিয়ে মাঝপথে থেমে গেলো। ভয়ের সাথেই তারা দেখতে পেলো দোতলার আগুন নীচতলায় ছড়িয়ে পড়ছে। বন্ধ জানালাগুলোর ফাঁকফোকর দিয়ে দেখা যাচ্ছে আগুনের শিখা।

"আরে ফায়ার সার্ভিসে খবর দিন, জলদি!" চিৎকার করে বললো। এসপি।

ওসি থতমত খেয়ে মোবাইলফোনটা বের করলো। "ওরা আসতে আসতে তো পুরা বাড়ি পুইড়া ছাই হইয়া যাইবো, স্যার," নাম্বারটা ডায়াল করে কানে চাপালো ওসি।

এসপিও এটা জানে। আশেপাশে সবচেয়ে নিকটে যে ফায়ার সার্ভিসের ডিপো আছে সেটা প্রায় ত্রিশমাইল দূরে। কিন্তু দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে তাদের খবর দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায়ও নেই। মনোয়ার হোসেন চোখ কুচকে তাকিয়ে রইলো বাড়িটার দিকে। নুরে ছফার পরিণতি নিয়ে সে ভীষণ চিন্তিত। এসআই আনোয়ার যে বোকার মতো বাড়িটার সদর-দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেটা দেখে আরো হতাশ হলো। সম্ভবত উপরতলায় নুরে ছফা আছে, আর তার পরিণতিটা কি সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই আগুন নেভানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কেউ ভেতরে ঢুকে পড়লেও লাভ হবে না, তাতে কেবল হতাহতের সংখ্যা বাড়বে।

একটা গোঙানির শব্দ শুনে পেছন ফিরে তাকালো এসপি আর ওসি। মেইনগেটের কাছে বোবা দারোয়ান ছোটার জন্য হাসফাস করছে। তাকে দু দিক থেকে শক্ত করে ধরে রেখেছে দু-জন কনস্টেবল।

"কি হইছে," ফায়ার সার্ভিসকে খবরটা দিয়ে ফোন নামিয়ে বললো ওসি।

“স্যার, হে তো বাড়ির দিকে ছুঁইটা যাইতে চাইতাছে,” একজন কনস্টেবল জবাব দিলো। বোবাকে ধরে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে তারা।

“পাগল হইছে নি…ও কি দেখতাছে না বাড়িটাতে আগুন লাগছে.” বিরক্তমুখে বলে ফোনটা পকেটে রেখে দিলো সে। “আপনে তো কইলেন বোবা, এখন তো দেখতাছি চোখেও দেখে না। পুরাই আন্ধা!” এসপির দিকে ফিরে বললো ওসি।

ঠিক এ-সময় নারীকণ্ঠের একটি চিৎকার ভেসে এলো। “মাগো লাগে; বাবাগো! বাঁচাও! বাঁচাও!” তবে সেটা দোতলা থেকে নয়, নীচতলা থেকে! এবারের চিৎকারটাও ভিন্ন রকম!

এমন সময় পেছন-বাড়ি থেকে দৌড়ে এলো দু-জন কনস্টেবল। “সব গেট বন্ধ! বাড়ির পেছনে কেউ নাই!” তাদের মধ্যে একজন চিৎকার করে বলে উঠলো।

“স্যার!” সদর দরজার সামনে থেকে পেছন ফিরে চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো এসআই আনোয়ার। “নীচতলায় কেউ আছে?”

এসপি আর ওসি নড়েচড়ে উঠলো।

“ওরে বলো দরজা ভিতর থেইকা খুইলা বাইর হইয়া আসতে!” ঝপটপ বললো ওসি।

দ্রুত মাথা নেড়ে সায় দিয়েই আনোয়ার বলে উঠলো, “ভিতর থেইকা দরজা খুইলা বাইর হন…জলদি!”।

নারীকণ্ঠের চিৎকারটা বিরামহীনভাবেই হচ্ছে। যেনো উন্মাদ হয়ে গেছে কেউ। থামছেই না। কয়েক সেকেন্ড পরই ভেতর থেকে দরজাটা খুলে গেলে বীভৎস দৃশ্য দেখা গেলো। গায়ে জবুথুবু করে শাড়ি জড়িয়ে এক তরুণী দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। তার শাড়ির আঁচলের অগ্রভাগে এখনও আগুন জ্বলছে। তার হাত-মুখ-পা ঝলসে গেছে আগুনে। শাড়িটাও পুড়ে গেছে জায়গায় জায়গায়। মাথার চুলগুলো আগুনের লেলিহান শিখার

স্পর্শে এসে কেমন কুঁকড়ে গেছে। তবে সবচাইতে ভয়ঙ্করভাবে ঝলসে গেছে মেয়েটির মুখ। সেটা দেখে চেনার উপায় নেই। মাংস আর পোড়া চামড়া লেপ্টে আছে যেনো মুখে! সম্ভবত মেয়েটার মাথায় আঘাত করা হয়েছে। মাথার চুল আর সারামুখ রক্তে ভিজে একাকার।

"আমারে বাঁচান! আমারে বাঁচান! ঐ ডাইনি আমারে শ্যাষ কইরা দিছে!" মেয়েটি উদভ্রান্তের মতো বলতে লাগলো। আমার সারাশরীর জ্বলতাছে! মাগো-বাবাগো!" গগনবিদারি আহাজারি করতে লাগলো সে।

এসআই আনোয়ার মেয়েটার একহাত ধরে তাকে কিছু বলতে যাবে অমনি মেইনগেট থেকে তীব্র একটা গোঙানি দিয়ে মেয়েটার দিকে ছুটে আসতে লাগলো বোবা দারোয়ান। দু-জন কনস্টেবল তাকে আর ধরে রাখতে পারে নি।

এসপি মনোয়ার হোসেন আর ওসি ঝটপট ঘুরে দাঁড়ালো। ওসি দু-হাতে বোবা ছেলেটাকে জাপটে ধরে ফেললেও তাকে ধরে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে কনস্টেবল দু-জন ছুটে এসে বোবাকে জাপটে ধরে মাটিতে শুইয়ে দিলো।

"এই শালার কি মাথা খারাপ হইছে?" ওসি অবাক হয়ে বললো।

"ওরে আমর কাছে আইতে দিয়েন না! আমারে হাসপাতালে নিয়া যান। আল্লার দোহাই লাগে, আমারে হাসপাতালে নিয়া যান?" চিৎকার করে বলতে লাগলো ঝলসে যাওয়া তরুণী। "আমারে বাঁচান! আমারে বাঁচান!"

আগুনে পোড়া মেয়েটির আর্তনাদ উপস্থিত সবাইকে স্পর্শ করলো।

"মেয়েটাকে এক্ষুণি হাসপাতালে নিয়ে যান। দেরি করলে বাঁচবে না!" মনোয়ার হোসেন আদেশের সুরে বললো ওসিকে।

“জি, স্যার,” ওসি দ্রুত মাথা নেড়ে সায় দিয়ে আনোয়ারের উদ্দেশ্যে জোরে বললো, “ওরে বাইরে নিয়া আসো। এক্ষুণি হাসপাতালে পাঠাইতে হইবো।” কথাটা বলেই সে মেইনগেটের দিকে পা বাড়ালো।

আনোয়ার মেয়েটার একহাত ধরে তাকে মেইনগেটের দিকে নিয়ে যেতে লাগলো। ঝলসে যাওয়া তরুণীকে দেখে মনে হচ্ছে সে চোখে কিছু। দেখছে না। এসপি জানে, এই বাড়ির কাজের মেয়েটি রাতকানা রোগে ভুগছে। বেচারি গরীবঘরের মেয়েটির জন্য তার খুব মায়া হলো। “ঐ ডাইনি সব জ্বালায়া দিছে! সব শ্যাষ কইরা দিছে! এক বেটারেও মারছে! আমারেও পুড়াইয়া মারতে চাইছিলো!” মেইনগেটের দিকে যেতে যেতে বললো আগুনে পুড়ে যাওয়া মেয়েটি।

বোবা ইয়াকুব মেয়েটাকে চলে যেতে দেখে পাগলের মতো ছটফট করছে কিনতু তার উপরে চেপে বসা দু-জন কনস্টেবলের হাত থেকে ছাড়াতে পারছে নানিজেকে জবাই করা পশুর মতো গোঙানি দিচ্ছে মুখ দিয়ে।

“ও নিজেও মরছে, সবাইরে মারছে!” মেইনগেটের সামনে এসে পেছন ফিরে অদৃশ্য কারোর উদ্দেশ্যে বললো মেয়েটি। যে হাতটা মুক্ত সেটা উদভ্রান্তের মতো নাড়ছে। “আল্লাগো! আমার সব শ্যাষ কইরা দিছে?”

এসপির চোখমুখ তিক্ততায় কুচকে গেলো। অভাবে পড়ে মানুষের বাড়িতে কাজ করে এইসব মেয়ে, আর তাদের সাথে শেষ পর্যন্ত কী জঘন্য আচরণটাই করা হয়! মেয়েটা যেভাবে পুড়েছে তাতে মনে হচ্ছে না সে বাঁচতে পারবে।

কিছুক্ষণ পরই ওসিকে সঙ্গে নিয়ে এসআই আনোয়ার ফিরে এলো বাড়ির ভেতরে।

“স্যার, থানার জিপে কইরা মেয়েটাকে হাসপাতালে পাঠায়া দিছি,” ওসি রিপোর্ট করলো।

মাথা নেড়ে সায় দিলো এসপি। "এখন কি করবো, স্যার?" ওসি কিছু বুঝতে না পেরে বললো।

"আমিও তো কিছুই বুঝতে পারতাছি না, নিজের অপারগতা না দেখিয়ে পারলো না মনোয়ার হোসেন।

পুরো বাড়িটা এখন নরককুণ্ড হয়ে জ্বলছে। রাতের আকাশ লালচে আলোয় আলোকিত। রীতিমতো গমগম শব্দ করে সবকিছু গিলে খাচ্ছে। আগুনের শিখাগুলো। যতোই খাচ্ছে ততোই যেনো বাড়ন্ত হচ্ছে।

"বাড়ির ভিতরে তো যাওন যাইবো না...সবখানে আগুন, বাড়ির দিকে চেয়ে বললো সুন্দরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো এসপি। "নুরে ছফার কী হলো কে জানে!"

মুখ ফুটে কিছু না বললেও সুন্দরপুর থানার ওসি জানে ডিবির ঐ ইনভেস্টিগেটরের পরিণতিটা। মুশকান জুবেরি নিজেও বেঁচে নেই। মহিলা শেষপর্যন্ত আত্মঘাতিনী হয়েছে। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে নিজেকে শেষ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বেচারা নুরে ছফা সম্ভবত ঘুণাক্ষরেও টের পায় নি এই মহিলা এরকম কিছু করতে পারে।

এতোক্ষণে আশেপাশের অনেক উৎসুক মানুষ মেইনগেটের সামনে এসে জড়ো হয়ে দেখছে আগুন কিভাবে জ্বলন্ত চিতা বানিয়ে ফেলেছে জমিদার বাড়িটাকে।

ওসি পেছন ফিরে দেখলো মেইনগেটের সামনে জড়ো হওয়া মানুষজন আস্তে আস্তে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ছে। "অ্যাই! বাড়ির বাইরে যাও! কেউ বাড়িতে ঢুকবে না!" চিৎকার করে বললো সে। "কেউ না!"

গ্রামের লোকজন কয়েক পা পিছু হটে গেলেও তাদের আগ্রহ মোটেও পিছটান দিলো না।

ফোনের রিং বেজে উঠলে এসপি মনোয়ার হোসেন চমকে বাড়ি থেকে চোখ সরিয়ে নিলো। পকেট থেকে ফোনটা বের করে দেখতেই দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার মুখ দিয়ে। “হ্যালো...” ওপাশ থেকে ছফার সহকারি জাওয়াদের উদ্বিগ্ন কণ্ঠটা শুনতে পেলো সে। “হুম...” চোখ বন্ধ করে মাথা নেড়ে সায় দিলো। “...আমরা সবাই সঙ্গে সঙ্গেই বাড়িতে চলে এসেছি... বাড়িটা এখন আগুনে জ্বলছে, সম্ভবত মুশকান জুবেরি আর নুরে ছফা বাড়ির ভেতরেই আছে...” আবারো মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। “...ভেতরে যদি থেকে থাকে তাহলে মনে হয় না, কেউ বেঁচে আছে।”

এমন সময় একটা হৈহল্লা শুনে কানে ফোন চেপে রেখেই সেদিকে তাকালো এসপি। বোবা ছেলেটা দৌড়ে চলে যাচ্ছে বাড়িটার দিকে। তাকে যারা ধরে রেখেছিলো তারা কিছুটা সামনে বেড়েই থমকে দাঁড়ালো। কোন্ ফাঁকে যে তাদের হাত থেকে ছুটে গেছে টেরই পায় নি।

দারোয়ান ছেলেটি নীচতলার সদর-দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লো ভেতরে। যেনো জ্বলন্ত নরকের ভেতর ঢুকে গেলো সে।

“পাগল নাকি!” ওসি আবারো কথাটা বললো।

এসপি মনোয়ার হোসেন কানে ফোনটা চেপেই ওসির পাশে এসে দাঁড়ালো বোবার এমন আচরণে সেও অবাক। “...ঐ বাড়ির দারোয়ান... বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছে...হুম... মাথা খারাপ হয়ে গেছে মনে হয়।” ওপাশে জাওয়াদের কথা শুনে আক্ষেপে মাথা দোলালো এসপি। “ধারেকাছে কোথাও ফায়ার সার্ভিস নেই..তারপরও আমি খবর দিয়েছি ওদের... না, না...দোতলা থেকে আগুন লেগেছে...যেভাবে জ্বলছে বাইরে থেকে পানি দিয়ে নেভানোর চেষ্টা করলেও কাজ হতো না।” আরো কিছুক্ষণ কথা শুনে ফোনটা কান থেকে সরিয়ে ফেললো সে।

"বাড়িটা ভাইঙ্গা পড়তে পারে, স্যার," ওসি বললো মনোয়ার হোসেনের দিকে তাকিয়ে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পকেটে ফোনটা রেখে দিলো ভদ্রলোক। আগুনের সর্বগ্রাসি রূপ দেখে তার মনে হচ্ছে নুরে ছফার লাশটাও খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

বাড়িটার সামনে থেকে সবাই একটু একটু করে পিছিয়ে গেলো। আগুনের উত্তাপ ক্রমশ চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। ভবনের সামনে পার্ক করে রাখা প্রাইভেটকারটি কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুনের গ্রাসে চলে যাবে। এসপি মনোয়ার হোসেন আগুনের উত্তাপ থেকে বাঁচার জন্য কয়েক পা পিছিয়ে গেলো।

"বোবা পোলাটা মনে হয় আটকা পইড়া গেছে," ওসি বললো।

মাথা নেড়ে সায় দিলো এসপি। ছেলেটা কী মনে করে বাড়ির ভেতরে ঢুকলো কে জানে। ভেতরে তার কোনো মূল্যবান জিনিস ছিলো? নাকি মুশকান জুবেরিকে উদ্ধার করার জন্য?

ঠিক তখনই জ্বলতে থাকা বাড়ির নীচতলা থেকে গোঙানি শোনা গেলো। কণ্ঠটা নিশ্চয় কোনো পুরুষ মানুষের। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই কপাট খুলে রাখা সদর-দরজা দিয়ে দৌড়ে বের হয়ে এলো বোবা। আগুনের হাত থেকে বাঁচার জন্য গায়ে মোটা একটা কম্বল জড়িয়ে রেখেছে সে। বোঝা যাচ্ছে তার কোলে অচেতন এক নারী! বোবা ছেলেটি বাড়ির সামনে লনের উপর মেয়েটিকে নামিয়ে রেখে হাত নেড়ে গোঙাতে গোঙাতে কী সব বলতে লাগলো। মেয়েটার শরীর অনেকটাই নগ্ন, শুধুমাত্র পেটিকোট আর ব্লাউজ আছে গায়ে। তবে তার শরীরে আগুনে পোড়ার কোনো চিহ্ন নেই!

আশপাশ থেকে পুলিশ সদস্যরা ছুটে এলো। সুন্দরপুরের ওসিও পা বাড়ালো সেদিকে, তারপর কি মনে করে থমকে দাঁড়ালো। পেছনে ফিরে দেখলো এসপি মনোয়ার হোসেন বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে অচেতন মেয়েটির দিকে।

"কি হইছে, স্যার?"

“এটা তো মুশকান জুবেরি না!”

একটু ভিরমি খেলো ওসি। “কি!” তারপর ঢোক গিলে বললো, “তাইলে ওইটা কে ছিলো?”

.

অধ্যায় ৪২

সুন্দরপুর থানার ওসির জিপটা এখন মহাসড়ক ধরে ছুটে চলেছে। রাস্তায় খুব কমই যানবাহন আছে, গতি বাড়াতে দ্বিতীয় চিন্তা করতে হচ্ছে না ড্রাইভারকে। যদিও পেছনের সিট থেকে আগুনে দগ্ধ মেয়েটির আর্তনাদ আর যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে না এখন।

একটু আগেও ঝলসে যাওয়া মেয়েটি আর্তনাদ করতে করতে সিটের উপরে ছটফট করছিলো। তার এই যন্ত্রণাকাতর গোঙানি পুলিশের ড্রাইভারকে বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালাতে তাগিদ দিচ্ছিলো যেনো। লোকটা ভেবে পাচ্ছিলো না দগ্ধ মেয়েটির সাথে জঘন্য এই কাজটা করেছে আরেকজন নারী! সেই মহিলা আবার বেশ শিক্ষিত।

গাড়িটা যখন রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে সুন্দরপুর টাউন পার হয়ে সদর হাসপাতালের দিকে ছুটে যাচ্ছিলো তখন হঠাৎ করেই কাতরানোর শব্দ থেমে যায়। ড্রাইভার হয়তো মনে করে থাকবে আহত মেয়েটি মারা গেছে, তাই উৎসুক হয়ে পেছন ফিরে যে-ই না দেখতে যাবে অমনি সে তার জীবনে সবচেয়ে বড় ভয়টি পায়। সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। ছোটোবেলা থেকে শোনা সবগুলো ভুতের গল্পকে হার মানিয়ে দেবার জন্যই হয়তো বা পেছনের সিটে আগুনে পোড়া মেয়েটি তার দিকে পিস্তল তাক করে রাখে!

“রাস্তার পাশে গাড়ি থামাও!” বেশ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে ওঠে আগুনে। ঝলসে যাওয়া মুখটি। তার উচ্চারণে গ্রামটান নেই! “একদম নড়বে না। যা বলি তাই করবে, নইলে গুলি করবো।”

মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিলো না বেচারা ড্রাইভার। হতবুদ্ধিকর এক ঘোরের মধ্যেই গাড়ির গতি কমিয়ে দেয় সে। আস্তে করে রাস্তার পাশে ওটা থামাতেই তার মনে হয় এই রাতে নির্জন রাস্তায় ভুতের খপ্পরে পড়েছে। সে। ভুতটা ভর করেছে এইমাত্র মরে যাওয়া মেয়েটির উপরে! কিন্তু সে ভেবে পাচ্ছিলো না ভুতটার হাতে পিস্তল এলো কিভাবে।

পিস্তলের মুখে জিপ থেকে নেমে পড়ে সে। তারপর ভূতটার নির্দেশমতো ঘুরে দাঁড়ায় দু-হাত তুলে। কয়েক মুহূর্ত পরই শুনতে পায় গাড়িটা শব্দ করে চলে যাচ্ছে। পেছন ফিরে হতবাক হয়ে দেখতে পায় প্রচণ্ড গতিতে চলে যাচ্ছে ওটা।

রিয়ার-মিররে ড্রাইভারের হতভম্ব হওয়া চেহারাটা দেখে মুচকি হেসেছিলো মুশকান জুবেরি। আমেরিকায় গিয়ে ষোলো বছর বয়সেই ড্রাইভিং শিখেছিলো। আঠারো পেরোবার পর মেডিকেল কলেজে ভর্তির সময় থেকে নিজেই গাড়ি চালিয়ে ক্যাম্পাসে যেতো। ড্রাইভিংয়ের নেশা আজো ছাড়তে পারে নি।

একহাতে দুইলটা ধরে অন্যহাত দিয়ে মুখের উপর থেকে রাবারের মতো শক্ত হয়ে যাওয়া ফেসিয়াল প্যাকের আস্তরণটি টেনে টেনে খুলে ফেললো। তার সুন্দর চুলগুলো কেমন কুঁকড়ে আছে, ফুলেফেঁপে রয়েছে। ভালো করে ধুলে ওগুলো আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। পিস্তলটা পাশের সিটের উপরে রেখে দিলো। জিনিসটা ছফার কাছ থেকে নিয়েছে। গায়ে। জড়ানো শাড়িটার কিছু করলো না। তার পেটে বেল্ট দিয়ে একটা ছোট্ট প্যাকেট বাঁধা আছে, ওটাতে আছে একসেট সালোয়ার-কামিজ, মোবাইলফোন আর কিছু টাকা।

বাঁকাহাসি ফুটে উঠলো মুশকানের ঠোঁটে। খুব বেশি সময় পায় নি প্রস্তুতি নেবার জন্য। বিকেলের পরই সে বুঝে যায় ঐ নুরে ছফা পুলিশের লোক হতে পারে। যে-ই সেই পুলিশ নয়, অনেক ক্ষমতাধর একজন পুলিশ। বাড়ির বাইরে সাদাপোশাকে দু-জন লোকের আগমন, ওসি-এসপি-এমপি তার ফোন না ধরার একটাই মানে ছিলো তার কাছে।

কি হতে যাচ্ছে সেটা যখন বুঝতে পারলো তারপর আর বেশি সময় নষ্ট করে নি। গভীর করে দম নিয়ে নিজেকে আগে প্রসতুত করে নেয়। গ্লাসে অল্প একটু রেডওয়াইন ঢেলে শান্ত হয়ে পান করতে বসে। গ্লাসটা খালি হবার আগেই একটি পরিকল্পনা করে ফেলে সে। কি কি করতে হবে মনে মনে ঠিক করে নিয়ে দ্রুত কাজে নেমে পড়ে। তার মধ্যে হয়তো একটু অস্থিরতা ছিলো, একটু উদ্বিগ্নতাও থেকে থাকবে কিন্তু সে নিশ্চিত ছিলো তার পরিকল্পনা সফল হবে। কঠিন পরিস্থিতিতে ভেঙে পড়ার মতো নার্ভ তার নেই। ওটা অনেক আগেই ভেঙেচুড়ে একদম নিঃশেষ হয়ে আবার নতুন করে জন্ম নিয়েছে। তার মনে হয় না এ দুনিয়াতে এমন কোনো কঠিন। পরিস্থিতি আছে যা তাকে ভেঙে ফেলতে পারে।

প্রথমেই মিউজিক প্লেয়ারের ভয়েস রেকর্ডারে একটি আর্তচিৎকার রেকর্ড করে। বেশি না, পর পর দু-বারই যথেষ্ট ছিলো। ফাইলটা কপি করে নেয় আরো কয়েকবার। ওটা শেষ করে দীর্ঘদিন ধরে আগলে রাখা পেপার ক্লিপিংসের অ্যালবামটা নিয়ে কাজে নেমে পড়ে।

আরব্য-রজনীর সেই কাহিনীর মতোই নুরে ছফা পেপার-ক্লিপিংসের অ্যালবামের পৃষ্ঠা ওল্টানোর জন্য ডানহাতের তর্জনী বার বার জিভে লাগিয়ে ভিজিয়ে নিয়েছে আর নিজের অজ্ঞাতসারে শরীরে প্রবেশ করিয়েছে নার্ভ সিস্টেম বিকল করে দেয়ার মতো শক্তিশালী একটি ড্রাগস। একটু শক্তিশালী ডোজ ব্যবহার করতে হয়েছে তাকে। তার হিসেবে ছিলো তর্জনীতে লেগে থাকা ড্রাগস যেনো কমপক্ষে তিনবার জিভে স্পর্শ করতেই কাজ শুরু করে। বেশ রোমাঞ্চকর ছিলো ব্যাপারটা, কিছুটা নাটকীয়ও।

এই ড্রাগসটি প্রথমে পা দুটো অসাড় করে দেয়। ছফা সম্ভবত এটা টের পেলেও মনে করেছিলো তার পায়ে ঝি-ঝি ধরেছে। কিছুক্ষণ বসে থাকলে এটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। পা থেকে ওটা যখন হাতে গিয়ে পৌঁছায় তখন ছফার টের পাবার কথা ছিলো কিন্তু সে ডুবে গেছিলো আন্দিজের কাহিনীতে। অবশেষে তার মুখটাও যখন বন্ধ হয়ে গেলো তখন আর কিছুই করার ছিলো না। মুশকান জানে, ঐ সময়ে ছফার চিন্তা-ভাবনাগুলোও বেশ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলো-পুরোপুরি অচেতন হবার আগে এমনটিই হবার কথা।

এরপর ঘরে থাকা অনেকগুলো ফেসিয়াল-প্যাক থেকে একটি প্যাক নিয়ে কাজে নেমে পড়ে। পুরো একটি টিউব ব্যবহার করে হাতে-মুখে-পায়ে আর গলার নীচে মেখে নেয়। প্যাকের অবশিষ্ট আঠালো তরল মেখে নেয় চুলে। এলোমেলো আর বিতস্ত্র করে ফেলে তার সুন্দর রেশমি চুলগুলো। ফেসিয়াল প্যাক দ্রুত শুকিয়ে গেলে আয়নায় দেখে সন্তুষ্ট হয় সে। আগুনে ঝলসে যাওয়া ভিক্টিমদেরও এরচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর লাগে না!

ছফাকে নিয়ে কি করবে সেটা আগে থেকে ঠিক করে রাখে নি। সে শুধু চেয়েছিলো লোকটাকে অচেতন করে ফেলতে। তবে তার বাড়িতে ফালুর লুকিয়ে থাকাটা বাড়তি সুবিধা এনে দেয়। গোরখোদককে পালাতে সাহায্য করা হবে এই আশ্বাসে তাকে দিয়ে ছোট্ট একটা কাজ করিয়ে নেয়। তার ধারণা পুলিশ এটা দ্রুতই আবিষ্কার করবে।

এরপর ফালুকে পালানোর সুযোগ করে দেয়। ছেলেটাকে বলে দিয়েছে। জোড়পুকুরের দক্ষিণে যে ভাঙা মন্দিরটা আছে, ওটার সামনের দিকে জলাশয় দিয়ে সাবধানে সাঁতরে গেলে সে এখান থেকে পালাতে পারবে।

নীচে নামার সময় দোতলার ল্যান্ডিংয়ে সাফিনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। রাতের বেলায় কিছু দেখতে পায় না, তাই কান পেতে সব কিছু বোঝার চেষ্টা করছিলো। তার সৎভাই ফালুর সাথে কি করা হচ্ছে সেই কৌতূহল চেপে রাখতে পারে নি। তাকে ল্যান্ডিংয়ে দেখতে পেয়েই মুশকান সতর্ক শিকারী পশুর মতো নিঃশব্দ হয়ে যায়। তারপরও মেয়েটা কিভাবে যেনো টের পেয়ে ঘুরে দাঁড়ায়, রেলিং ধরে তড়িঘড়ি নীচে নামতে শুরু করে। ঠিক তখনই পেছন থেকে মেয়েটার মুখে ক্লোরোফর্মের রুমাল চেপে ধরে। তাকে অচেতন করে নীচতলার ভেতরের দিকে একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে গা থেকে শাড়িটা খুলে ফেলে। সে চায় নি আসন্ন জ্বালাও-পোড়াওয়ের মধ্যে পড়ে মেয়েটার কোনো ক্ষতি হোক। সম্ভবত মেয়েটা অক্ষতই আছে।

বোবা ইয়াকুব আরেকটুর জন্য সমস্যা বাঁধিয়ে দিতো। আর কেউ না চিনুক তাকে ওভাবে দেখেও ইয়াকুব ঠিকই চিনতে পেরেছিলো। সেটাই স্বাভাবিক। দিনের পর দিন যে

শরীরটা ভোগ করতো সেটা অন্য যে কারোর চেয়ে তার কাছে বেশিই চেনা। সুতরাং বোবাকে ধোঁকা দিতে পারে নি। পুলিশের কারণে সে কিছু করতেও পারে নি। তাকে মাটিতে ফেলে দু-দুজন মানুষ চেপে ধরে রেখেছিলো।

নীচতলা দিয়ে বের হবার আগে শেষবারের মতো দোতলায় যায় সে আগুন লাগাতে। মুশকানের জন্য সবচেয়ে কঠিন কাজ ছিলো এটাই। কাঠের মেঝে আর সিঁড়ি, বাড়িতে প্রচুর কাঠের আসবাব, গ্যাস-বার্নার আর অ্যালকোহলের কারণে আগুন ধরানোটা এমন কোনো ব্যাপার ছিলো না কিন্তু বাড়িটার প্রতি মায়া জন্মে গেছিলো তার। এই কয়েক বছরে বাড়িটা সত্যিকার অর্থেই ঠিকানা হয়ে উঠেছিলো তার। নিজের ঠিকানা ধ্বংস করা মোটেও সহজ কাজ নয়। তারপরও সেটা করতে হয়েছে। আর এটা করতে গিয়ে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসেছিলো ভেতর থেকে। সে বুঝতে পারছিলো, এই জীবনে আর স্থায়ি ঠিকানা বলে কিছু থাকবে না। আন্দিজের পর থেকে সে থিতু হতে পারে নি। অনেক চেষ্টা করেছে, আমেরিকা ছেড়ে চলে এসেছে। ঢাকায়, তারপরও সে টিকতে পারে নি। সুন্দরপুরও তার জন্য শেষ পর্যন্ত আরেকটি ফেলে আসা অধ্যায় হয়ে গেলো।

সব প্রস্তুতি শেষে সাফিনার শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে নেবার পর তার প্রিয় রেডওয়াইনের একটি বোতল নিয়ে ঢক ঢক করে কিছুটা পান করে, বাকিটুকু ঢেলে দেয় মাথায়। রক্তসদৃশ্য রেডওয়াইন মাথা থেকে সারামুখে ছড়িয়ে পড়ে। তারপরই গভীর করে দম নিয়ে নীচতলায় নেমে যায় চিৎকার দিতে দিতে। গ্রামটানে তার চিৎকার সবাইকে আরেকবার ধোঁকা দিতে সক্ষম হয়।

মুশকান ভেবেছিলো তাকে গাড়িতে করে হাসপাতালে নিতে কমপক্ষে দু জন পুলিশ থাকবে গাড়িতে, কিন্তু তা হয় নি। মাত্র একজন ড্রাইভারকে কায় নেয়া এমন কোনো কঠিন কাজ নয়, বিশেষ করে গুলিভর্তি পিস্তল হাতে থাকলে।

রাস্তার পাশে একটা ঝুপড়ির পাশে জিপটা থামালো সে। সুন্দরপুর থেকে গাড়ি চালিয়ে অসংখ্যবার এ পথ দিয়ে ঢাকায় গেছে। পথের দু-ধারে সবই তার চেনা। এই ঘরটি কাঠ

কিংবা এরকম কিছু রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়। এখন ওটা বন্ধ। চারপাশে কোনো প্রাণীর চিহ্ন নেই। পিস্তলটা হাতে নিয়ে জিপ থেকে নেমে পড়লো। ঝুপড়িটার পেছনে একটা ডোবা আছে। জায়গাটা বেছে নেবার দুটো কারণের মধ্যে এটা অন্যতম। ঝুপড়ি ঘরটার পেছনে গিয়ে শরীর থেকে শাড়িটা খুলে ফেললো। অন্ধকারেই নেমে পড়লো ডোবায়। শীতের এমন রাতে তীব্র ঠাণ্ডা পানি তাকে বিন্দুমাত্র কাবু করতে পারলো না। এরচয়েও বেশি ঠাণ্ডায় বেঁচে ছিলো, একদিন নয় দুদিন নয় প্রায় আড়াই মাস।

বুক সমান পানিতে নেমেই কয়েকবার ডুব দিলো নগ্ন মুশকান। এখন যদি নির্জন এই রাতে কেউ তাকে দেখেও ফেলে ভুত-প্রেত ছাড়া আর কিছু ভাববে না।

হাত-মুখ আর শরীর থেকে ফেসিয়াল-প্যাকগুলো ঘষে ঘষে মুছে ফেলার চেষ্টা করলো। কিছুক্ষণ পর ডোবা থেকে উঠে দ্রুত পরে নিলো সালোয়ার কামিজ। জিপে উঠে বসলো আবারো, তবে এই গাড়িটা বেশিক্ষণ ব্যবহার করতে পারবে না, তাকে খুব দ্রুত এটা পরিত্যাগ করতে হবে।

গাড়ির হুইল ধরে রাস্তার দিকে চোখ রেখে একটু ভেবে নিলো মুশকান। এ-মুহূর্ত যাবার মতো একটা ঠিকানাই আছে। আর সেটা অন্য একটি জরুরি কাজ করার জন্যেও উপযুক্ত জায়গা।

.

অধ্যায় ৪৩

সুন্দরপুরের জমিদার বাড়িটি চিতার মতোই জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে গেছে। খবর পাবার চল্লিশ মিনিট পর ফায়ারসার্ভিসের একটা গাড়ি চলে এলেও ততোক্ষণে পুরো বাড়িটিতে আগুন এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, দুটো হোস পাইপ দিয়ে আগুন নেভানোটা বালখিল্য

বলেই মনে হয়েছে স্বয়ং ফায়ারম্যানদের কাছে। বলতে গেলে সারারাত ধরেই আগুন জ্বলেছে, আর সেই দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে অল্প কিছু মানুষ।

রাতকানা মেয়েটিকে বাড়ির বাইরে নিয়ে আসার কিছুক্ষণ পরই তার জ্ঞান ফেরে। সে যা বললো, তা শুনে এসপি মনোয়ার এবং থানার ওসি হতভম্ব। তাদের সামনে দিয়ে, তাদের চোখে ধুলো দিয়ে, রীতিমতো বোকা বানিয়ে মুশকান জুবেরি সটকে পড়েছে। আর তাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে স্বয়ং পুলিশ!

থানার যে গাড়িটা করে মিসেস জুবেরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো সেই গাড়ির ড্রাইভার আধঘন্টা পর এসে জানায় কি ঘটনা ঘটে গেছে। মনোয়ার হোসেন সব শুনে হতবাক হয়ে থাকে বেশ কয়েক মিনিট। আগুনে পুড়ে ঝলসে যাওয়া একজন মহিলা কিভাবে এটা করতে পারলো? তার তো বেঁচে থাকা নিয়েই সন্দেহ ছিলো। ড্রাইভার অবশ্য জানতে না পোড়া মেয়েটিই মুশকান জুবেরি। এসপি আর ওসি যখন তাকে এটা বললো সে চুপ মেরে গেলো। পুরো ব্যাপারটাই পুলিশের কাছে রহস্যময়। তারা এর কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পেলো না। মুশকান জুবেরি কিভাবে আগুনে পোড়ার ধোঁকা দিতে পারলো সেটা মাথায় ঢুকছে না।

রাত দুটোর দিকে ব্যর্থমনোরথে নিজের কোয়ার্টারে ফিরে আসে এসপি। আর সুন্দরপুরের ওসি তার লোকজন নিয়ে নেমে পড়ে বাড়িটার আশেপাশে তল্লাশীর কাজে। দু-জন কনস্টেবলকে মেইনগেটে পাহারায় বসিয়ে দেয়। দোতলা বাড়িটি ভেতর থেকে ভেঙে পড়লেও সম্মুভাগটি তখনও দাঁড়িয়ে ছিলো। আগুনের শিখা নিভে গেলেও ছাইচাপা আগুন জ্বলেছে ভোর পর্যন্ত। ভোরের আজান যখন ভেসে আসছিলো দুরের কোনো মসজিদ থেকে তখনই একটা ঘটনা ঘটে বাড়ির পেছনে বাগানে। ঐ সময় পুলিশের লোজন জোড়পুকুর পাড়ের পাশে জলাশয়ের মধ্যে কুমিরগুলো খুঁজে পেয়েছে মাত্র। বিশাল জলাশয়ের একটি অংশ কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে আলাদা করা। তার মধ্যেই বিচরণ করতে দেখে বেশ কয়েকটি কুমিরের বাচ্চাকে। এটা নিয়ে সবাই যখন ব্যস্ত ঠিক তখনই এক

কনস্টেবল চিৎকার করে ওঠে বাড়ির পেছনে থাকা ঔষধি বাগান থেকে। ওসি নিজে পড়িমরি করে তার লোকজন নিয়ে ছুটে যায় সেখানে। তারা গিয়ে দেখতে পায় বাগানের একটা ঝোপের আড়ালে ঘাসের উপরে ভারি কম্বলে ঢাকা একটি লাশ! মুখটা দেখেই ওসি চিনতে পারে, এটা নুরে ছফা। তার শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্নই নেই, একেবারে অক্ষত। যেনো ঘুমিয়ে আছে।

এসআই আনোয়ারই প্রথম খেয়াল করে ছফার বুক ওঠানামা করছে। মৃদু। সঙ্গে সঙ্গে ডিবির এই কর্মকর্তাকে পুলিশের গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হয় সদর হাসপাতালে। এসপিকে ঘুম থেকে জাগিয়ে ফোন করে এ ঘটনা জানানো হয়। কথাটা শুনে মনোয়ার হোসেন যতোটা না বিস্মিত হয়। তারচেয়েও বেশি হাফ ছেড়ে বাঁচে। তাহলে নুরে ছফা আগুনে পুড়ে মারা যায় নি। তাকে জীবিত উদ্ধারের কথা বলতে হবে এখন, আর এটাই তাদের মুখ। কিছুটা রক্ষা করবে।

সঙ্গে সঙ্গে ওসিকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে দেয় এসপি। ওসিও এটাই চাইছিলো। তাকেও তো কিছু করে দেখাতে হবে। মুশকান জুবেরি তাদের সামনে দিয়ে, তাদেরই সহায়তায় পালিয়ে গেছে-এই ব্যর্থতা ঢেকে ফেলতে হবে। সুতরাং পুলিশ তাদের রিপোর্টে জানালো, ছফাকে নীচতলার বাড়ির ভেতর থেকে অক্ষত উদ্ধার করা হয়েছে। এ কাজ করতে গিয়ে ওসি আর এসআই আনোয়ার জীবনের ঝুঁকি নিতেও কুণ্ঠিত ছিলো না। স্বয়ং এসপিসাহেবের যোগ্য নেতৃত্বে এটা করা হয়।

*

পরদিন সকালে সুন্দরপুরের সবাই জেনে গেলো ঘটনাটি। তবে কি কারণে মুশকান জুবেরি পালালো আর তার বাড়িটা আগুনে পুড়ে গেলো সেটা নিয়ে কারোর কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। এক একজন মনের মাধুরি মিশিয়ে গল্প। বলে যেতে লাগলো। বলাই বাহুল্য, গল্পগুলো মুখরোচক।

তবে দূর-দূরান্ত থেকে অনেক মানুষ এসে যখন দেখতে পেলো রবীন্দ্রনাথ বন্ধ তখন অবাক হয়ে একে-ওকে জিজ্ঞেস করেও আসল কারণটা জানতে পারলো না।

"ওই হোটেল আর জীবনেও খুলবো না, বুঝলেন?" মেজাজের সাথে কথাটা বললো রবীন্দ্রনাথের উল্টো দিকের টঙ দোকানি রহমান মিয়া।

"কেন, কি হয়েছে?" একজন ভদ্রলোক উৎসুক হয়ে জানতে চাইলো।

"আরে, হে কি আমারে কইয়া গেছে ক্যান বন্ধ কইরা দিছে?" ঝাঁঝের সাথে জবাব দিলো রহমান।

দু-জন ভদ্রলোক হতাশ হয়ে ফিরে গেলো রাস্তার ওপাড়ে পার্ক করা গাড়ির কাছে।

"খাওনের কী শখ!" চোখমুখ বিকৃত করে বললো দোকানি। "গাড়ি লইয়া আইসা পড়ছে?" তারপরই ওয়াক থু। এই ঘেন্নাটা বেশ আনন্দের সাথেই প্রকাশ করতে পারলো সে। রহমান মিয়ার চোখেমুখে আনন্দ। সামনে রাখা গুড়ের পিণ্ডের উপরে এক ঝাঁক মাছি বসে থাকলেও সেগুলো হাত দিয়ে তাড়ালো না।

রবীন্দ্রনাথ কেন, ঐ ডাইনিটাও আর কখনও এখানে আসবে না।

.

অধ্যায় ৪৪

কেএস খান বসে আছে বিছানার পাশে। তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে জাওয়াদ। তারা দুজনেই চেয়ে আছে বিছানায় বসে থাকা নুরে ছফার দিকে। বাইরে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। ঘণ্টাখানেক আগে সুন্দরপুর থেকে ফিরে এসেছে একদম অক্ষত শরীরে। বলতে গেলে তেমন কিছুই হয় নি তার। সম্পূর্ণ সুস্থ আছে এখন। উদ্ধারের পর পরই জ্ঞান ফিরে পায়

সে। কোথাও কোনো ধরণের চোট পায় নি। তবে গতরাতের ঘটনার কিছুই মনে করতে পারছে না। ডাক্তার বলেছে, তার কোনো সমস্যাই নেই। তবে কড়া ডোজের অজ্ঞাত একটি ড্রাগস দেয়া হয়েছে। ছফার রক্ত পরীক্ষা করলে সেটার পরিচয় জানা যাবে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ড্রাগসটি অচেতন করে দিয়েছিলো তাকে।

"আপনের কিছুই মনে নাই?" হতাশ হয়ে জানতে চাইলো কেএসকে। কফির কাপে চুমুক দিতে ভুলে গেছে সে।

মাথা দুলিয়ে জবাব দিলো ছফা। বিছানার উপরে বসে আছে সে, তার হাতেও কফির কাপ। তবে জাওয়াদ কফি খায় না বলে তার হাত খালি।

"ঐ বাড়িতে যে গেলেন, এইটাও মনে করতে পারছেন না?"

মুখ তুলে তাকালো নুরে ছফা। "ওটা মনে আছে, স্যার...মানে ঐ বাড়িতে গেলাম... মহিলার সাথে কথা বললাম...তারপর..." চুপ মেরে গেলো।

...মহিলা আমাকে একটা অ্যালবামের মতো কিছু দিলো..."

উদগ্রীব হয়ে চেয়ে রইলো কেএস খান।

"...সম্ভবত ছবির অ্যালবাম..."

"একটা ছবির অ্যালবাম?"

"জি, স্যার...ছবির অ্যালবাম।"

"কার ছবি?"।

“মুশকান জুবেরির…” মনে করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো সে। “.ওর ছোটোবেলার ছবি…” তারপর আর কিছু মনে করতে পারলো না।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো কেএসকে, সে বুঝতে পারছে ছফার অবস্থা। “একটা বইয়ে পড়ছিলাম…এক ধরণের ড্রাগস আছে…এইটা যে যার উপরে অ্যাপ্লাই করা হয় তার মেমোরি লস হইয়া যায়…টেম্পোরারি মেমোরি পুরা ইরেজ কইরা দেয়। এইজন্য ড্রাগসটা কাজ শুরু করার কয়েক মিনিট আগে থেইকা যে মেমোরি আছে তাও নষ্ট হইয়া যায়। একটু থেমে আবার বললো সে, “সব স্মৃতিই টেম্পোরারি মেমোরিতে থাকে..তারপর সেইটা পারমানেন্ট মেমোরিতে চইলা যায়। বুঝলেন?”

ছফা অবাক হলো। ডিবির ইনভেস্টিগেটর এইসব কথা কি করে জানে।

“এইগুলা সব বই পইড়া জানছি,” শিশুসুলভ হাসি দিয়ে বললো কেএস খান।

“কিন্তু স্যার,” বললো নুরে ছফা, “যতোটুকু মনে পড়ছে, আমি ওখানে কোনো কিছুই খাই নি…ওই মহিলাও আমার থেকে বেশ দূরে বসেছিলো…তাহলে এটা কিভাবে হলো?”

“কন কি?” অবাক হলো কেএসকে। নতুন কোনো ব্যাখ্যা খুঁজতে লাগলো। “কোনো রকম কন্ট্যাক্ট হয় নাই? আপনে কিছু মুখেও দেন নাই?”

মাথা দুলিয়ে সায় দিলো ছফা। যতোটুকু মনে আছে এরকম কিছুই হয় নি। ঐ অ্যালবামটা খুলে পড়তে শুরু করেছি…তারপরই সবকিছু কেমন ওলট পালট হয়ে গেলো।”

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো ডিবির সাবেক ইনভেস্টিগেটর। “অ্যালবামটা দেওনের আগে কি কি হইছে সব মনে আছে?” অবশেষে জানতে চাইলো সে।

কপালের ডানপাশটা আঙুল দিয়ে ঘষলো ছফা। “অনেকটাই মনে আছে…মানে, আমি ঠিক শিওর না…”

“থাক, কষ্ট কইরা মনে করনের দরকার নাই। কয়েকদিন রেস্টে থাকেন, সব ঠিক হইয়া যাইবো।”

মাথা নেড়ে সায় দিলো নুরে ছফা। “মিসেস জুবেরি সবকিছুই নিজে। থেকে বলছিলো… আমি যেসব বিষয় নিয়ে সন্দেহ করছি তার সবকিছু পরিস্কার করে দিয়েছিলো…”

“তাই নাকি?”

“জি, স্যার। মহিলাকে নিয়ে আমি যেসব সন্দেহ করেছিলাম সব কিছুর লজিক্যাল এক্সপ্লানেশন দিয়েছিলো।”

“এইসব আপনের মনে আছে?”

“হ্যাঁ, মনে আছে।”

“এইটা কি ঐ ফটো-অ্যালবামটা দেওনের আগে না পরে?”

“আগে …”

“হুম,” গভীর ভাবনায় ডুবে গেলো কেএসকে। “তাইলে কি ঐ অ্যালবামটার মইধ্যেই মেকানিজম করছিলো?” অনেকটা আপন মনে বিড়বিড় করে বললো সে।

“কি বললেন, স্যার?” নুরে ছফা বুঝতে পারলো না।

“আমার মনে হইতাছে মহিলা ঐ অ্যালবামটার মইধ্যেই কিছু করছিলো..মাইনে, আপনে তো কইলেন, ওইটা ছাড়া আর কিছু টাচ করেন। নাই…”

“অ্যালবামের মধ্যে?...” ছফার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। “সেটা কিভাবে সম্ভব?”

মুচকি হাসলো মি. খান। “ঐ যে...আরব্য-রজনীর কাহিনীতে আছে...বইটার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় বিষ মাখায়া রাখছিলো?”

ছফা বুঝতে পারলো কিনা সেটা বোঝা গেলো না, আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

“এই ধরণের পয়জন কিন্তু বহুত আছে,” গুরুগম্ভীরভাবে বললো কেএস খান। “একটু ওভার-ডোজ হইলেই বিপদ আছিলো।”

নুরে ছফা অনেকক্ষণ চুপ থেকে বলে উঠলো, “স্যার, ঐ মহিলা পাঁচজন ভিক্টিমকে আসলে কি করেছে বলে মনে করেন, আপনি?”

কেএস খান পেছন ফিরে জাওয়াদের দিকে তাকালো। ছেলেটা নিজের অভিব্যক্তি লুকানোর চেষ্টা করতে গিয়ে পারলো না, গাল চুলকে কাচুমাচু খেলো একটু।

“অর্গ্যান পাচারের ব্যাপারে কি কোনো প্রমাণ জোগাড় করতে পেরেছেন হাসপাতালের ঐ ডাক্তারের কাছ থেকে?”

মাথা দোলালো কেএস খান।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো ছফা। “এই কেসটা তাহলে আপনার আমার দু জনের জন্যই প্রথম ব্যর্থ কেস হয়ে গেলো, তাই না, স্যার?”

কেএসকে নিঃশব্দে হাসি দিলে নুরে ছফা একটু অবাকই হলো। “কেসটা কইলাম সলভ...খালি আসামী ধরন বাকি। ওইটা করা যাইবো। আপনে কোনো চিন্তা কইরেন না। সে ধরা পড়বোই।”

ভুরু কুচকালো ছফা। “কেস সলভ মানে? আমরা তো জানিই না মুশকান জুবেরি পাঁচজন ভিক্টিমের সাথে কি করেছে!”

হাসি দিয়ে ছফাকে আশ্বস্ত করলো কেএসকে। “এইটা আসলে আমরা জানি,” কথাটা বলে জাওয়াদের দিকে তাকালো। “আপনেরে পরে সব বলবো...এখন রেস্ট নেন।” উঠে দাঁড়ালো সাবেক ডিবি কর্মকর্তা।

“আপনি জানেন?” মাথা নেড়ে সায় দিয়ে আবারো আশ্বস্ত করলো কেএস খান।

“তাহলে আমাকে বলছেন না কেন, মুশকান জুবেরি ঐ পাঁচজন ভিক্টিমকে কি করেছে, কেন করেছে?”

“মুশকান কোনো অর্গ্যান পাচারের সাথে জড়িত না, আপনের এই হাইপোথিসিসটা ভুল ছিলো।”

পুরো কথাটা শোনার জন্য অপেক্ষা করলে সে।

“মহিলা তার ভিক্টিমদের শরীরের একটা অর্গ্যান খায়া ফেলতো!”

“কি!” কথাটা শুনে ভিরমি খেলো ছফা। “এরকম একজন রুচিবান মহিলা এটা কেন করবে?” অবিশ্বাসে বলে উঠলো সে।

ছফা যে আন্দিজের ঘটনাটা জানে না সেটা বুঝতে পারলো। এই লম্বা গল্পটা এখন না বলে সরাসরি আসল প্রসঙ্গে চলে গেলো। “কারণ খুব কঠিন এক সিচুয়েশেনে পইড়া, বাই-অ্যাকসিডেন্ট সে ইনভেন্ট করছে, মানুষের শরীরে একটা বিশেষ একটা অঙ্গ খাইলে যৌবন ধইরা রাখা যায়।”

বিস্ময়ে চেয়ে রইলো ছফা। “এটা তো পুরোপুরি আজগুবি কথা,” মেনে নিতে না পেরে বলে উঠলো। “কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই না। বিকৃত মস্তিষ্কের কাজ-কারবার!”

কেএসকে কিছুই বললো না।

"আ-আপনি এটা বিশ্বাস করেন, স্যার?"

"দেখেন, আমি হইলাম যুক্তির মানুষ...যুক্তি ছাড়া কিছু বিশ্বাস করি না। যা দেখি নাই দুই নয়নে তা মানি না গুরুর বচনে?"

"আমিও, স্যার। এইসব আজগুবি ফালতু কথা কে বলছে?"

"ঐ ডাক্তার...আসকার ইবনে সায়িদ।"

"ও-ওকে আমি এমন শিক্ষা দেবো..." দাঁতে দাঁত চেপে বললো ছফা। " আমাদের সাথে রসিকতা! এসব কথা বলে ওই ডাক্তার আসলে অর্গান পাচারের ব্যাপারটা আড়াল করতে চাইছে, স্যার।"

গাল চুলকালো কেএসকে।

অবিশ্বাসে চেয়ে রইলো ছফা। সে জানে কেএস খানের এই ভঙ্গিটির অর্থ কি। "আ-আপনি এই উদ্ভট গল্পটা বিশ্বাস করেন?"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললো, "আমি কি বিশ্বাস করি না করি সেইটা বলার আগে আমারে একটা কথা বলেন। আপনে তো মহিলারে সামনে থেইকা দেখছেন...বললেন তো, ওর বয়স কতো হইতে পারে?"

একটু ভেবে নিলো ছফা। "মমম...কতে হবে...ত্রিশ? বড়জোর পঁয়ত্রিশ এর বেশি হবে না। আমি নিশ্চিত। অবশ্য মহিলাকে দেখলে যদি আরো কম বয়সি মনে হয় তাহলেও দোষ দেয়া যাবে না।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো কেএস খান। "মুশকান জুবেরির বর্তমান বয়স ছেষট্টি!"

ছফার মনে হলো তার সাথে মশকরা করা হচ্ছে। “ছেষট্টি মানে??”

“মাইট যোগ ছয়!”

.

অধ্যায় ৪৫

সুন্দরপুরের এমপি আসাদুল্লাহ সারাদিন এখোটা ব্যস্ত ছিলো যে নিজের এলাকার খবর নিতে পারে নি। রাজনীতি এমনিতেই ব্যস্ততম একটি পেশা, তার উপরে ক্ষমতাসীন দলের এমপি হলে ব্যস্ততা বেড়ে যায় কয়েকগুন। শীতকালীন সংসদ অধিবেশন চলছে। অনেকদিন পর আজ সংসদে বসেছিলো কয়েক ঘণ্টা। এক সময় ঘুমিয়েও পড়েছিলো। এ নিয়ে কলিগেরা হাসাহাসি করেছে। নিজদলের এক এমপি টিটকারি মেরে বলেছে, মাল টেনে এসেছে কিনা। কথাটা সে সহজভাবেই নিয়েছে। অন্তত বাহ্যিকভাবে, কিনতু ভেতরে ভেতরে গজগজ করে উঠেছিলো। হারামজাদা, আমি এখনও তোর মতো হতে পারি নি! কোথায় কি খেয়ে যেতে হয় সেটা ভালো করেই জানি! অবশ্য মুখটা এমন করে রেখেছিলো যেনো কী-যে-বলেন-না-ভাই’ টাইপের।

যাইহোক, রাত নটার পর সংসদ ভবন থেকে বের হয়ে আরেক এমপির বাসায় গিয়ে ‘মাল’ অবশ্য ঠিকই টেনেছে। সেটা আর এমন কি। সবাই তা করে। কেউ স্বীকার করে, কেউ করে ভণ্ডামি।

রাত বারোটার পর ফাঁকা অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে মেজাজটাই বিগড়ে গেলো। সারাদিন এতো কাজ করার পর যদি শূন্য বাড়িতেই ফিরে আসতে হয় তাহলে এতোসব কিসের জন্য করছে? তার বউ-বাচ্চারা মনে করে এই দেশে মানুষ থাকে না! কানাডার নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করে ওরা। এজন্যে অবশ্য ওদেরকে খুব বেশি দোষও দেয়া যায় না। এক/এগারোর আগেভাগে সে নিজেই পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে অন্য অনেকের মতো বউ-

বাচ্চাকে ওখানে পাঠিয়ে দেয়। শত শত রাজনীতিকের বেগমসাহেবরা থাকেন বলে কানাডার ঐ জায়গাটাকে এখন লোকজন বেগমগঞ্জ বলে টিটকারি মারে।

জামা-কাপড় না খুলেই বিছানায় গিয়ে ধপাস করে শুয়ে পড়লো। পকেট থেকে দুটো সেলফোন বের করে রাখলো বালিশের পাশে। রাত বারোটার পর সব সেলফোন বন্ধ করে রাখে, শুধু একটা বাদে। ওটার নাম্বার খুব কম লোকের কাছেই আছে। যাদের কাছে আছে তাদের কাণ্ডজ্ঞান অতো নীচে কখনও নামবে না যে, রাত-বিরাতে অদরকারে-কমদরকারে ফোন করে প্রাইভেট লাইফে বিঘ্ন ঘটাবে।

চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকলো কয়েক মুহূর্ত। টের পেলো মাথাটা খুব ধরে আসছে। সে জানে যথেষ্ট মদ পেটে না গেলে তার এরকম হয়। অন্যের মদ খেতে বসে একটু ভদ্রতা করেছিলো বলে এই অবস্থা। এখন আরেকটু না খেলে সারারাত এমন মাথাব্যথা নিয়েই বিছানায় পড়ে থাকতে হবে। অবশেষে বিছানা ছেড়ে উঠে ফ্রিজ থেকে পাসপোর্টের একটি বোতল আর গ্লাস নিয়ে আবারও ঢুকলো বেডরুমে। বিছানার পাশে সোফায় বসে কিছুটা পানীয় ঢেলে চকচক করে পান করলো। বোতলটা রাখলো সোফার পাশে মেঝেতে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ওষুধের মতো কাজ করলো যেনো। মাথাব্যথাটা চলে গেলো পুরোপুরি। আরেকটু পান করার লোভ সামলাতে পারলো না। বেশি খেলে তার খুব একটা সমস্যা হয় না, কম খেলেই যতো বিপত্তি।

মাথাব্যথা কেটে যাবার পর সমস্ত ক্লান্তি অপসারিত হতেই মনে হলো সুন্দরপুরের খবর নেয়া দরকার। গতকাল এসপিকে ফোন দিয়েছিলো ঘটনা কি জানার জন্য কিন্তু হারামজাদা তার ফোন ধরে নি। ওকে এক সপ্তাহের মধ্যে ট্রান্সফার করতে হবে। পরক্ষণেই ভুল ভাঙলো তার। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রভাবশালী একজনের কারণেই তার বিশ্বস্ত আর ঘনিষ্ঠ এসপি এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। এমনকি তাকেও হাতপা গুটিয়ে রাখতে হয়েছে ঐ লোকের ভয়ে। নইলে মুশকানকে সাহায্য করা তার জন্য কোনো ব্যাপারই ছিলো না। বরং

তার গোয়াতুর্মি আর অধৈর্যের কারণে যে দুরত্ব সৃষ্টি হয়েছে সেটা ঘোচানোর সুযোগ পাওয়া যেতো মেয়েটার বিপদে সাহায্য করে।

মুশকানের কথা ভাবতেই একটা প্রশ্নের উদয় হলো তার মনে সে কি এমন করেছে, যার জন্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ঐ লোক ক্ষেপে আছে? কিছুক্ষণ ভেবেও আন্দাজ করতে পারলো না। ঠিক করলো আগামীকাল সকালে যেভাবেই হোক এসপির সাথে যোগাযোগ করে এটা জেনে নেবে, যদি আদৌ সে সবটা জেনে থাকে।

হঠাৎ করে শোবার ঘরের খোলা দরজার দিকে তাকালো। বাইরের প্যাসেজ আর ড্রইংরুমের আলো নেভানো। আসাদুল্লাহ নিশ্চিত, অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার সময় সবগুলো বাতি জ্বালিয়েছিলো। একটু আগে যখন ফ্রিজ থেকে ওয়াইনের বোতলটা নিয়ে এলো তখনও বাতি জ্বলছিলো। পরক্ষণেই আবার অনিশ্চয়তায় পড়ে গেলো সে। মাতাল হিসেবে এরকম ভুল হতেই পারে।

মদের গ্লাসটা হাতে নিয়েই উঠে দাঁড়ালো। দরজার সামনে এসে ডানে বামে তাকালো সে। এই সুরক্ষিত অ্যাপার্টমেন্টে কে ঢুকবে? অসম্ভব। মুচকি হাসলো আসাদুল্লাহ্ ক্ষমতাবানদের নিরাপত্তাহীনতা বোধ একটু বেশিই থাকে, যেটা বাইরের লোকজন বুঝতে পারে না সব সময়। শোবার ঘরের বাইরে প্যাসেজের বাতিটা জ্বালিয়ে দিয়ে সোফায় এসে বসলো আবার। গ্লাসটা খালি করে ভরে নিলো আরেক দফা। কিছুক্ষণ পর টের পেলো মদ কাজ করতে শুরু করেছে। কেমন হালকা হয়ে এসেছে মাথাটা! চোখ দুটো ভারি হয়ে আসছে। গ্লাসটা খালি করে সোফার হাতলের উপর রেখে ঘরের বাতি নিভিয়ে দিলো। বিছানায় শুয়ে পড়লো চিৎ হয়ে। একটু পর কিছু একটা টের পেয়ে খোলা দরজার দিকে তাকালো সে। ওখানে দাঁড়িয়ে আছে আবছায়া এক নারীমূর্তি!

কে?

অবয়বটি আস্তে আস্তে হেঁটে তার বিছানার কাছে চলে এলো। ঘরের বাতি নেভানো বলে পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে না। বাইরের আলোয় অবয়বটি আবছায়া মূর্তি দেখে তার মনে হলো এই নারী তার অনেক দিনের চেনা।

"কে?" এবার মুখ দিয়ে কথাটা বের করতে পারলো। "মুশকান?"

"ঘরছাড়া এই পাগলটাকে এমন করে কে গো ডাকে করুণ গুঞ্জরি," নারীকণ্ঠটি প্রায় ফিসফিসিয়ে, সুরে সুরে বলে উঠলো, "যখন বাজিয়ে বীণা বনের পথে বেড়াই সঞ্চরি।"

আসাদুল্লাহর কাছে মনে হলো সে একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখছে। তার সামনে যে নারী দাঁড়িয়ে আছে তার সান্নিধ্য পাবার জন্য সে কতোটা ব্যাকুল তা কেউ না জানুক সে নিজে তো জানে। এই নারী তাকে পাগল করে তুলেছে। বার বার ফিরিয়ে দিয়ে অপমান করেছে তাকে। শেষে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার পর মরিয়া হয়ে জোর খাটাতে শুরু করেছে ইদানিং, কিন্তু তাতেও কাজ হচ্ছে না। মুশকান এমন ভাব করে, যেনো তার সমস্ত হম্বি-তম্বি শিশুতোষ পাগলামি ছাড়া আর কিছু না।

নারীমূর্তিটি তার মুখের উপর কিছুটা ঝুঁকে এলো। যেনো তাকে ভালো করে দেখছে। আসাদুল্লাহ আবছা আবছা দেখতে পেলো মুখটি। সেই রহস্য!

সেই দুর্দমনীয় আকর্ষণ! প্রলুব্ধকর চাহনি!

"ভয় পাচ্ছো?" বলে উঠলো মুশকান। "দেখো, আমি তোমার ঘরে চলে এসেছি! তোমার জায়গায় আমি হলে প্রাণ খুলে গাইতাম 'এসে এসো আমার ঘরে এসো…" সুরে সুরে গানটা গেয়ে আচমকা থেমে গেলো। "তোমার কাছ থেকে অবশ্য এটা আশা করাটাও বোকামি। তুমি একটা মাথামোটা ভাঁড়!"

এমপি পিটপিট করে তাকালো শুধু।

“তুমি ভয় পাচ্ছো?”

বুঝতে পারলো না তাকে কেন এ প্রশ্ন করা হচ্ছে।

“ভয় পাবার কিছু নেই। তুমি মোটেও খাওয়ার যোগ্য নও!”

তারপরই নিঃশব্দে হেসে উঠলো সে। সেই হাসির কি অর্থ বুঝতে পারলো না আসাদুল্লাহ। গভীর ঘুমে তলিয়ে যাবার সময় মুশকানের আদরমাখা কণ্ঠটি।

“তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও. আমি তোমাকে খাবো না!”

*

ঢাকায় আসার পরদিনই অফিসে চলে গেলো নুরে ছফা। ইচ্ছে করলে কয়েকটা দিন বিশ্রাম নিতে পারতো, কিন্তু ব্যাচেলর মানুষের আর যাইহোক নিজের ঘরে বেশিক্ষণ থাকতে ভালো লাগে না। তাছাড়া এমন কিছু হয় নি যে বিশ্রাম নেবার দরকার আছে।

অফিসে এসেই কয়েকজন কলিগের সাথে দেখা করে নিজের ঘরে গিয়ে কয়েকটি পত্রিকা নিয়ে বসলো। কমিশনার এলে তাকে পুরো ব্যাপারটা ব্রিফ করতে হবে। পত্রিকা খুলতেই তার সহকারি জাওয়াদ ঢুকলো ঘরে। তার মধ্যে এক ধরণের অস্থিরতা দেখতে পেলো ছফা।

“স্যার, ঘটনা শুনেছেন?”

“কি?”

“সুন্দরপুরের এমপি মারা গেছে গতরাতে!”

ভুরু কুচকে ফেললো সে।

“কিভাবে মারা গেলো? কোথায় মারা গেলো?”

“হার্ট অ্যাটাকে, স্যার…নিজের ফ্ল্যাটে।”

“ব্যাপারটা খুব কাকতালীয় হয়ে গেলো না?” পত্রিকা নামিয়ে রাখলো সে। “গতপরশু সুন্দরপুরে এতোবড় একটা ঘটনা ঘটলো আবার গতরাতে সেই এলাকার এমপি মারা গেলো…স্ট্রেইঞ্জ”।

“স্যার, দুটো ঘটনা মোটেও কাকতালীয় নয়। আমি নিশ্চিত, এটা মুশকান জুবেরির কাজ।”।

“কি?” আৎকে উঠলো ছফা। “কি বলতে চাচ্ছো? ওই মহিলা ধরা পড়ার ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে…তাছাড়া তুমি বলছো এমপি হার্ট-অ্যাটাকে মারা গেছে, তাহলে মুশকান জুবেরিকে সন্দেহ করার কারণ কি?”

“স্যার, সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। খবরটা শোনার পর আমিও ভেবেছিলাম কাকতালীয় হতে পারে, কিন্তু টিভিতে নিউজটা দেখার পর বুঝলাম এটা মুশকান জুবেরিই করেছে।”

“একটু খুলে বলবে?” অধৈর্য হয়ে উঠলো ছফা।

“এমপি আসাদুল্লাহ কোথায় থাকে জানেন, স্যার?”

“না।“

“গুলশানের একটি ফ্ল্যাটে। আর ঐ ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদও থাকেন একই অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে।”

“মাইগড!” অস্ফুটস্বরে বলে উঠলো ছফা।

.

এ ধরনের আরও বই পান ⏩ @bongboi।

উপসংহার

মুশকান জুবেরিকে ধরা না গেলেও নুরে ছফা বেশ বাহবা পেলো উর্ধতন কর্মকর্তার কাছ থেকে। এমন কি শেষ ভিক্টিম হাসিবের মামা প্রধানমন্ত্রীর। কার্যালয়ের প্রভাবশালী ব্যক্তিটিও ফোন করে তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। যে কেসটার কোনো কূল-কিণারা কেউ করতে পারে নি, সামান্য অগ্রগতিও দেখাতে পারে নি সেখানে ছফা যতোটুকু করেছে তা তো বিস্ময়করই বটে। হ্যাঁ, আসামীকে ধরা যায় নি, তাতে কি? তাকে ধরার কাজ এখনও অব্যাহত আছে। যেকোনো সময় ঐ মহিলাকে ধরা সম্ভব হবে।

কর্তাদের এমন কথায় অবশ্য ছফা মনে মনে একমত হতে পারে নি। তার ধারণা, মুশকান জুবেরি চিরকালের জন্য ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। এরপক্ষে যুক্তি দিতে পারবে না সে, তবে এটাই তার দৃঢ় বিশ্বাস। সুন্দরপুরের এমপি মারা যাবার কথা শুনে এ নিয়ে কমিশনারের কাছে গিয়ে বলেছিলো, ঘটনাটা নিছক হার্ট-অ্যাটাকের না-ও হতে পারে। একই ফ্ল্যাটে মুশকানের ঘনিষ্ঠ ডা: আসকার ইবনে সায়িদ থাকেন। এই ভদ্রলোক মুশকানের প্রায় সব ব্যাপারই জানেন। যদিও পাঁচজন ভিক্টিমের ব্যাপারটা তিনি জানতেন না বলেই দাবি করেছেন। ছফার কাছ থেকে এ কথা শুনে কমিশনার বলেছেন, ফরেনসিক রিপোর্টে যদি সন্দেহজনক কিছু থাকে তাহলে এটা নিয়ে তারা তদন্ত করে দেখতে পারে, কিন্তু নিছক একই ফ্ল্যাটে বসবাস করার জন্য এরকম সন্দেহ করাটা ধোপে টিকবে না। এই সন্দেহটা প্রমাণের জন্য শক্ত প্রমাণ দরকার।

ছফা সেই প্রমাণের জন্য অপেক্ষা করে শেষে হতাশ হয়েছে। এমপির মৃত্যুর কারণ হিসেবে ফরেনসিক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে অতিরিক্ত মদ্যপানকে, সেটাও আবার সরকারী দলের হস্তক্ষেপের কারণে ধামাচাপা পড়ে গেছে। সেই রিপোর্ট প্রকাশ করা তো দূরের কথা, দেখারও সুযোগ হয়নি কারোর। ছফা অনেক চেষ্টা করে শুধু এটুকুই জানতে

পেরেছে। সুতরাং এমপি আসাদুল্লাহর কেসটা নিয়ে এগিয়ে যাবার কোনো সুযোগ নেই। তারপরও ডাক্তার আসকার ইবনে সায়িদের সঙ্গে দেখা করার জন্য গিয়েছিলো কিনতু ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। এমপি মারা যাবার পরদিনই ভদ্রলোক কী একটা কাজে আমেরিকায় চলে গেছেন, কবে ফিরবেন কেউ জানে না।

বেশ কয়েকদিন হয়ে গেলেও কেএস খানের সাথে তার দেখা হয় নি। এর কারণ আরেকটি কেস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ভদ্রলোক।

ডাক্তারের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে ছফা ফোন দেয় সাবেক ডিবি ইনভেস্টিগেরটকে। কেএসকে জানায় কয়েকদিন ব্যস্ত থাকার পর আজ বাড়িতে আছে বিশ্রাম নেবার জন্য। তার শরীর একটু খারাপ। কথাটা শুনে। মুচকি হেসেছিলো সে। মি. খানের শরীর কবে ভালো ছিলো মনে করার চেষ্টা করলো। কিংবা কখনও সে তাকে বলেছে কিনা তার শরীর আজ ভালো, মনে পড়লো না।

"স্যার, তাহলে আমি আসছি আপনার বাসায়, একটু গল্প করে যাই। অনেকদিন দেখা হয় না," বলেই ফোনটা রেখে দিলো ছফা।

*

জমিদার বাড়িটি পুড়ে যাবার পর এমপি আসাদুল্লাহর মৃত্যু সুন্দরপুরকে একটু নাড়িয়ে দিলেও দু-সপ্তাহ পরই সবকিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠলো। কেবল রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসেন নি বাদে!

অদ্ভুত নামের রেস্টুরেন্টটি সেই যে বন্ধ হয়েছে আর খোলে নি। এর কর্মচারিরা কোথায় চলে গেছে, কে তাদের চলে যেতে বলেছে সেটা কেউ জানে না। এখনও অনেকেই রবীন্দ্রনাথের সামনে গাড়ি থামিয়ে হতাশ হয়ে দেখতে পায় দরজা-জানালা সব বন্ধ। চমৎকার আর অদভুত সাইনটাও জ্বলছে না। তাদের বেশিরভাগই রাস্তার ওপাড়ে রহমান মিয়ার টঙ দোকানে। গিয়ে জানতে চায় ঘটনা কি। শুরুতে এই এক কথা বলতে বলতে

রহমানের মেজাজ প্রায়ই বিগড়ে যেতো, লোকজনের এইসব প্রশ্ন করা যেনো অচিরেই বন্ধ হয়ে যায় সেই কামনাই করতো মনে মনে, তবে দ্রুতই সে বুঝতে পারলো ব্যাপারটা তার জন্য লাভজনক হয়ে উঠছে। যারা জিজ্ঞেস করতে আসে তাদের মধ্যে কেউ কেউ হতাশ হয়ে তার চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে চা সিগারেট খায়। তাই রহমান মিয়াও তার বিজনেস পলিসি বদলে ফেললো : রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে খোঁজ করতে আসলেই সে এখন বলে, “সামনের মাস থিইকা আবার চালু হইবো।” এরকম পাক্কা খবর নাকি তার কাছে আছে।

এ কথা শুনে হতাশ কাস্টমাররা কিছুটা আশা নিয়ে ফিরে যায়। যাবার আগে কেউ কেউ তার বিখ্যাত গুড়ের চা-ও খায়, সেইসঙ্গে সিগারেট।

ওদিকে আতর আলী প্রায় এক সপ্তাহ হাসপাতালে থেকে বাড়ি ফিরে আসে। অল্পের জন্যে বেঁচে গেলেও সুস্থ হতে খুব বেশি সময় নেয় নি সে। আবারো থানার ইনফর্মার হয়ে কাজ করছে, তবে আগের মতো আর তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হয় না তাকে। হাজার হলেও নুরে ছফার মতো জাঁদরেল লোকজনের সাথে ঘনিষ্ঠতা রয়েছে, যাকে ওসি তো ওসি, স্বয়ং এসপিও সমীহ করে চলে। এরমধ্যে দুয়েকবার ছফা ফোন করে তার খোঁজখবরও নিয়েছে। তার হাতে এখন যে নতুন মোবাইলফোনটা আছে সেটা ছফাই ঢাকা থেকে উপহার হিসেবে পাঠিয়েছে। এই উপহারের কথা সে সবখানে বলে বেড়ায়। লোকে যাতে বোঝে, ঐ নুরে ছফা তাকে কি চোখে দেখে। এখনও সে রহমান মিয়ার দোকানে এসে চা খায়, সিগারেট কেনে, কিন্তু দোকানি আর তার। অগোচরে তাকে নিয়ে আজেবাজে কিছু বলে না।

*

সুন্দরপুরের রমাকান্ত মাস্টার অভ্যাশবশত উঠোনে বসে সকালের রোদ পোহাচ্ছিলেন একদিন। এমন সময় পোস্টাফিসের পিয়ন এসে তার হাতে একটা মোটা প্যাকেট দিয়ে চলে যায়। ঢাকা থেকে এসেছে পার্সেলটি। প্রেরক ময়েজ উদ্দিন খোন্দকার নামের এক আইনজীবি। বিস্মিত মাস্টার ঘরে না গিয়ে উঠোনে বসেই প্যাকেটটা খুলে দেখেন অলোকনাথ বসুর সম্পত্তির বেশ কিছু অংশ তাকে ট্রাস্টি করে দান করা হয়েছে। ঢাকায়

গিয়ে আইনজীবির সাথে বসে বাকি কাগজপত্র তৈরি করার জন্য তাকে অনুরোধ করে একটি চিঠিও দেয়া হয়েছে। সেই সাথে ছোট্ট একটি চিরকুট।

রমাকান্তকামার বুঝতে পারলেন ওটা কার। অলোকনাথের নাতবৌ সুন্দরপুর ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে বোবা ছেলেটার মাধ্যমে এরকম হাতের লেখা চিরকুট পাঠিয়ে তাকে জমিদার বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেছিলো। মহিলার কাছ থেকে প্রস্তাবটা শুনে ভিরমি খেয়েছিলেন মাস্টার। এতো বড় সহায় সম্পত্তি হুট করে তার মতো একজনের কাছে কেন দিতে চাইছে? তার সাথে তো মিসেস জুবেরির কখনও কথা-ই হয় নি। সুন্দরপরে আসার পর মহিলা দুয়েকবার লোক পাঠিয়ে দেখা করতে বলেছিলো, তিনি যান নি।

প্রস্তাবটা শোনার পর অনেকক্ষণ চুপ থাকেন মাস্টার। কিছুটা ভয়ও পেয়েছিলেন, আর এ কথাটা মিসেস জুবেরির কাছে অকপটে বলেছিলেন তিনি। ভদ্রমহিলা তাকে আশ্বস্ত করে বলেছিলো, এমপি আসাদুল্লাহকে নিয়ে তিনি যেনো কোনো দুর্ভাবনায় না থাকেন। তার সামান্য পরিমাণ ক্ষতি করার মতো অবস্থায়ও থাকবে না ঐ এমপি! মহিলার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয়েছে।

গভীর করে দম নিয়ে চিরকুটটায় চোখ বোলালেন তিনি। খুব বেশি কথা লেখা নেই সেখানে।

সম্পদ-সম্পত্তি খারাপ মানুষের হাতে পড়লে দশের ক্ষতি, দেশের ক্ষতি। ভালো মানুষের হাতে পড়লে মহৎ কিছুর জন্ম হয়। আপনি এ সম্পত্তি নিয়ে কি করবেন সে নিয়ে আমার মধ্যে কোনো সংশয় নেই। শুধু একটা ছোট্ট অনুরোধ, রবীন্দ্রনাথকে চমৎকার একটি লাইব্রেরি বানাবেন। বইয়ের চেয়ে শক্তিশালী খাবার এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয়। নি। ওই লাইব্রেরিটা যদি রবীন্দ্রনাথের নামে হয় তাহলে আমি ভীষণ খুশি হবো। একটা কথা মনে রাখবেন, এটা আমি আপনাকে দেই নি।
রাশেদ জুবেরি তার জীবন বাঁচানোর জন্য আপনার কাছে চিরটাকালই কৃতজ্ঞ ছিলো। সে

হয়তো মুখ ফুটে সেটা কখনও বলতে পারে নি।

—ভালো থাকবেন।

রমাকান্তকামার শীতের নরম রোদে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। তার ঘোলাটে দু-চোখে জ্বলজ্বল করে ভেসে উঠলো একটি দৃশ্য। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা বুকে বই-খাতা জড়িয়ে দৌড়ে যাচ্ছে একটি স্কুলের দিকে। লাইব্রেরিতে মৌন-পাঠকের দল ডুব মেরে আছে অন্য এক জগতে!

ছবির মতোই সুন্দর মফশ্বল শহর সুন্দরপুর। প্রকৃতির শোভা ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছু নেই বললেই চলে কিন্তু সবাই জানে *রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসেন নি*! কেন আসেন নি তার চেয়েও বড় কথা কেন অনেকেই সেখানে ছুটে যায়!
একদিন এক আগন্তুক এসে হাজির হলো সেই সুন্দরপুরে। তার গতিবিধি অস্পষ্ট আর রহস্যময়। সে যেটা জানতে চায় সেটা সুন্দরপুরের খুব কম লোকেই জানে। আর যখন সেটা জানা গেলো তখন বেরিয়ে এলো রোমহর্ষক এক কাহিনী! পরিহাসের ব্যাপার, সেই কাহিনী বলার মতো সুযোগ সত্যি কঠিন!

নেমেসিস, কন্ট্রাক্ট, কনফেশন, করাচি, জাল আর ১৯৫২-এর মতো মৌলিক থ্রিলার লিখে পাঠকপ্রিয় মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন আরেকবার অভিনব সব চরিত্র আর একেবারে ভিন্ন ধরণের কাহিনী *রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসেন নি* নিয়ে হাজির হয়েছেন।

ISBN 984872975-5
9789848729755